মানসী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা - ৯

প্রথম মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মূল্য ঃ চার টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

উৎসর্গ

আমার পরম স্নেহের
নিষ্ঠাবতী সাহিত্য-সাধিকা
কল্যাণীয়া
শ্রীমতী বেলা দেবীকে
স্নেহের উপহার দিলাম।

—লেখকের অন্যান্য প্রসিদ্ধ বই—

স্বয়ংসিদ্ধা	যুগকন্যা
অপরাজিতা	পরমপুরুষ
নূতনের অভিষেক	ঝাড়খণ্ডের ঋষি
পথের আলো	রাণী লক্ষ্মীবাঈ
প্রিয়তমা	কন্যাপীঠ
বিচারিণী	অগ্রগামী
স্বয়ংবরা	কুমারী-সংবাদ
আধুনিকা	নতুন বউ

শিশু-সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থ।

পরিচয়

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় 'মুক্তি' নামে আমার একটি বড় গল্প প্রকাশিত হয়। পরে সেটি নানাভাবে রূপান্তরিত হলেও আমার ঠিক মনঃপুত হয় নি। বিশ্বাস পাবলিশিং হাউসের কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ও উৎসাহে সেই 'মুক্তি' 'মানসী' নামে নব কলেবর ধরে আত্মপ্রকাশ করল। বলা বাহুল্য, আমার লেখা অন্যান্য উপন্যাস-গুলির মত এখানিও মৌলিক উপাদানে রচিত ও লেখকের নিজস্ব পরিকল্পনায় পল্লবিত। যাঁরা আমার উপন্যাস পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের মনঃপুত হলেই আমার প্রবীণ বয়সের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সি, আই, টি ভবন
(ইণ্টালী, ক্রিষ্টোফার রোড)
'ই' ব্লক—১১ ; কলি—১৪
ফোন : ৪৪-২২৪৫

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥
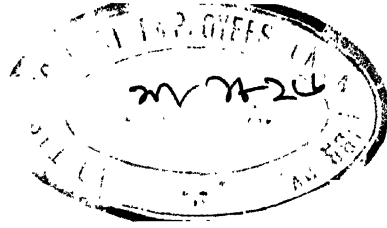
স্বভাব-শিল্পী শম্ভুনাথ বসু চিত্র-বিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভাধর হয়েও নিজের খামখেয়ালী অস্থির প্রকৃতির জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলেন না। উচ্চশিক্ষার সংগে ভারতীয় চিত্র-বিদ্যার রহস্যভাণ্ডারটি তিনি পরিপূর্ণরূপেই আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবে তাঁর সেই সাধনালব্ধ শিক্ষা ও আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত অর্থকরী হোল না।

শিল্পকে তিনি সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতীক বলেই জানেন—সুতরাং অন্যান্য শিল্পীদের মত সত্যদ্রষ্টা ঋষিসৃষ্ট ভারতীয় চিত্রবিদ্যার আদর্শকে বৈদেশিক শিল্পীদের আদর্শের সংগে সুকৌশলে মিলিয়ে চক্ষুচমৎকারী করে বাহাদুরী নেওয়াটাকে তাই রীতিমত অপরাধ বলেই মনে করতেন। ভারতীয় চিত্রের আদর্শকে জাতীয় সংস্কৃতিমূলক পরিকল্পনার তুলিতে আরো স্পষ্ট উজ্জ্বল ও অভিনব করে তোলাটাই ছিল তাঁর শিল্পী জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। একশোজন অর্বাচীন অনভিজ্ঞের প্রশংসার চেয়ে একজন মাত্র রসজ্ঞ গুণীর প্রশংসাকেই তিনি গুরুত্ব দেন, ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের অর্থকরী প্রবৃত্তির দিকে দৃকপাত না করে তিনি কোন রসোত্তীর্ণ গ্রাহকের প্রত্যাশায় তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করে আনন্দ পান।

এর ফল সাধারণত যা হয়ে থাকে, তার ব্যতিক্রম হোল না শম্ভুনাথের অদৃষ্টে। অল্প লোকই তাঁর স্বভাবশিল্পের অনুরক্ত হোল—চতুর ব্যবসায়ী শিল্পীরা সংঘবদ্ধ ভাবে তাঁকে বয়কট করলেন। ফলে, পঞ্চাশ বছর বয়সে একদা শম্ভুনাথ হিসাব নিকাশ খতিয়ে দেখলেন—জাতীয় শিল্পের মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি ধনুর্ভঙ্গ পণ করলে কি হবে?—জাতির

সাহায্য তিনি পাননি, দেশ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করেনি। পঁচিশ বছরে নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠাই তিনি লাভ করতে সমর্থ হননি—কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন নানা ভাবেই।

তিনি নিজে সুপুরুষ, তাই খুঁজে খুঁজে অপরূপ রূপসীকেই বিবাহ করেছিলেন। একমাত্র সন্তান উপহার দিয়ে পত্নী পূর্ণযৌবনেই মহাপ্রস্থান করেছেন। ধনীর পুত্র তিনি—পৈতৃক বাড়ী ও প্রচুর অর্থ হাতে পেয়েছিলেন। সে সবই গিয়েছে। পুত্র নরনারায়ণ একাধারে পিতামাতার অপরূপ সৌন্দর্য এবং সংস্কারসূত্রে পিতার শিল্প-প্রতিভা পেয়েছে। দশ বছরের ছেলে পিতার অনুকরণে ছবি আঁকে—তার চিত্রাংকন বিদ্যায় সহপাঠিরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

শম্ভুনাথ অল্পভাষী এবং সাধারণত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও কোনদিনই পরমতসহিষ্ণু নন, বিরুদ্ধ কথা শুনলে এমনি রেগে ওঠেন যে নতুন কেহ তাঁর সংস্পর্শে এলেই পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করেন। আকৃতির দিক দিয়ে তাঁর নাসিকাটি অত্যন্ত টিকালো, মাথার চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত লতানো—অনেকটা বাবরির মত। সাজসজ্জায়ও শিল্পীসুলভ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—পায়জামা, লংকোট, মাথায় পারসী-প্যাটার্ণ টুপি। ছেলেটিকেও এই ভাবে সাজাতে তিনি ভালবাসেন।

অনেক ভেবে চিন্তে হিসাব নিকাশ করে পরবর্তী জীবনের কর্তব্যও তিনি স্থির করে ফেললেন। যথা—ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক যে চিত্রবিদ্যা তাঁকে ভারতে প্রতিষ্ঠা দিল না, সেই বিদ্যা নিয়ে তিনি বিদেশে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। আর, ছেলের সম্পর্কে ব্যবস্থা করলেন,—তাকে তার মাতুলের আশ্রয়ে রেখে যাবেন। মাতুল নিবারণ মিত্র দানাপুরে ই, আই রেলের অফিসে চাকরী করেন। সেখানেই রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন—সংসারে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।

শ্যালকের হাতে হাজার তিনেক টাকা এবং ছেলে নরনারায়ণকে সমর্পণ করে বললেন—এখন থেকে তুমিই এর অভিভাবক, উচ্চশিক্ষার সংগে চিত্রবিদ্যাটা যাতে শেখে সেই ব্যবস্থা করবে। আমি

ফিরি ভালই, না ফিরি তুমিই আমার স্থলে দাঁড়িয়ে একে চালাবে। ছেলেটি তখন দশ বছরে পড়েছে।

দানাপুরে ছেলের ব্যবস্থা করে শিল্পী শম্ভুনাথ পাঞ্জাব মেলে উঠে পড়লেন। এলাহাবাদে গাড়ী বদল করে বোম্বাই মেল ধরবেন—সেখান থেকে জাহাজে ইউরোপে পাড়ি দেবেন। এলাহাবাদে নেমে দেখলেন—মহাকুম্ভের মহামেলার ধূমধাম চলছে। সারা ভারতের, এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও লক্ষ লক্ষ লোক এসেছে। নিখিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে—প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যে সব সাধু সন্ন্যাসী থাকেন, তাঁরাও মহাকুম্ভের আকর্ষণে প্রয়াগের ত্রিবেণীতীর্থে স্নান করতে পরমোৎসাহে সমবেত হয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির উপাসক শিল্পী শম্ভুনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক ভারতীয় সাধুদের সমন্বয় সন্দর্শনের এমন সুযোগ ত্যাগ করতে পারলেন না। শম্ভুনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল—চলন্ত যে কোন প্রাণীকে একটিবার দেখেই ক্যামেরার মত তার হুবহু চিত্র পেনসিল দিয়ে কাগজে এঁকে নেওয়া এবং পরে তার প্রসাধন করে সঠিক আলেখ্যে পরিণত করা। বড় একটা গ্লাডোষ্টন ব্যাগ তাঁর সংগের সাথী—সেটি নানাবিধ ছবি, স্কেচ, কেতাব, কাগজপত্র এবং আঁকবার সাজসরঞ্জামে ভরতি। ব্যাগটি নিয়েই তিনি মেলাস্থল লক্ষ্য করে এগুলেন।

বিরাট মেলা, বিশাল পরিধি, নানা বৈশিষ্ট্য তার। প্রাচীন ভারতের বহু নিদর্শন তিনি যেন জীবন্ত মেলাটির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর শিল্পী-মন বিহ্বল হয়ে পড়ল। বহু বস্তুর আলেখ্য তিনি ছকে নিলেন—ক্যামেরায় নয়, তাঁর নোট নেবার খাতার পাতায় পেনসিল দিয়ে। সাধুদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ছবি এঁকে নেবার অনুমতি দিলেন, আবার কেউ কেউ আপত্তিও করলেন। কিন্তু শম্ভুনাথ তাতে হতাশ হলেন না—মানুষকে একবার দেখলেই তাঁর প্রতিকৃতি ছকে নেবার এক অসাধারণ শক্তির সাহায্যে আপত্তিকারী সাধুদের ছবিও তিনি তাঁদের অজ্ঞাতে ছকে নিলেন। এইভাবে অপেক্ষাকৃত এক নির্জন স্থানে একটা

বৃহৎ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তার কাণ্ডের খাঁচে খাতাখানা রেখে এমনি এক আপত্তিকারী সাধুর দীর্ঘ জটাজুটসমন্বিত আকৃতিটা ছকে নিচ্ছেন—এমন সময় অপূর্ব এক সুন্দরী বালিকা ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল : তুমি জান বাঘটা কোথায় ?

শিল্পী অবাক হয়ে তার পানে তাকাতেই বালিকার মুখভংগি ও আকৃতি তাঁর শিল্পীমনকে চঞ্চল করে তুলল তার প্রতিকৃতি আঁকবার জন্যে। এমন মেয়ে তিনি বুঝি এই প্রথম দেখলেন। সাধুর ছবিটি তখন আঁকা হয়ে গেছে—তিনি কোন কথা না বলে বালিকাটির পানে চেয়ে চেয়ে কাগজে পেনসিল চালাতে লাগলেন।

মেয়েটি বলল : বা-রে, বেশ লোক ত তুমি! শুনতে পাচ্ছনা আমার কথা—বাঘ কোথায় ?

একরত্তি মেয়ের এমন সপ্রতিভ ভংগি এবং নির্ভীক কথা শুনে শম্ভুনাথ যেমন কৌতূহলী হলেন—ততোধিক আগ্রহ জাগল তাঁর এই ভংগির ছবিটাও ছকে নিতে। তাই আঁকতে আঁকতেই তাঁকে বলতে হল : একটু থামো, বাঘ দেখাচ্ছি।

চড়চড় করে আদলটি পেনসিলে এঁকে নিয়েই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড এক বাঘের ছবি এঁকে মেয়েটির সামনে তুলে দেখালেন,—এই ছাখ খুকি, কত বড় বাঘ !

মেয়েটি এক নজরে বাঘের ছবিটা দেখে মুখখানা বিকৃত করে বলল : ওত ছবির বাঘ !

আর একটি লোক ঠিক এই সময় গাছটার পাশ দিয়ে হন্ত দন্ত ভাবে এগিয়ে এলো। জামা কাপড় পরা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত তার চেহারা; মাথা খালি, টুপি নেই। ছুটে এসেই মেয়েটির হাত ধরে বলল : বা-রে খুকি, তুমি এখানে এসে গল্প করছ, ওদিকে বাড়িতে খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে—চলো।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে বলল : কেমন ভীড়ের ভেতর ঢুকে পালিয়ে এসেছি! তা তোমার বাঘ কোথায় ?

শম্ভুনাথ এই ফাঁকে বললেন ঃ বাঘ তো তোমাকে দেখালুম খুকি।

লোকটি শম্ভুনাথকে দেখে মুখখানা বেঁকিয়ে বলল ঃ আপনি কে ?

শম্ভুনাথ ঃ খুকি বাঘ দেখতে চাইলে কিনা তাই কাগজে বাঘটা এঁকে—

খুকি ঃ বাঘ না ছাই ! আমি জ্যান্ত বাঘ দেখবো। তুমি তো বাঘ দেখাবে বলে নিয়ে এলে ; সে বাঘ কোথায় গেল ?

শম্ভুনাথ বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি ব্যাপার বলুন ত' ? মেয়েটি আপনার—

লোকটি মুখখানার এক অপরূপ ভঙ্গি করে এবং শম্ভুনাথের কথাটা শেষ করবার আগেই বলল ঃ আরে মশাই, এর কথা বলেন কেন—বাঘ বাঘ বলে অস্থির করে তোলে। মেলায় একটা সার্কেসের দল এসেছে —বাঘের খেলা দেখায় শুনে নিয়ে আসি, তারপর ভিড়ে হারিয়ে যায়। কি আমার ভোগান্তি—চল বাঘ দেখাই—

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই লোকটি মেয়েটিকে খপ করে কোলে তুলে যেন ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গেল। শম্ভুনাথ তার পানে চেয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর ছবি আঁকার খাতা ও পেনসিলটি পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটির ভিতর পুরে কি ভেবে এগিয়ে চললেন—যেদিকে লোকটি মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই বাধা দিল—সন্ন্যাসীদের এক মিছিল। সেটা চলে গেলে চারদিকে চাইতে চাইতে তিনি বৃহৎ মেলাস্থল পেরিয়ে উঁচু এক সড়কে উঠলেন। সেখান থেকে নিচের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি এবং ত্রিবেণীর দৃশ্যটি যেন ছবির মত চোখে ভেসে উঠল। শিল্পীর মনও সেই সংগে মেতে উঠল—পুনরায় ব্যাগ খুলে খাতা পেনসিল বার করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য আঁকতে লাগলেন।···

বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবকও ক্যামেরা নিয়ে এই ভাবে মেলায় ফটো তুলছিল। নাম তার লালবিহারী। শম্ভুনাথের ছবি তোলার ধারা তার নজরে পড়লো। বিশেষ পরিচ্ছদধারী বিশেষ আকৃতির

একটি মানুষকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এভাবে ছবি আঁকতে দেখে সে চমকে উঠল। সাধারণত এরূপক্ষেত্রে ক্যামেরা নিয়েই ছবি তোলবার প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু এই লোকটি ক্যামেরা ছেড়ে খাতার কাগজে পেনসিলে ছবি একে নিচ্ছে—ভারি তাজ্জব ত! ফলে লালবিহারীর মনেও কৌতূহল জাগ্রত হয়ে উঠল। সে চুপি চুপি শিল্পীর পিছনে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে তাঁর চিত্রাংকন দেখতে লাগল। চোখে-দেখা পরিচিত দৃশ্যটির হাতে-আঁকা নিখুঁত প্রতিকৃতি দেখে লালবিহারী চমৎকৃত হোল, সংগে সংগে তার অজ্ঞাতেই বুঝি বিস্ফারিত মুখ দিয়ে স্বর ফুটে বেরুল : বা জী বা!...

শম্ভুনাথের স্কেচটা তখন শেষ হয়েছে, তিনিও মুখখানা ফিরিয়ে তার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। লালবিহারী বলে উঠল : খাসা আপনার হাত স্যার। ক্যামেরা ছেড়ে পেনসিলে স্কেচ করচেন দেখে দেখার লোভ সামলাতে পারিনি। আমিও ছবি তুলছিলুম কিনা—তবে ক্যামেরায়।

হো হো করে হেসে উঠে শম্ভুনাথ বললেন : তাহলে সমগোত্র বলো, আমরা এক জাতের লোক। এখন আমার একটা উপকার করতে পার?

ছেলেটি সবিনয়ে বলল : হুকুম করুন—

শম্ভুনাথ : দেখো, মহামেলার খানকতক ছবি এঁকেছি, এখন এগুলো ডেভালাপ করতে চাই। এই মেলার কাছাকাছি নিরিবিলি একখানা ঘর আমাকে যোগাড় করে দিতে পারো—অবিশ্যি আমি ভাড়া দোব।

ছেলেটি একটু ভেবে বলল : ঘর একটা পেতে পারেন—আজই খালি হচ্ছে। ঘরখানি আমিই ভাড়া করেছিলাম—আমার বেশ সুট করেছিল, কিন্তু আমাকে আজই বোম্বে যেতে হচ্ছে—ঘরখানা তাই ছেড়ে দিয়েছি। নিচে দোকান, ওপরে একখানা বড় ঘর, সেই সংগে বারান্দা—কাছেই, চলুন না দেখবেন; আমিও সেখানে যাচ্ছি।...

খুসিমনেই শম্ভুনাথ ছেলেটির সংগে চললেন। বাসা দেখে তাঁর

পছন্দ হল। ভাড়াও বেশী নয়। শুনলেন, বাড়ীর মালিক এখানকার এক মস্ত ধনী বাঙালী। কর্ণেলগঞ্জে তাঁর বাড়ী। ঠিকানা জেনে নিয়ে শম্ভুনাথ একখানা টাংগা ভাড়া করে বাড়ীওয়ালার সংগে দেখা করতে চললেন।

॥ দুই ॥

কর্ণেলগঞ্জে বড় রাস্তার উপরেই ধনকুবের হরপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীখানি ছবির মত পথচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। রাস্তার গায়েই ফটক, তার পরে বিস্তীর্ণ হাতা বা অঙ্গন। রাস্তার দিকের অংশটি উঁচু ফ্যান্সি লোহার রেলিং দিয়ে প্রাচীরের মত ঘেরা, রাস্তা থেকেই বাড়ীর সামনেটা দেখা যায়। একটু তফাতে আস্তাবল। তার পরে বাগান। বাগানের পরে এই বাড়ীর আর এক অংশ চোখে পড়ে। আলাদা হলেও এই বাড়ীটিরই সংলগ্ন।

শম্ভুনাথ টাংগা থেকে নেমে ব্যাগটি হাতে নিয়ে ফটকের দরজাটি ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। এত বড় বাড়ী, বিস্তীর্ণ হাতা, আস্তাবল, উদ্যান, প্রত্যেকটির আভাস পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু লোকজনের কোন নিদর্শন নেই। খানিকটা গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন—ভিতর থেকে কলরব এবং ওদিক থেকে ঘোড়ার হ্রেস্বাধ্বনি ও পদশব্দ কান পেতে শুনলেন। তারপর একটু থেমে একটু ভেবে হন হন করে বারান্দায় উঠে দেখলেন একটু দূরে একটা বড় দরজা খোলা রয়েছে—সেই পথে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, গড়গড়ার গুড় গুড় শব্দের সংগে অম্বরী তামাকের সুবাস হাওয়ার সংগে ভেসে আসছে। বুঝলেন ঐ ঘরেই কেউ আছেন— সম্ভবত গৃহস্বামী। ঘর লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন তিনি।

সেই ঘরখানাই প্রাচীন পদ্ধতিতে সাজানো গৃহস্বামীর বৃহৎ বৈঠকখানা। নিচু পায়ার কতকগুলি তক্তপোষের উপর সুশ্রী কার্পেট

বিছানো। পর পর অনেকগুলি তাকিয়া। একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে গৃহস্বামী হরপ্রসাদ ঘোষ সটকা টানতে টানতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। স্বাস্থ্যপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, দাড়ি গোঁফ কামানো, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন সুপুরুষ তিনি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও চুলে এখনও পাক ধরেনি এবং দেহের বাঁধুনি ও শ্রীছাঁদের জন্যে বয়স আরো কম মনে হয়। ঘরের দেওয়ালে বৃহৎ আয়তনের এবং দুষ্প্রাপ্য দেওয়ালঘড়ি, জমকালো ফ্রেমে বাঁধানো নানা রকমের ছবি—গৃহস্বামীর রুচি ও সমৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে।

শম্ভুনাথ ঘরে ঢুকেই হাতের ব্যাগটি তক্তপোষের উপর রেখে নমস্কারের জন্য হাত দু'টি যুক্ত করেছেন—গৃহস্বামী হরপ্রসাদও সংগে সংগে তখনি পদশব্দ শুনে মুখ তুলে চেয়ে অপরিচিত আগন্তককে দেখে সোজা হয়ে বসেছেন এবং উভয়ের মধ্যে সবেমাত্র চোখোচোখি হয়েছে, এমন সময় শম্ভুনাথই সহর্ষে বলে উঠলেন ঃ বাহোবা কি বাহোবা! মিলিওনিয়ার্ড বাবু হরপ্রসাদ ঘোষ transfered to my old friend হরু!

আগন্তকের উচ্ছ্বাসে গৃহস্বামী হরপ্রসাদ কিন্তু একেবারে স্তম্ভিত। লোকটা বলে কি? পাগল নাকি! পলকে মুখখানা শক্ত করে তিনি একটু তিক্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার নাম কি বলুন ত'—কোথা থেকে আপনি আসছেন?

পরিহাসের ভংগিতে শম্ভুনাথ বললেন ঃ উত্তম পুরুষটা নাই বা ব্যবহার করলে হে! আমি ত' সুরু থেকেই মধ্যম পুরুষ চালিয়েছি। তাছাড়া তোমার চাঁচাছোলা মুখখানা একনজরে চিনেও ফেলেছি। তুমি কিন্তু এখনো অন্ধকারে পড়ে—স্যরি!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটিকে চেয়ে চেয়ে দেখেও পরিচিতির কোন সূত্র না পেয়ে বিরক্তভাবেই হরপ্রসাদ বললেন ঃ আপনি ত' অদ্ভুত মানুষ দেখছি! নামটাই আগে বলুন—

শম্ভুনাথ ঃ এ! এখনো আঁধার কাটল না হরু—ছুয়ো! ধরে

নিলুম, মুখখানা না হয় চুলের জঙ্গলে ভরে গেছে, কিন্তু এটা ত' ঠিক আছে—এ দেখেও চিনতে পারছ না এর মালিকটিকে ?…

কথার সংগে সংগে শম্ভুনাথ হরপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে হাতের মোটা মোটা আঙ্গুল দিয়ে তাঁর টিকালো নাকের ডগাটি টিপে ধরে উঁচু করে তুলে ধরলেন।

গৃহস্বামীর চোখ ছুটি এতক্ষণে বড় হয়ে উঠল—ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন : তুমি কি তাহলে নাকু ?

হো হো করে হেসে উঠলেন শম্ভুনাথ—সেই সংগে হাতে তালি দিয়ে নৃত্যভংগিতে স্থুর করে বলে উঠলেন : ইয়া! এতক্ষণে সালুক চিনলেন গোপাল ঠাকুর! আমিও নাকুর দৌলতে হরুরে পেলুম—তাক্ ডুমাডুম্-ডুম্।

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে শম্ভুনাথের হাতখানি ধরে ফরাসে বসিয়ে হরপ্রসাদ বললেন : থামো বন্ধু থামো, বোস। এখুনি লোকজন ছুটে আসবে তামাসা দেখতে—

শম্ভুনাথ : সে ভয় নাস্তি—বাইরের দেউড়ী থেকে ঘরের দরজা পর্যন্ত একবারে গড়ের মাঠ, জনমানবের সাড়া পাইনি। আমি ত' ট্রেসপাসার-আসামীর মত ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকেছি—তোমার ঐ অম্বরির ধোঁয়াটিকে ভরসা করে। নলটা এগিয়ে দাওহে—গলাটা শুকিয়ে গেছে—

হরপ্রসাদ হাত বাড়িয়ে নলটি নিয়ে হাত দিয়ে মুছে শম্ভুনাথের হাতে দিলেন। তামাক খেতে খেতে ছুই বন্ধুর মধ্যে আলাপ চললো। শম্ভুনাথের ভাগ্য বিপর্যয়সূত্রে তাঁর নূতন সংকল্পের কথা শুনে হরপ্রসাদ বললেন : এই বয়সে বিদেশে গিয়ে আর বিদ্যে যাচাই করে কাজ নেই ভায়া। ২৫ বছর পরে মোলাকাৎ যখন হয়েছে, ছাত্রজীবনের স্বপ্নটা এসো অতঃপর স্বার্থক করা যাক।

॥ তিন ॥

কলকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে একই মেসে থেকে এঁরা কলেজে পড়তেন। সহপাঠীরা সবিস্ময়ে এঁদের সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা করত। তাছাড়া, হরপ্রসাদের গোলাপফুলের মত গায়ের রঙ আর শম্ভুনাথের গড়ুরের মত টিকালো নাক দেখে তারা তুই বন্ধুর নামকরণ করেছিল— 'রোজ য়্যাণ্ড নোজ।' এঁরাও তখন বলেছিলেন—কর্মজীবনেও আমরা এই সম্প্রীতি বজায় রাখবো—এমন কি, যদি কারুর ছেলে হয় আর কেউ হয় মেয়ের বাবা—আমরা কিন্তু তখন এই বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে বৈবাহিক হব।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে হরপ্রসাদ বোম্বের এক ধনী বাঙালীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে সেখানেই রয়ে গেলেন—যিনি এক দিকে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং এক বিরাট ব্যবসায়ের মালিক। এখন শ্বশুরের অবর্তমানে সেই কারবারের তিনি মালিক হয়েছেন। আর শম্ভুনাথ কলকাতায় চলে গেলেন। সেখানে শিল্প সাধনায় স্বাধীন-ভাবে ব্রতী হলেন।

কিছুকাল চিঠি লেখালিখি চলেছিল; তারপর তু'জনেই কাজের ভীড়ে ছাত্রজীবনের স্মৃতি সব ভুলতে থাকেন। পঁচিশ বছর পরে এই দেখা এবং পূর্বস্মৃতির পুনর্বিকাশ। একমাত্র সম্বল দশবছরের ছেলেটিকে মামার তত্ত্বাবধানে রেখে শম্ভুনাথ বিদেশে নিরুদ্দেশযাত্রায় বেরিয়েছেন শুনে হরপ্রসাদ যেন মারমুখী হয়ে উঠলেন। বললেনঃ পর নিয়ে আমাকে বিশাল টাটটা বজায় রাখতে হয়েছে। বোম্বায়ে মস্ত কারবার। অন্যান্য মোকামেও তার ব্রাঞ্চ রয়েছে। ভগবান যা দিয়েছেন— সাতপুরুষ বসে খেলেও ফুরুবেনা। কিন্তু খাবে কে? সংসারে স্ত্রী আর বছর ছয়ের একটি মেয়ে। হিসেব করেই ভগবান তোমাকে ঠিক সময়ে টেনে এনেছেন হে! এখন তোমার ছেলেকে আনাও; এসো

একসঙ্গে থাকি—আমি তোমাকে আমার কারবারের পার্টনার করে নেব।

ছেলের কথা উঠতেই শম্ভুনাথ সগর্বে বললেন: ছেলে আমার রত্ন হে? যে দেখে সেই বলে—যেন রাজপুত্তুর—হ্যাঁ, তার এ বয়েসের ছবি একখানা আছে ব্যাগে—দেখলেই মালুম হবে।

ব্যাগ খুলে ছবিখানা দেখাতেই হরপ্রসাদ আহ্লাদে যেন নেচে উঠলেন, বললেন: দেখ ভাই, এখন থেকেই আমার কাজ হয়েছে কি জান, মনে মনে আমার মেয়ের যোগ্য সুন্দর ছেলের রূপ কল্পনা করে মনকে তুষ্ট করা। কিন্তু সত্যি করে বলতে কি—তোমার ছেলের ছবি আমার কল্পনাকেও হারিয়ে দিয়েছে। জানত,—বোম্বাই রূপের সহর, এমন রূপবান ছেলে সেখানেও দেখিনি। ভাল কথা, তোমার ছেলের নাম?

শম্ভুনাথ জানালেন: নরনারায়ণ।

উচ্ছ্বাসের সুরে হরপ্রসাদ বললেন: বা! চমৎকার নাম রেখেছ ছেলের। হ্যাঁ, এখন আমার মেয়ে রেণুকে ডাকি। তুমি দেখালে ছায়া—আমি কায়া দেখাই। হ্যাঁ, তুমি জামা কাপড় ছাড়। আমি ভেতরে খবর দিয়ে আসি।

হরপ্রসাদ ছবিখানি নিয়েই বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। রূপবতী মেয়ের কথা উঠতে শম্ভুনাথের মানস-চোখে তখন পথে দেখা সেই রূপবতী মেয়েটির অপরূপ আকৃতি ভেসে উঠল। শিল্পীর মন—অমনি সব ভুলে গেলেন। সেখানে ব্যাগটি খোলাই ছিল—তার ভিতর থেকে সেই খাতা ও ছবি আঁকার সরঞ্জাম বার করে ছবিটির পেনসিলের দাগের উপর কালির আঁচড় দিয়ে সেটিকে আরো স্পষ্ট ও পরিস্ফুট করতে লাগলেন।

হরপ্রসাদের স্ত্রী অনুপমা আদর্শ নারী ও আদর্শ গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রী নিয়ে সংসার হলেও অতিথি অভ্যাগত বাড়ীতে লেগেই আছে। বিশেষত মহাকুম্ভের মহাযোগ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নিকট ও

দূরতম সম্পর্কসূত্রে বহুলোকই এসেছেন। যেখানে যেখানে মোকাম আছে, সেখানকার কর্মচারীদের পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের শুভাগমনও হয়েছে। তা'ছাড়া পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সুপারিশপত্র নিয়ে বহু অপরিচিতও এঁদের আতিথ্য স্বীকার করেছেন। বৃহৎ বসতবাটির পিছনে বিস্তীর্ণ বাগানটির পরেই এঁদের এই 'গেষ্ট হাউস' বা 'অতিথিশালা'। মহামেলা উপলক্ষে সেখানেও যেন মেলা বসে গেছে।

নানা বয়স ও নানা সমাজের লোক। পাকশালায় ৫।৭ জন পাচক রন্ধন কার্যে ব্যস্ত। ১০।১২ জন দাসদাসী তাদের খিদমত খাটছে। পাছে বিশৃঙ্খলা ঘটে বা অতিথিদের অসুবিধা হয়, সেজন্য অনুপমাদেবীকে ঘন ঘন ও বাড়ীতে গিয়ে পরিদর্শন করতে হচ্ছে। কোন বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম হলেই এবাড়ী থেকে তাঁকে বাগানের সোজা পথে ওবাড়ীতে ছুটতে হয়।

ছবিখানা হাতে নিয়ে হরপ্রসাদ বাড়ীর ভিতরে গেলেন। নিচের তলায় কাউকে না দেখে ওপরতলায় উঠে ডাকলেন কোথায় গো? কাউকে দেখছি না যে?—

একটি পরিচারিকা ছুটতে ছুটতে এসে উপরে বলল: মা ওবাড়ী গিছলেন, আসছেন।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন: রেণুও বুঝি সংগে গেছল? সে এসেছে?

পরিচারিকা বলল: না ত'।

হরপ্রসাদ বললেন: যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

বাড়ীতে গৃহিণী বা ভৃত্যদের কাউকে না পেয়ে হরপ্রসাদবাবু একটু বিরক্তভাবেই বলে উঠলেন: ভারী মজা পেয়েছে সব—সবাই জুটেছে ওবাড়ীতে। একটা চাকর পর্যন্ত নেই।

অনুপমাদেবীও ওবাড়ীর কাজ সেরে ব্যস্ত ভাবেই এবাড়ীতে আসছিলেন। সিঁড়িতে উঠেই স্বামীর কথাগুলো শুনতে পেলেন। তিনিও বলতে বলতে এলেন: চাকরদের দোষ কি বল? অতগুলো

রাঁধুনিকে যোগাড় দিতে ঠিকে ঝি চাকর সব হিমসিম খাচ্ছে। তাই না কানাই আর বেচুকে পাঠাতে হল।

গৃহিণী আসতেই হরপ্রসাদ কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেন: এদিকে এবাড়ীতেও এক অতিথি উপস্থিত যে—তাঁকে এখন কে দেখে?

অনুপমা: কেন, ওবাড়ীতেই পাঠাতে পারতে। তিনশ অতিথি রয়েছে ওখানে, আর এঁর জায়গা হবে না!

হরপ্রসাদ: নাগো না—ইনি তোমার মেলা দেখনেওয়ালা অতিথি নন—নৈলে তাঁর তদ্বির করতে নিজে ছুটে আসি!

অনুপমা: কে তিনি শুনি?

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাতেই তাঁর হাতের ছবিখানা চোখে পড়ল। তখনই সুধালেন: কার ছবি গা?

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাতে ছবিখানা দিয়ে হরপ্রসাদবাবু বললেন: আগে ভাল করে দেখ ত'।

ছবিখানা দেখতে দেখতেই অনুপমা বলে উঠলেন: বা! চমৎকার ছেলেটি তো—কি রূপ!

হরপ্রসাদ: তাহলে পছন্দ হয়েছে বল?

অনুপমা: কথাটা ভেঙেই বল না!

হরপ্রসাদ: আমার সেই কলেজের বন্ধু নাকুর কথা বলতুম না—তারই ছেলের ছবি। হঠাৎ সে এসে গেছে।

অনুপমা: তাই নাকি?

হরপ্রসাদ: তা'বলে ছেলেকে সে সংগে করে আনেনি। শিল্পী মানুষ কিনা; ছবিখানাই এনেছে। আমিও তাই ছুটে এসেছি আমাদের জ্যান্ত ছবিটা দেখাব বলে! রেণু কোথায়?

অনুপমা: কেন—রেণু তোমার কাছে ছিল না?

হরপ্রসাদ: আমার কাছে! বাইরের ঘরে আজ সে যায়ই নি!

পরিচারিকা এসে বলল: কই, দিদিমণি ত' ওবাড়ীতে নেই—

হরপ্রসাদ: নেই কি! কোথায় গেল সে? আস্তাবলে দেখত!

অনুপমা ঃ আস্তাবলে কি করতে যাবে সে?

হরপ্রসাদ ঃ কেন জান না, টাট্টু ঘোড়াটাকে কেনা অবধি সেটাকে যেন পেয়ে বসেছে তোমার মেয়ে—তার পীঠে চড়বেই। সেদিন যে কাণ্ড বাধায়,—বাইরের উঠোনে রাস্তার লোক জমে গিয়েছিল মনে নেই! 'ঘোড়ার পিঠে 'চাবু' করবেন তিনি'! সেখানে গিয়েই সইসদের জ্বালাচ্ছে—

পরিচারিকা ছুটে নেমে গেল—তার ডাক শোনা গেল—"দিদিমণি, অ—দিদিমণি, কর্তাবাবু ডাকছেন যে।"

হরপ্রসাদ বললেন ঃ আমি নিজেই দেখছি। হ্যাঁ, তুমি নাকুর জল খাবারের ব্যবস্থা কর, আর কানাইকে শীগ্‌গীর ডেকে পাঠাও।

কিন্তু আস্তাবলেও রেণুকে পাওয়া গেল না। সম্প্রতি কালো রঙের একটি বর্মী টাট্টু কিনেছেন হরপ্রসাদ। সেই ঘোড়াটির পিঠে চড়ে বাঘ শিকার করতে যাবে—এই ঝোঁক হয়েছে তাঁর এই দুঃসাহসিকা মেয়েটির। সেদিন হয়েছিল কি—সহিস ঘোড়াটিকে সাজিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে এনেছে; এমন সময় মেয়েটি কাপড়ের আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে একবারে ঘোড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবদার ধরল—আমি এর পিঠে চড়ব। তারপর সহিসের মানা ঠেলে সহিস এবং ঘোড়ার অঙ্গ অবলম্বন করে সত্যি সত্যিই তার পিঠে উঠে বসল—সেই সংগে সহিসের হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নিতে কাড়াকাড়ি কাণ্ড! একরত্তি মেয়ের এই দুঃসাহসিক কাণ্ড দেখতে বাইরে রাস্তায় তখন কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু এই সূত্রে একটি সুবিধাবাদী লোকের চোখে মেয়েটি সেদিন যে স্ফুলিঙ্গ তুলেছিল, সে খবর কেউই রাখেনি এবং সবার অজ্ঞাতে রাস্তায় সেই লোকটির সংগে আর একটি লোকের চোখে চোখে উভয়ের দুষ্ট ইঙ্গিতটিও কেউ লক্ষ্য করেনি।

ছবিখানি হাতে করে উৎকণ্ঠিত ভাবে বাইরের ঘরে ঢুকে হরপ্রসাদ ছবিখানা ফরাসের উপর রেখে বললেন: ভারি ভাবনার কথা হোল ত', মেয়েটাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না! তোমার ছেলের এই ছবির সংগে তাকে মেলানো হল না।

শম্ভুনাথ এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে তাঁর আঁকা ছবিখানায় রঙ ফোটাচ্ছিলেন। এই মাত্র তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তিনি এ কার্যে এমনি নিবিষ্ট ছিলেন যে, ভিতর থেকে একটা কলরব অর্থাৎ খোঁজা-খুঁজির ব্যাপারে বিভিন্ন কণ্ঠের উৎকণ্ঠার উচ্ছ্বাস তাঁর কানেও পৌঁছায়নি।...

বন্ধুকে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকতে দেখে উদ্বেগ বিস্ময়ে শম্ভুনাথ সেদিকে চেয়েই চমকে উঠলেন; সেই সংগে তাঁর কণ্ঠ দিয়ে অতি বিস্ময়ের সুরে বন্ধুর উদ্দেশে প্রশস্তি বচন বেরিয়ে এল: য়্যা! তুমি অন্তর্যামী নাকি হে—না দেখেই আন্দাজে আমার মেয়ের ছবিটা নিখুঁত করেই এঁকে ফেলেছো!...

হরপ্রসাদের উপস্থিতি শম্ভুনাথ জানতে পারেনি। কথাগুলি শুনেই চমকে উঠে যেই তিনি মুখখানা তুলেছেন—হরপ্রসাদ তখনি বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন: ভারি আশ্চর্য ত'—আমার মেয়েকে তুমি জীবনে দেখনি, অথচ তার চেহারাটি এখানে বসে বসেই অবিকল এঁকেছ?

ততোধিক বিস্ময়ে শম্ভুনাথ বললেন: তোমার মেয়ে!

হরপ্রসাদ: এই ত' আমার মেয়ের ছবি!

শম্ভুনাথ: বল কি! কিন্তু তুমি ত' তোমার মেয়েকে আনতে গেলে!

হরপ্রসাদ: এ-বাড়ী ও-বাড়ী খুঁজেও তাকে পেলুম না—চাকর দারোয়ানদের খুঁজতে পাঠিয়েছি। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না তুমি তারই ছবি...

শম্ভুনাথ: তাহলে কি মেলার মধ্যে তোমার মেয়েকেই দেখে আমি এ ছবি এঁকেছি!

হরপ্রসাদ ঃ তার মানে ?

শম্ভুনাথ ঃ একটা মজার গল্প।

শম্ভুনাথ তখন ছবি সংক্রান্ত মেলাস্থলের ব্যাপারটি বন্ধুকে আগা-গোড়া বলতে লাগলেন। মেয়েটিকে দেখেই তিনি যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর চোখ দু'টি ভরে গিয়েছিল, তাঁর শিল্পী মন তাই রূপাংকনের সে সুযোগটুকু ছাড়তে পারেন নি বলেই ছবিখানির একটা স্কেচ সেখানে এঁকে ফেলেন। এখানে সেটাকে এতক্ষণ ধরে কালিতে দেগে ভাল করে ফুটিয়ে তুলেছেন—একটি একটি করে সবই বলে গেলেন শম্ভুনাথ। বক্তব্য কথাগুলি শেষ হতেই জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় বললেন ঃ কিন্তু সেই লোকটি এমন কায়দা করে মেয়েটিকে কোলে তুলে বাঘ দেখাবার জন্যে নিয়ে গেল যে সন্দেহ করবার মত কিছুই ছিলনা—তবুও আমি যে তার অনুসরণ করেছিলেম, সেটা হয়ত খেয়ালে কিংবা মেয়েটির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে। কিন্তু সামনে সন্ন্যাসীদের একটা মিছিল আসায় বাধা পড়ে যাওয়ায় তাদের আর নাগাল পাইনি।

জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে হরপ্রসাদ বললেন ঃ তাহলে মেয়েটাকে দেখছি সেই লোকটাই ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। বাঘ দেখবার ওর ভারি ঝোঁক। সেদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বলে কি জানো—'এ আমার পক্ষীরাজ, এর পিঠে চড়ে আমি বাঘ শিকার করতে যাবো।' ছ' বছরের মেয়ের মুখে এ রকম পাকা কথা, তার ওপর তার আশ্চর্য রূপটি যে এক শ্রেণীর লোকের কাছে লোভের বস্তু, এটা ভেবে আমাদেরই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। গিন্নী অতিথিদের খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করতে ও বাড়ীতে ব্যস্ত ছিলেন, চাকরবাকররাও ফাইফরমাজে ফেঁসে পড়ে। সেই ফাঁকে মেয়েটি বোধ হয় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। যাক্ এখন কি করা যায়—

শম্ভুনাথ বললেন ঃ এখুনি পুলিসে খবর দিতে হবে। আর, মেয়ের যদি ফটো থাকে ত' ভালই, নতুবা আমার আঁকা স্কেচখানা তোমার মেয়ের বলেই যখন মেনে নিয়েছ, এইখানাই কাজে লাগানো যাবে।

হরপ্রসাদ একটু ঝুঁকে দেওয়ালের গায়ে লাগানো আলমারির ডালাটা খুলে ব্রোমাইড করা ফটো একখানি বার করে বন্ধুর সামনে রেখে বললেন : দেখ, ভাল করে মিলিয়ে নাও—আসল যখন মিলছে না, নকল থেকেই—

শম্ভুনাথ ইতিমধ্যে ফরাসের উপর রাখা তাঁর ছেলের ছবির পাশে বন্ধুর মেয়ের ফটোখানা রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

হরপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাঢ় স্বরে বললেন : বাঃ, বেশ মানিয়েছে দু'টিতে, না !...

শম্ভুনাথ আর্তস্বরে বলে উঠলেন : কিন্তু দুটোই নকল, আসল কেউ হাজির নেই।

হরপ্রসাদ বললেন : ব্যাপারটা তুমি যা শোনালে গিন্নীকে বলে আসি। এ হাঙ্গামায় তোমার মুখ হাত ধোওয়া, জলটল খাওয়া সব—

শম্ভুনাথ বললেন : সে হবে'খন, ওসবের আগে তুমি পুলিস আফিসে খবরটা পাঠাও, তাড়াতাড়ি যাতে তদ্বির হয়, সে ব্যবস্থা কর।

এই সময় ভৃত্য কানাই এসে বলল : বাবু, এনার হাতমুখ ধোবার জল, জলখাবার সব পাশের ঘরে থুয়েছি, এখন উঠতে আজ্ঞা হয়।

মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে শম্ভুনাথ বললেন : এ কাজটাই তোমাদের বড় হল, বললাম না আগে—

হরপ্রসাদ বললেন : সে হবে। এখন ওঠত !....ভয় নেই, ওসব থাক এখানে, কেউ হাত দেবে না।

শম্ভুনাথ বিদ্রূপের সুরে বললেন : ভরসাই বা কি বল ! বাড়ীর মেয়েকেই সামলে রাখতে পারনা, এ সব তো নির্জীব পদার্থ।

কথাগুলি বলেই শম্ভুনাথ হেসে উঠলেন। হরপ্রসাদ বন্ধুর হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে চললেন। সেখানে তোষাখানা সংলগ্ন ঘরে প্রসাধন এবং স্বতন্ত্র কক্ষে খাবার টেবিলে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন বাড়ীর গৃহিণী এই বিপত্তির মধ্যেও।

॥ চার ॥

রেণু মেয়েটিকে প্রথম দিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাঘ শিকার করতে যাবার আস্ফালন করতে দেখে বাইরের যে লোকটির তার ওপর নজর পড়ে এবং বাঘ দেখাবার ছলে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, লালাজী নামে সে লোকটি একটি বিশেষ অপরাধী দলে সংশ্লিষ্ট। লোকটি বহুরূপী। প্রথম দিন যখন রেণুকে দেখে, সেদিন এর রূপ ছিল —বিবেকানন্দের সাধারণ ছবির ঢংএর চেহারা, তেমনি পাগড়ী, তেমনি কাপড় জামা পরা, হাতে লম্বা বেতের লাঠি, পায়ে নাগরা জুতা, অধিকন্তু চোখে নীল চশমা।···যেদিন রেণুকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় ও মেলায় শম্ভুনাথের সংগে দেখা হয়, সেদিনের রূপসজ্জা—সাধারণ ভদ্র বাঙালীর মত—খালি মাথা, গায়ে পাঞ্জাবী, ধুতি পরা, চোখ ও মাথা খালি, হিটলারী প্যাটার্ণের নাকের নীচে একটু গোঁফ—দাড়ি নেই, চোখও খালি, পায়ে চপ্পল।

লালাজী আসলে সিন্ধুদেশের লোক। কিন্তু হিন্দী, বাংলা, উর্দ্দু, গুরুমুখী, পাঞ্জাবী ও গুজরাটি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলিতে এমনি পাকাপোক্ত যে, যখন যে ভাষায় কথা বলে—সেই ভাষাভাষী দেশের লোক বলেই মনে হয়। এমন পণ্ডিত লোক বিভিন্ন ভাষায় এত ব্যুৎপত্তি—কোন বড় কাজে না লাগিয়ে লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এমন একটা বৃত্তি বেছে নিয়েছে যেটা অত্যন্ত ঘৃণিত এবং কদর্য। সিন্ধুর কোন কুখ্যাত দলের সংগে মিশে লালাজী নারীচালানী ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় এবং একটা ব্যাপারে ধরা পড়ে দণ্ড ভোগ করে স্থানীয় কারাগারে। আবার জেলখানায় লালাজীর এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ ঘটে—তার বয়স ও বিবিধ বিদ্যার সমন্বয় দেখে দাদাজী বলে তাঁকে সসম্মানে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ইনি ফ্রেঞ্চ ল্যাটিন ইংলিশ জার্মান হিব্রু ভাষা থেকে

এ দেশের সব ভাষাতে যেমন ওস্তাদ—মতবাদও তেমনি অদ্ভুত। সে যুগে দ্রোণাচার্য ছেলেদের বাগিয়ে দল তৈরী করে দ্রুপদের মতন দাম্ভিক রাজাকে জব্দ করেছিলেন, সেই আদর্শে এ যুগে ইনিও ছেলেদের নিয়ে একটি দল তৈরী করে তাঁর কোন বিরুদ্ধবাদীকে সায়েস্তা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান—তার ফলে কারাদণ্ড হয়। মস্ত এক ধনীর একমাত্র মেয়েকে ইনি পড়াতেন। মেয়েটি রূপসী ত বটেই উপরন্তু কোটিপতি পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

ছাত্রীটিকে একদা প্রেম নিবেদন করতে গেলে তেজস্বিনী ছাত্রী তাঁকে এমন অপদস্থ করেন এবং তাঁর পিতাও কঠোর হয়ে ওঠেন—যার জ্বালা ইনি ভুলতে পারেননি। দুর্নীতিপরায়ণ কতিপয় ছেলেকে নিয়ে দল গড়ে প্রতিশোধ নিতে গিয়েই তিনি ধরা পড়ে যান এবং বিচারে দণ্ডিত হন। জেলেই দুই দলওয়ালা মস্তিষ্ক চালনা করে ভাবী কর্মপন্থার যে পরিকল্পনা করেন—আগ্রার সিদ্ধাশ্রম তারই বিস্ময়কর সৃষ্টি। লালাজী বলেন—ছেলের যুগ চলে গেছে, এখন মেয়ের যুগ এসেছে। মেয়ে নৈলে কিছুই চলে না, বড় বড় আশ্রম প্রতিষ্ঠান সংঘ সংস্থা দেখুন—মেয়েরা সেখানে মেরুদণ্ডের মত জড়িয়ে আছে। একটা বড় আশ্রম খুলে তার মধ্যে মেয়েদের রাখতে হবে—দেখবেন তার ফল কি হয়! যে বয়সের মেয়েকে ধরে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে ক্রমে তার অতীত ভুলিয়ে দেওয়া যায়, বেছে বেছে সেই বয়সের মেয়ে এনে তাদের তৈরী করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যেই মেলাস্থলটির এমন এক নিরিবিলি অংশে এদের শিবির পড়েছে, যে দিকটা সবাই এড়িয়ে যায়—বড় একটা নজর পড়ে না···কিন্তু প্রথম আমদানীর বালিকাদলটির কান্না শুনেই স্বামীজী হতাশ হয়ে বলেন—এই সব প্যানপেনে কাঁদুনে মেয়ে নিয়ে দল গড়া হয় না। তোমাদের নির্বাচনেই গলদ হয়েছে।

লালাজী মনে মনে একটু ভেবেই কথাটার জবাব দেয়—'আচ্ছা গুরুজী, এর পর তেমনি মেয়েই আনব, যারা কাঁদতে জানে না।'

লালাজীর ভাবনার মূলে থাকে রেণু মেয়েটি। এই দিনই সে তাকে হরপ্রসাদ বাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে টাট্টু ঘোড়ার পীঠে চড়বার জন্য ব্যগ্র দেখেছিল। সে তখন জিদ ধরেছিল—ঘোড়ার পীঠে চড়ে বাঘ শিকারে যাবে। সেই দেখাই হয়েছিল কাল। লালাজী তখনই মনে মনে স্থির করে রাখে, ফুরসদ একটু মিললেই মেয়েটিকে বাঘ দেখাবার ছলে ভুলিয়ে বাড়ীর বাইরে এনেই আশ্রমে চালান করে দেবে।

হরপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতে যখন রেণুর জন্যে হুলস্থুল পড়ে গেছে—তার সন্ধানে চারদিকে লোক ছুটাছুটি করছে, তখন সিদ্ধাশ্রমে আনন্দস্বামীর সামনে লালাজী সেই মেয়েটির হাতখানি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে ও চোখে সাফল্যের একটা তৃপ্তি ফুটে উঠেছে। রেণু মেয়েটিও তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি কপালের দিকে তুলে দাড়িওয়ালা সাধু ও তাঁর আসনটির পানে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তার চোখেমুখে ভয়ের রেখাও পড়েনি। স্বামীজীও বদ্ধদৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে তার প্রতি শিরাটি পর্যন্ত যেন পরীক্ষা করছেন।

রেণু মেয়েটিই প্রথমে কথা বলল। দৃষ্টিটা হঠাৎ স্বামীজীর মুখ থেকে লালাজীর মুখের ওপর ফেলে জিজ্ঞাসা করল : তুমি ত ভারি মিথ্যেবাদী—বাঘ কই ?

স্বামীজী লালার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন : বাঘ ?

লালা বলল : বাঘ দেখাবো বলেই একে…

চোখের ইংগিতে লালাকে নিরস্ত করে স্বামীজী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : বাঘ খুঁজছ খুকী—বাঘ ?

রেণু জবাব দিল : হ্যাঁ! বাঘ দেখাবে বলেই এই মিন্সেটা আমাকে নিয়ে এসেছে—এখানে।

স্বামীজী : ঠিক জায়গাতেই এনেছে—বাঘের ঘরেই তুমি এসেছ!

রেণু একটু বিরক্ত হয়েই বলল ঃ কেবলি ত' বাঘ বাঘ করছ— কিন্তু বাঘ কই? তুমি তাহলে বাঘ দেখাবে?

স্বামীজী ঃ বাঘ দেখলে ভয় পাবে না?

রেণু জবাব দিল ঃ না।

স্বামীজী ঃ আমিই বাঘ—হুম!

স্বামীজীর ভংগি ভীতিপ্রদ এবং মুখের হুংকার ব্যাঘ্র গর্জনের মত হলেও রেণু মেয়েটি নির্ভীক কণ্ঠে বলল ঃ দূর! তুমি ত সাধু! বাঘের ছালের ওপর বসে আছ বলেই বাঘ হয়ে গেলে! যাও, তোমাদের আর বাঘ দেখাতে হবে না; আমি বাড়ী যাব—আমাকে নিয়ে চলো।

স্বামীজী ঃ কি হবে বাড়ী গিয়ে—তুমি এখানেই থাকবে।

মুখখানা কঠিন করে রেণু বলল ঃ বয়ে গেছে আমার এখানে থাকতে; আমি বাড়ী যাবো। কি সুখে এখানে থাকবো?

স্বামীজী ঃ কেন, আমি কি মন্দ?

মুখখানা বিকৃত করে রেণু বলল ঃ তুমি ত একটা সঙ—ঝুটো দাড়ী পরে আছ।

লালাজী ত্রস্তভাবে বললেন ঃ ছিঃ! ওকথা বলতে নেই। সাধুরা কখনো কি ঝুটো দাড়ী পড়ে?

তুমি থামো! আমি যেন জানি না! সেদিন একটা লোক ঝুটো দাড়ী পরে সাধু সেজে এসে কেমন ধরা পড়ে গিয়েছিল! কানাই ত তাকে মেরেই ফেলত, মা এসে বাঁচিয়ে দিলে। তোমার দাড়ীও ত—

বলেই হঠাৎ মেয়েটি ছুটে গিয়ে দু'হাতে স্বামীজির দাড়ীটি ধরেই জোরে টান দিল। স্বামীজি সংগে সংগে তার কোমল হাত দুখানি চেপে ধরে কোলের কাছে টেনে বসিয়ে বললেন; দেখলে ত খুকী, আমার দাড়ী ঝুটো নয়—আসল, আর আমি সঙ নই—সাধু।

রেণু আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টার সংগে বলল ঃ সাধু হলেও তুমি সঙ। আমাকে ছাড়ো—তোমার দাড়ীর যা গন্ধ—মাগো!

স্বামীজি ঃ দাড়ী যদি তোমার পছন্দ না হয়, দাড়ী রাখব না।

ছাড়ো আমাকে—আমি বাড়ী যাব।

লালাজী ঃ বাঘ না দেখেই যাবে?

তোমরা সবাই মিথ্যুক—খালি খালি আমাকে ভুলিয়ে এনেছ। আমি বাঘ দেখতে চাই না—আমায় বাড়ী রেখে এসো।

স্বামীজী ঃ ওরা মিথ্যুক হলেও আমি মিথ্যুক হব না—তোমাকে বাঘের পীঠে চড়িয়ে তবে ছাড়বো।......লালাজীর দিকে চেয়ে এবার গম্ভীর স্বরে স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ সিদ্ধাশ্রম এবার সিদ্ধপীঠ হবে লালা—সিদ্ধিদাত্রীকে আমি পেয়েছি।

লালাজীর নূতন আমদানী এই বালিকাটির রূপ, স্বাস্থ্য ও সাহস দেখে স্বামীজী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। দ্রোণাচার্য্যের সাধনায় বাধা পেয়েছিলেন আগেই। এখন লালাজীর পরামর্শে ভবানীপাঠকের আদর্শে আর একটি দেবী চৌধুরাণী তৈরী করে তিনি দেশে একটা বিপর্যয় কাণ্ড বাধাবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—এই অদ্ভুত মেয়েটিকে পেয়ে। এরপর তিনি লালাকে বললেন ঃ আর সব মেয়েগুলিকে তুমি তোমার ইচ্ছামত তৈরী কর, এই মেয়েটির ভার কিন্তু আমি নিচ্ছি—আমি নিজের ইচ্ছামত করে একে গড়ে তুলব।

॥ পাঁচ ॥

ওদিকে অনুপমার নির্দেশ মত অবিলম্বে রেণুর সন্ধানের ব্যবস্থা হল। শম্ভুনাথের আঁকা স্কেচ দেখে এবং সে সম্বন্ধে সব কথা শুনে অনুপমা কেমন যেন মুসড়ে পড়লেন। কেবলই তাঁর মনে এই চিন্তাই খোঁচা দিতে লাগল—পঁচিশ বছর পরে হঠাৎ ইনিও এলেন বন্ধুর কাছে, আর আমাদের মেয়েটিও ঠিক সেই সময় চুরি হয়ে গেল। হরপ্রসাদ বন্ধুর সম্বন্ধে স্ত্রীর নিরুৎসাহভাব দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে বা কথার ওপর কঠোরভাবে প্রতিবাদ করতেও পারলেন না।

এর কারণ, অনুপমার বাবা ছিলেন বোম্বাই সহরের সেরা মার্চেন্ট; বাঙ্গালীর মধ্যে এত বড় প্রতিষ্ঠা অল্প লোকেরই হয়েছে। অনুপমাকে তিনি সুশিক্ষিতা করেন। অনুপমাই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বিবাহের পর শ্বশুরের ব্যবসায়েই হরপ্রসাদ লিপ্ত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সাহায্যেই সেই ব্যবসায় পরিচালনা করতে থাকেন। ব্যবসায়ী পিতার শিক্ষা ও সাহচর্যের সংগে অনুপমাদেবীর প্রখর বুদ্ধিদীপ্তি ও বিচারশক্তি থাকায় কোনরূপ ভাবপ্রবণতা প্রশ্রয় পেত না—স্বামী তাই পদে পদে পত্নীর পরামর্শ না নিয়ে পারতেন না। কিন্তু শম্ভুনাথ সম্পর্কে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। হরপ্রসাদ বন্ধু-প্রীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পত্নীর মনোভাব চেপে রেখে এমন সন্তর্পণে চলতে লাগলেন, যাতে বন্ধুর মনে কোন সন্দেহ না জেগে ওঠে। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন, আবার বন্ধুর যুক্তিও শোনেন।

শম্ভুনাথের ইচ্ছা—তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের সংগে দেখা করে নিজেই মেয়েটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাবার মঞ্জুরী আদায় করে নেন। কিন্তু অনুপমা স্বামীকে পরামর্শ দিলেন—তুমি নিজে কমিশনার সাহেবের সংগে দেখা করে সরকারের ওপর অনুসন্ধানের ভার দাও। লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণা করে একটা সাড়া জাগাও। এ ছাড়াও—অনুসন্ধানকারীদের জন্যে দশ হাজার টাকা দাখিল কর।

বাধ্য হয়ে সেই ব্যবস্থাই হরপ্রসাদকে করতে হল। অনুপমা স্বামীকে আরও একটা কথা মনে করিয়ে দিলেন। বললেন—লালবিহারী নামে যে ছেলেটি আমাদের ষ্টেশন রোডের বাড়ীতে থাকত, সেও তো গোয়েন্দা পুলিশে কাজ করে! রেণুকে সে জানত—কত ভালবাসত। একবার তার খোঁজ করে দেখ না—

হরপ্রসাদ বললেনঃ সে ছোকরা বোম্বাই না কোথায় যাবে শুনেছিলাম। সেই জন্যেই বাড়ী ছেড়ে দেয়। ভালো, এখন সন্ধান করছি তার।

হরপ্রসাদ স্থির করলেন, নিজেই গোয়েন্দা বিভাগের চীফের সঙ্গে

দেখা করে একথা পাড়বেন, লালবিহারীর সন্ধানও করবেন। শম্ভুনাথকে বললেন : তুমি ভায়া এসব ব্যাপারে মাথা না দিয়ে তোমার আঁকা ঝোঁকা নিয়ে থাক, ওরই চর্চা কর—তাতে শান্তি পাবে।

আরও বললেন : এসব কি জানো, যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে! গোয়েন্দারাই তদ্বির করুক, দরকার পড়লে তুমি বরং যা বলবার বলবে। তা বলে তোমাকে আমি ছুটোছুটি করতে দেব না।

শম্ভুনাথ তুলি চালাতে চালাতে বললেন : মেয়েটাকে খুঁজে বার করা নিয়ে কথা। মেয়ে চোরকে আমি যখন দেখেছি, আমাকেও প্রয়োজন হবে বৈকি! এখন কথা হচ্ছে যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বার করা চাই।

'তাহলে আমি একবার গোয়েন্দা আফিস থেকে ঘুরে আসি, তুমি যা করছ কর।'

—বলেই হরপ্রসাদ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মহাকুম্ভের এই মহামেলায় মেয়ে হারানো নূতন নয়—প্রতিবারই এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ হয়েছে, তাঁরাও পরবর্তী মেলার সময় বিশেষ সতর্ক ও অবহিত হয়েছেন, এমন বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু এবারকার মেলায় একই বয়সের এতগুলি মেয়ের অন্তর্ধান—বিশেষত হরপ্রসাদের মত ধনকুবেরের কন্যাটিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রীতিমত একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। খবরের কাগজে খবরটা কঠোর মন্তব্য সহ ছেপে বেরিয়েছে। লীডারের রিপোর্টার হরপ্রসাদবাবুর বাড়ীতে গিয়ে শম্ভুনাথের কাছ থেকে খবরটা আগা গোড়া জেনে যান। পরদিনই লীডারে হরপ্রসাদ, শম্ভুনাথ ও রেণুর ছবি ছেপে বেরুতে সারা যুক্তপ্রদেশ জুড়ে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়।

হরপ্রসাদ গোয়েন্দা অফিসে চীফের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললেন। চীফ সাদরে তাঁকে গ্রহণ করে যথোচিত ব্যবস্থার ভার নিলেন। বললেন : আমরা অবিশ্যি এ ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি করছি না, আপনার প্রস্তাবও ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করছি।

কথাপ্রসঙ্গে হরপ্রসাদ লালবিহারী গুপ্তের কথা তুলতে চীফ জানালেন—বিজ্ঞান-সঙ্গত আধুনিক উন্নত প্রণালীর গোয়েন্দাগিরি শিখে আসবার জন্যে সরকার সম্প্রতি লালবিহারীকে বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়েছেন। তবে এমনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইদানীং সরকারের কাজ করছেন; ইনি নিউইয়র্ক ফেরৎ—আপনার কেস্‌টা আমরা তাঁর হাতে দিয়েছি। তাঁর নাম ডক্টর অধিকারী। তিনি এখনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন বলে ফোন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হওয়া উচিত।

মিনিট দশেক পরেই ডক্টর অধিকারী এলেন। চীফ প্রথমেই হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডক্টর তাঁর করমর্দন করে বললেন: আপনার নাম আমার শোনা আছে, তবে আজ চাক্ষুস দেখলাম। আপনার মেয়ের ব্যাপারটা আমি শুনেছি। এখন আপনার নবাগত সেই বন্ধুটিকে দেখে তাঁর মুখেও গোড়ার বৃত্তান্তটি শুনতে চাই।

চীফ এই সময় হরপ্রসাদবাবুর আর্থিক প্রস্তাবটির কথা বললেন। ডক্টর অধিকারী সেকথা শুনে আর একবার জোরে জোরে তাঁর করমর্দন করে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন: তাহলে তো আপনার বাড়ীতে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করছি মিঃ ঘোষ।

হরপ্রসাদ বললেন: যদি দয়া করে এখনই আমার গরীবখানায় পদধুলি দেন—

ডক্টর অধিকারী বললেন: বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, এ বিজিনেসের ব্যাপারে আপনার বাড়ীতে যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। চলুন এখনি যাওয়া যাক্। আপনার বন্ধুর সঙ্গেও আলাপ হবে এবং আপনার হারানো মেয়েটির ব্যাপারে ওখানে যা যা জানবার, সেগুলোরও একটা নোট নেওয়া যাবে।

বাইরে এসে নিজের গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ডক্টর অধিকারী হরপ্রসাদ বাবুর গাড়ীতে উঠেই বললেন: তাহলে ফেরবার সময় আপনার সোফার আমাকে ওখান থেকে আমার বাড়ীতে—

হরপ্রসাদবাবু সাগ্রহে বললেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়, আর আপনার বাড়ীখানাও ও দেখে আসবে। এরপর প্রয়োজন হলে—

ডক্টর বললেন: প্রয়োজন তো হবেই, হামেশাই আসা যাওয়া করতে হবে। আচ্ছা, আপনার বন্ধুর বৃত্তান্তটি আমাকে বলবেন, তাঁর অসাক্ষাতেই এটা শুনতে চাই?

হরপ্রসাদ তখন গাড়ীতেই শম্ভুনাথের সঙ্গে তাঁর ছাত্রজীবনের সম্প্রীতির কথা থেকে এখানে আসা, এবং তাঁর ছেলে নরনারায়ণের ছবি দেখে তার সম্বন্ধে যে কল্পনা করেন—সে সব কথাও একটি একটি করে বলতে লাগলেন।

ডাক্তার অধিকারীর বিচিত্র পেশাটির মত তাঁহার চেহারাখানিও এরূপ অদ্ভুত যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। পক্ষান্তরে, চেহারা দেখে বুঝবার উপায় থাকে না যে তিনি কোন্ দেশের মানুষ। গায়ের রঙ তাঁর এত বেশী ধবধবে ফরসা যে কোন বাঙ্গালীর গায়ের রঙ এতটা ফরসা হলে সেটা ধবল রোগের পর্য্যায়ে এসে পড়ে। দেহের গঠন দিব্য পূরন্ত এবং বলিষ্ঠ হলেও দীর্ঘতার দিকে হ্রাস পেয়ে প্রস্থের দিকটা যে ভাবে পুষ্ট করেছে, তাতে আকৃতিগত খর্বতাই প্রকাশ পায়। পরিচ্ছদ দেখেও ধরবার যো নেই যে তিনি কোন্ সমাজের লোক। সাদা কাপড়ের ঢিলা পায়জামার উপর কালো রঙের আলপাকার চাইনিজ প্যাটার্ণের কোট এবং গলার উপর পালিস-করা শক্ত কলারটি তাঁর স্থূল গর্দ্দানটিকে যেন খাড়া করে রেখেছে। কালো রেশমী টুপিটি বড় একটা নারকেলের আধখানার আকারে ডাক্তার অধিকারীর মাথার চাকির টাকের অংশটুকু ঢেকে রেখে চারপাশের ঝুমকো চুলগুলির সহিত মিশে এমন ভাবে এঁটে বসেছে যে, সহসা দেখলে কবরীবন্ধ ঝুঁটি বা চূড়া বলে ভ্রম হয়। মুখখানা গোলগাল ও গম্ভীর, তাতে প্রতিভা ও বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। চোখের তারা দুটি ঘোলাটে হলেও দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। নাকটি কিন্তু চোখের ঠিক উল্টো; অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ত নয়ই, অনেকটা বসা। সর্ব্ব দেহের তুলনায় হাত দুখানি

অতিরিক্ত দীর্ঘ ও দৃঢ়। কিন্তু আকৃতি ও পরিচ্ছদ মানুষটির জাতিগত পরিচয় চেপে রাখলেও মুখের কথা জানিয়ে দেয় যে, তিনি চীনা জাপানী সিংহলী বা বর্ম্মী মার্কা মানুষ নন—খাঁটি বাঙ্গালী। এই চেহারা ও বিচিত্র পোষাক পরা মানুষটি যখন দিব্য ঘরোয়া বাংলায় কথা বলেন, আলাপ করেন, তখন সত্যই অবাক হতে হয়।

ওদিকে সিদ্ধাশ্রমের শিবিরে 'লীডারে'র সে সংখ্যাখানি আনন্দ স্বামীর নজরে পড়ায় নূতন এক পরিস্থিতি ঘনিয়ে ওঠে। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ লালাজীকে ডেকে কাগজখানি পড়তে দিলেন। লালাজী লীডারের সংবাদ পড়ে ও ছবিগুলি দেখে বুঝল যে, নিরঙ্কুশভাবে কাজটা চালিয়ে এসেও একটা লোকের জন্যে ব্যাপারটা বেশ বেঁকে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে লালা স্বামীজীকে বলল : হ্যাঁ, গলদ হয়েছে। এখন এই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার।

স্বামীজী বললেন : সে তো বোঝাই যাচ্ছে ; কিন্তু কোন পথে যাত্রা করবে ?

লালাজী বলল : লোকটাকে একটা ছবি আঁকবার লোভ দেখিয়ে—

স্বামীজী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : মূর্খ ! ও লোক জাত শিল্পী, তারপর ধনকুবের ব্যক্তির বন্ধু, সেখানে আশ্রয় পেয়েছে। লোভ দেখিয়ে ওকে আনা সম্ভব হবে না।

লালাজী একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল : তাহলে—

স্বামীজী : ভোগা দিয়ে ভুলিয়ে আনতে হবে ; যাকে বলে দিনে ডাকাতি। শোনো—কানে কানেই বলি ; জান ত, এসব কথা শুনতে ঘরের দেওয়ালও কান পাতে !

কানে কানে স্বামীজী যে পরামর্শ দিলেন, তা লালাজীর মনপুতঃই হল ; সানন্দে সে বলল ঃ ঠিক আছে, আমি তাক বুঝে তার কাছে গিয়ে কাজ হাসিল করেই ফিরব গুরুজী, আপনার আশীর্বাদে।

স্বামীজীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে লালাজী উঠে গেল কক্ষ থেকে।

স্বামীজী তাঁর বইয়ের আলমারী খুলে পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানের একখানি বই বের করে পড়তে বসে গেলেন।

সেদিন অপরাহ্নের দিকে হরপ্রসাদ মোটর যোগে বাড়ী থেকে যেই বেরিয়ে গেলেন, দেউড়ী ও বাইরের চাকর দারোয়ানরাও অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেকের মত নিশ্চিন্ত—এই ভেবে যে যার প্রয়োজনে সরে গেল।

এই অবসরে স্বামী বিবেকানন্দের মত আঁট সাঁট ঝুল জামা ও কাপড় পাগড়ী পরা এক সাধু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল।

কোথাও কারও সাড়া না পেয়ে লোকটি সরাসরি বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করে দেখল, ফরাসে বসে যে লোক নিবিষ্ট মনে ছবি এঁকে চলেছে, সে তার অপরিচিত নয়, এরই সন্নিধানে সে এসেছে।

শম্ভুনাথের ভ্রূক্ষেপ নেই, জানতেও পারেন নি যে এক ব্যক্তি নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক একটু ঝুঁকে তাঁর সমাপ্তপ্রায় ছবিটি দেখেই চমকে উঠল। পরক্ষণে স্থির হয়ে আস্তে আস্তে সুধাল ঃ আপনিই কি শম্ভুনাথবাবু আর্টিস্ট ?

আগন্তুকের সাড়া পেয়েই শম্ভুনাথ সোজা হয়ে বসে তাকে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন। বললেন ঃ হাতের কাজ দেখেই পেশা বুঝছেন, নামটা ঐ বটে। আপনি বসুন।

আগন্তুক বললেন ঃ বসবার অবসর নেই মশাই, আমি পুলিশের লোক। এই সাধু সজ্জাটা আসল নয় জানবেন। মিঃ ঘোষ সি, আই, ডি, অফিসে গিয়েছেন জানেন বোধ হয়। তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে একটু ক্লু, পাওয়া গেছে—মেলার একটা আশ্রমে। এখন আপনার আঁকা স্কেচ-

গুলোর দরকার হয়েছে ; সেগুলি নিয়ে ঐ আশ্রমে আমার সঙ্গে এখনি যেতে হবে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

হাতের কাজগুলি তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর পুরে নিয়ে শম্ভুনাথ র‍্যাক থেকে লং কোটটি পেড়ে গায়ে চড়িয়ে টুপিটা মাথায় দিয়ে আগন্তুকের সংগে চললেন। বাড়ীর ফটকের কাছেই একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তাতে তারা উঠে বসলে গাড়ী চলতে আরম্ভ করল।

গাড়ী থেকে নেমেই তাঁরা আশ্রমে ঢুকলেন।

ছোট একখানা ঘরে বেতের একটা মোড়ার উপর শম্ভুনাথকে বসিয়ে সাধুবেশী লালাজী বলল : একটু পরেই একটি লোক এই ঘরে আসবে। আপনি কেবল তাকে লক্ষ্য করে দেখুন—সেই লোকটাই মিষ্টার ঘোষের মেয়েকে বাঘ দেখাবার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিনা! আপনার সনাক্তের উপরেই সব নির্ভর করছে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই সে পাশের দ্বার দিয়ে এত দ্রুত চলে গেল যে, শম্ভুনাথ কোন কথা জিজ্ঞাসা করবারও ফুরসদ পেলেন না। তিনি স্থির হয়ে বসে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে চিন্তামগ্ন হলেন।

একটু পরেই খুট করে সামনের দরজাটি খুলে যে লোক সোজা হয়ে হাসিমুখে দেখা দিল, তাকে চিনতে শম্ভুনাথের বিলম্ব হ'ল না—এই লোকটাই ত সে দিনকার সেই সাংঘাতিক মেয়ে চোর! চোখোচোখি হতেই শম্ভুনাথের সর্বাংগ কণ্টকিত হয়ে উঠল; তাঁর শিল্পী-সুলভ দৃষ্টিতে লোকটার চোখের তীব্র দৃষ্টিও যে তিনি মনে মনে ছকে নিয়েছিলেন! তৎক্ষণাৎ মোড়া থেকে লাফিয়ে উঠে জোর গলায় শম্ভুনাথ বললেন : এই লোক! এই সেই—

পরক্ষণে ডান হাতখানা কোমরের দিকে বিদ্যুতবেগে নামিয়েই সেই লোক শম্ভুনাথের নাকের ডগা লক্ষ্য করে হুমকী দিল : সাট আপ।

শম্ভুনাথের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটির কথায় নয়—তার হাতের রিভলভারটি লক্ষ্য করে। এবার লোকটি হাসতে হাসতে

বলল : প্রথমেই ত বলেছি, আমি ছদ্মবেশী। আগের বেশটা এখন বদলে এসেছি। বোধ হয় তিন মিনিটের বেশী সময় নিইনি—নয় কি? মিষ্টার ঘোষের মেয়ের কেসটা হসফ করবার জন্যে মিষ্টার বোসকে গুম করা দরকার হয়েছে—

শম্ভুনাথ অবাক হয়ে লোকটার কথাগুলো শুনছেন, এমন সময় যে দোর দিয়ে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী অর্থাৎ লালাজী বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই দোর দিয়ে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন—আনন্দ স্বামী। উভয় হস্তে তিনি চামড়ার তৈরী একটা বস্তু উঁচু করে তুলে শম্ভুনাথের মাথায় টুপির মত পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটি পা পর্যন্ত নেমে গেল; শুধু আকণ্ঠ মুখখানা উন্মুক্ত রইল। পরক্ষণে লালাজীও ছুটে এসে সেই বস্তুটির গায়ে লাগানো চামড়ার ছিলা দিয়ে বন্ধন পরাতে লাগল। শম্ভুনাথ চীৎকার করতে উদ্যত হলে তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে স্বামীজী বললেন : চীৎকার দ্বারা শক্তিক্ষয় করা মূর্খের লক্ষণ—তোমার মত একজন ওস্তাদ শিল্পীর প্রয়োজন আছে বলেই এত যত্ন করে এখানে আনা হয়েছে। আজ থেকেই তোমাকে কর্মে ব্রতী করা হবে। তারপর চলবে ছবি আঁকার পর্ব নীরবে; হাত চলবে, মুখ কিন্তু কিছুই বলবে না, তার ফলে হাতের শক্তি বাড়তেই থাকবে।

মুখখানা সজোরে নাড়া দিয়ে শম্ভুনাথ স্বামীজীর কঠিন হাত দু'টি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। স্বামীজী মৃদু হেসে বললেন : ও চেষ্টা নাই বা করলে শিল্পী! পারবে না। তার চেয়ে তোমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো হুটপাট করছে, তার জবাব দিচ্ছি শোনো :—মিষ্টার ঘোষের সঙ্গে তোমার আর মোলাকাত হবে না। তুমি এই আশ্রমে নজরবন্দী হয়ে থাকবে, আর আমাদের নির্দেশমত ছবি আঁকবে। খাওয়া-পরার কোন রকম কষ্ট পাবে না—যদি এই আশ্রমের আইন কানুন মেনে চল। হ্যাঁ—ওষুধ খাইয়ে, ইনজেকশন দিয়ে তোমার স্মৃতিশক্তি ও বাক্‌শক্তি লোপ করা হবে—এই আশ্রমের কল্যাণের জন্য।

অর্ধেক জীবন ত' কাটিয়ে ফেলেছ, এখন বাকি জীবনটুকু আশ্রমের কাজেই লাগিয়ে দাও শিল্পী।

স্বামীজীর কথাগুলি শুনতে শুনতে শম্ভুনাথের সর্বাংগ মোচড় দিয়ে উঠল, কিন্তু মুখের আবরণ খুলল না। স্বামীজীই হাত দুখানা তাঁর মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে কাপড়ের পটি দিয়ে মুখখানা বেঁধে দিলেন।

লালাজী এই সময় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীজীর দিকে তাকাতে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্র সব নিয়ে এসো—শুভ কাজ আরম্ভ করা যাক।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যার পূর্বেই হরপ্রসাদ ডাঃ অধিকারীকে নিয়ে বাড়ী এসে পৌঁছলেন। উভয়ে বাহিরের বৈঠকঘরে প্রবেশ করতেই হরপ্রসাদ চমকে উঠলেন। কক্ষে আস্তৃত বিস্তীর্ণ শুভ্র ফরাসটির উপর ছবির সরঞ্জাম ছড়িয়ে শম্ভুনাথ শিল্প সাধনায় লিপ্ত—পরিচিত এই দৃশ্যটিই দেখবার প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু সে স্থলে জনমানবহীন কক্ষটি তাঁর দৃষ্টিপথে যেন দুলে উঠল। কোথায় গেলেন প্রিয় বন্ধু শম্ভুনাথ? তাঁর সঙ্গে ব্যবহৃত বস্তুগুলিও যে অদৃশ্য হয়েছে! সেই ব্যাগটি নেই, ছবির যাবতীয় সরঞ্জামগুলি চোখে পড়ছে না। র‍্যাকে লম্বা পিরাণটিও নেই। তাইত, গেলেন কোথায় শম্ভুনাথ! দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেও তাঁর কোন সন্ধান পেলেন না।

ডাঃ অধিকারী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি ব্যাপার বলুন ত'?

কক্ষ মধ্যে তাঁকে বসিয়ে হরপ্রসাদ প্রাসঙ্গিক ব্যাপারটা সংক্ষেপে বললেন। এই ঘরে এই বিছানায় বসে শম্ভুনাথ ছবি এঁকেই আনন্দ পেতেন। আমি যখন বেরিয়ে যাই, তখনো তিনি ছবি নিয়ে বসেছেন

দেখে গেছি। অথচ এসে দেখতে পাচ্ছি, ঘর খালি—কেউ নেই, এমন কি—তাঁর জিনিসপত্রও দেখছি না। তাহলে বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থা?

ডাঃ অধিকারী বললেনঃ গোড়াতেই আপনার ভুল হয়েছিল। আপনার বন্ধুই মেলায় আপনার মেয়ের ছবি এঁকেছিলেন, এ কথাটা প্রচার করা ঠিক হয়নি। খবরের কাগজে ওঁর ছবিটা ছাপিয়ে আরও ভুল করা হয়েছে। আপনার বন্ধুর এভাবে অন্তর্ধানের পিছনে—যারা আপনার কন্যাকে অপহরণ করেছে, তারাই যদি বাড়ী থেকে আপনার বন্ধুকেও ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়—আমি তাতে আদৌ বিস্মিত হব না। হ্যাঁ, আপনার বন্ধু সম্বন্ধে যে সব কথা শুনা গেল, তাতে আমার মনে এই ধারণাই দৃঢ় হচ্ছে যে, তিনি ঐ পাষণ্ডদের কবলেই পড়েছেন।

হরপ্রসাদ গাঢ় স্বরে বললেনঃ তাহলে এ কেসটাও আপনাকে নিতে হবে ডক্টর অধিকারী। এর জন্য আমি আলাদা বন্দোবস্তও করব।

ডাঃ অধিকারী বললেনঃ ছাত্রজীবনের একজন বন্ধুর জন্যে কাউকে এতটা স্বার্থত্যাগ করতে দেখিনি। আপনি অদ্ভুত মানুষ!

হরপ্রসাদ বললেনঃ আমার বন্ধুকে এভাবে হারাতে আমার মেয়ের শোক আরো গভীর হয়েছে ডাঃ অধিকারী। আমার বন্ধুর একমাত্র ছেলে আছে—আমি ভেবেছিলাম তাকে এখানে আনিয়ে রেণুর জায়গায় বসাবো—কিন্তু তার ঠিকানাটাও জেনে নিইনি—কাজেই দু'একদিন দেখে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই ছেলেটির খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

ডক্টর অধিকারী বললেনঃ আপনি আর ওর মধ্যে যাবেন না মিষ্টার ঘোষ! ওসব কাজ আমার ওপরেই ছেড়ে দিতে পারেন।

অতঃপর ডক্টর অধিকারী হরপ্রসাদবাবুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁর কন্যার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি নোটবুকে টুকে নিয়ে এবং বাড়ীখানার বিভিন্ন দিকগুলো দেখে বিদায় নিলেন। হরপ্রসাদবাবুর

নির্দেশে সোফার ডক্টর অধিকারীকে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গেল।

ডক্টর অধিকারী হরপ্রসাদ বাবুর কন্যা ও বন্ধুর তদন্তের ভার নিয়ে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। হরপ্রসাদ তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তদন্ত সম্পর্কে সমস্ত ভার ডক্টর অধিকারীর হাতেই ছেড়ে দিলেন।

এ দিকে অনুপমাদেবীর পক্ষে এলাহাবাদের বাড়ীতে বাস করা কঠিন হয়ে উঠল। কন্যার সহস্র স্মৃতি চার দিক থেকে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। এলাহাবাদের অলুক্ষণে বাড়ীখানা ছেড়ে যাবার জন্য অধীর হয়ে তিনি অতঃপর স্বামীকে যুক্তি দিলেন যে, ডক্টর অধিকারী যখন তদন্তের ভার নিয়েছেন, তখন আমাদের আর এখানে থাকবার প্রয়োজন কি?

হরপ্রসাদবাবুও পত্নীর প্রস্তাব মত এলাহাবাদের পাট তুলে বোম্বাই যাত্রার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। যেহেতু বোম্বাই নগরীই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র।

ডক্টর অধিকারী এই সময় একটা মস্ত চাল চাললেন। তিনি হরপ্রসাদবাবুকে বললেন: আপনারা এলাহাবাদ ছেড়ে বোম্বাই গেলেও বাড়ীখানাকে কিন্তু এমনভাবে রাখা চাই, যাতে তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারীদের এ বাড়ীতে আসা যাওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটে।

এ কথার পর উদার হৃদয় হরপ্রসাদ ডক্টর অধিকারীর হাতেই কতিপয় সর্তাধীনে বাড়ীখানা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

॥ আট ॥

মহামেলা ভাঙতে স্নুরু করেছে। একে একে বিভিন্ন বিপণী, প্রমোদ-শিবির, সাধুদের আশ্রম প্রয়াগের মায়া কাটিয়ে যথাস্থানে চলেছে। উট, লরী, গাড়ীর ভীড়। ত্রিবেণী বক্ষে বড় বড় নৌকার বহর।

আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রমের বৃন্দাবন যাত্রার যে আয়োজন চলেছে, একেবারে অভিনব। অপহৃতা মেয়েগুলিকে ছেলেদের ছদ্মবেশে সাজিয়ে অতি সন্তর্পণে রাত্রির অন্ধকারে নৌকায় তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আশ্রমের অভ্যন্তরে শম্ভুনাথের অবস্থা দেখলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। রাসায়নিক দ্রাবক প্রয়োগে তাঁর বাকশক্তি ও স্মৃতিশক্তি রুদ্ধ করা হয়েছে। নির্জন কক্ষে বসে তাঁকে এখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত চিত্রাঙ্কন করতে হয়।

অপহৃতা অন্যান্য বালিকাগুলিকে বাধ্য করা সম্ভব হলেও, রেণুকে নিয়ে আনন্দস্বামীর কঠোর পরীক্ষা চলেছে। রেণুর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত করে দিয়ে নূতন জীবনারম্ভের যে সাধনা স্বামীজী চালিয়েছেন, সেও এক বিস্ময়াবহ ব্যাপার। এখন মহামেলায় লব্ধ এই দুর্লভ নিধিটি নিয়ে বৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রমে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চিত্তে শান্তি নেই।

এক গভীর নিশীথে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পরম সুযোগ জেনে সিদ্ধাশ্রমের দলটি নির্বিঘ্নে নিজস্ব জলযানে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সেই দুর্যোগের মধ্যেই নৌকার নোঙ্গর উঠল।

ওদিকে আশ্রমের একাংশে অবরুদ্ধ শম্ভুনাথের কথা সকলেই বিস্মৃত হলেন। স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি হারিয়েও তিনি বোধ হয়

বর্তমান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। নতুবা আসল ব্যাপারটার পরেই তাঁর চোখের সামনে নিজের রুদ্ধ শিবির পথে ফাটল দেখা দেবে কেন? স্মৃতিহারা বাকশক্তিহীন বুদ্ধিভ্রংশ ব্যক্তিকেও বুঝি মুক্তির আনন্দ উল্লসিত করে—পথ নির্দেশে হাতছানি দেয়।

একদা যে নিয়তির আকর্ষণে শিল্পী শম্ভুনাথ সিদ্ধাশ্রমের কয়েদখানায় অবরুদ্ধ হন, সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী নিয়তিই পুনরায় তাঁকে রাত্রির দুর্যোগ মধ্যে মুক্তির আলোকপাত করে আর এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন।

সেই ব্যাগটি হাতে নিয়ে টলতে টলতে শম্ভুনাথ বিস্তীর্ণ বেলাভূমির উপর দিয়ে নগরের উদ্দেশে এগিয়ে চললেন।

আমেরিকার কোন প্রসিদ্ধ চিত্র-প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদিত মহাকুম্ভের দৃশ্য ফিলিমে তোলবার অভিপ্রায়ে কর্ণেলগঞ্জের এক বিস্তীর্ণ উদ্যান-বাটিকায় তাদের অস্থায়ী চিত্রশালা স্থাপিত করেছিলেন। এই অভিযাত্রী দলটির সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থা এবং ব্যয়-বাহুল্যের ঘটা এদেশবাসীর পক্ষে যেন কল্পনাতীত ব্যাপার! অস্থায়ী চিত্র-শালাটির সম্পর্কে যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও উপাদানের সহিত শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে চলন্ত একটি হাসপাতাল পর্যন্ত সমুদ্রপথে এদেশের কর্মক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। এ থেকেই উপলব্ধি হবে যে, মার্কিণ দেশের এই ভ্রাম্যমান ফিলিম প্রতিষ্ঠানটি কিরূপ সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তি-শালী। ভারতের এই মহামেলার ছবি ফিলিমে তুলেই কর্তৃপক্ষ নিরস্ত হননি, এই মেলাটিকে কেন্দ্র করে তাঁরা একখানি ভারতীয় চিত্রনাট্য তোলবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সম্পর্কে অস্থিরচিত্ত, বিকৃত-মস্তিষ্ক এক প্রৌঢ়ের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন ভারতীয়ের অনুসন্ধান করছিলেন।

শম্ভুনাথ যখন আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রম থেকে বেরিয়ে ত্রিবেণী

সৈকতের জনবিরল ফাঁকা রাস্তাটি ধরে বিচিত্র ভংগীতে টলতে টলতে একইভাবে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় বৃহৎ একখানি আধুনিক মোটরগাড়ী নিঃশব্দে বিপরীত দিক হতে একেবারে শম্ভুনাথের সামনে এসে থেমে পড়ল।

ফিলিম প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিঃ জিম আর্থার দলের কতিপয় তরুণী চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়ে এই পথে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। শোফারের আসনে বসে তিনি স্বয়ং মোটর চালাচ্ছিলেন, তাঁর সহকারী জ্যাক উইলিয়ম পাশে বসে ক্ষুদ্র ক্যামেরাটির সাহায্যে বৃক্ষবহুল বিস্তীর্ণ পথটির সায়াহ্নের ছবি তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

মিঃ আর্থার ক্ষিপ্রহস্তে সহসা মোটরের গতিবেগ কিঞ্চিৎ লঘু করবার উদ্দেশ্যে ষ্টিয়ারিং ঘুরালেন, সংগে সংগে তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বিস্ময়ের স্বর নির্গত হল : ভারি আশ্চর্য ত' ?

জ্যাক উইলিময় সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কি স্যার ?

পকেট হতে দূরবীণটি বা'র করে এবং চোখে লাগিয়ে মিঃ আর্থার বললেন : সাত দিন ধরে আমরা যে অদ্ভুত চেহারাটির সন্ধান করে বেড়াচ্ছি, হুবহু সেই বস্তুটি আমাদের ঠিক সামনে অর্থাৎ এক ফার্লংএর মধ্যে—ঐ দেখ !

—বলেই তিনি দূরবীণটি জ্যাক উইলিয়মের হাতে দিলেন। উইলিয়ম সেটি চোখে লাগিয়ে উল্লাসের সুরে বলে উঠলেন : স্যার, আপনার অনুমান ঠিক, আমরা যেমনটি খুঁজছিলাম—একমাথা রুক্ষ চুল, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, খালি পা, হাতে ব্যাগ, গায়ে একটা কালো রঙের র‍্যাপার, এলোমেলো চলন—ঠিক এমনি একটি লোককেই দেখতে পাচ্ছি—সে আমাদের দিকেই আসছে। সত্যিই অদ্ভুত !

ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মোটরের বেগ বাড়িয়ে দিয়ে মিঃ আর্থার বললেন : ঐ লোকটিকে এখনি পাকড়াও করে একেবারে ষ্টুডিয়োয় নিয়ে গিয়ে ওর সংগে বোঝাপড়া করতে হবে।

গাড়ীর ভেতরে বসে উভয়ের সংলাপ মেয়েরাও উৎকর্ণ হয়ে

শুনছিল। একটি মেয়ে সহাস্যে মন্তব্য করল: মিঃ ডাইরেক্টরের নজরে যখন বেচারী পড়েছে, ওর বরাতও খুলে গেছে!

গাড়ী তখন তীরবেগে ছুটেছে এবং সকলের দৃষ্টির সামনের অদ্ভুত মানুষটির দিকে। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই সহসা আর এক বিভ্রাট ঘটল।

পিচ ঢালা পথে গাড়ীখানা নিঃশব্দে এলেও থামবার সংগে সংগে গাড়ীর হর্ণের সুরটি এমনই তীক্ষ্ণ-কর্কশ ঝংকার তুলল যে, পথচারী মানুষটি চমকিত হয়ে সবেগে মোটরের মডগার্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সংগে সংগে মিঃ আর্থার ও তাঁর সঙ্গী নীচে নেমে লোকটিকে তুলতে গিয়ে দেখলেন, আকস্মিক আতঙ্ক এবং প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তার চৈতন্য লুপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় কালবিলম্ব না করে সময়োচিত তৎপরতায় সহযোগীর সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত লোকটিকে গাড়ীর ভেতর তুলে নিয়ে মিঃ আর্থার ষ্টুডিও অভিমুখে পূর্ণগতিতে মোটর চালিয়ে দিলেন।

ষ্টুডিওর হাসপাতালে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। সুতরাং শম্ভুনাথ শীঘ্রই চৈতন্যলাভ করে সুস্থ হলেন। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ অবস্থায় রোগীকে অব্যাহতি দিলেন না। তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির নিদর্শন পেয়ে সে সম্বন্ধে সতর্কতার সংগে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হলেন। কর্তৃপক্ষ বুঝলেন, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পথে পাওয়া এই মানুষটি তাদের চিত্র-সম্ভারের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হবার উপযুক্ত। একে আরোগ্য করে তুলতে পারলে তাদের অর্থ ব্যয় এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

পরিচ্ছন্ন পোষাক, সুকোমল শয্যা, বলকারক পথ্য, আমোদ-প্রমোদ ও সুদর্শনা শুশ্রূষাকারিণীদের সঙ্গ দ্বারা রোগীকে প্রফুল্ল রাখবার ব্যবস্থা করে তার স্নায়ুগত দুর্বলতার চিকিৎসা যখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে, সেই সময় বন্ধুবৎসল হরপ্রসাদ তাঁর বৈঠকখানায় বসে ডক্টর

অধিকারীর হস্তে তাঁর কন্যা, বন্ধু এবং বন্ধু-পুত্রের অনুসন্ধান সম্পর্কে সমস্ত ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

॥ নয় ॥

ডক্টর অধিকারীর পূর্ণ নাম গঙ্গাধর অধিকারী। জাতিতে কায়স্থ। কিন্তু ধর্মে বা আচার ব্যবহারে ইনি কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তা জানবার উপায় নেই। এঁর পিতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেরেস্তায় কাজ করতেন। সহরের প্রান্তভাগে তিনিই সুবিধায় একখানি বাগান বাড়ী খরিদ করে স্থায়ী বাসীন্দা হন। গঙ্গাধর আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্ণৌর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়বার সময় সারা নাম্নী এক খৃষ্টান নার্সকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর সস্ত্রীক স্ত্রীর ভগিনীপতির আহ্বানে আমেরিকায় যান ভাগ্য-পরীক্ষার আশায়। সেখানে তিন বছর কাটিয়ে সস্ত্রীক যখন এলাহাবাদে ফিরে এলেন, তখন সকলেই জ্ঞাত হন যে, তিনি আমেরিকা থেকে শিক্ষালাভ করে যুগপৎ মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ এবং অপরাধতত্ত্ববিদের দুর্লভ ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে এসেছেন। আমেরিকায় থেকে বর্ষকাল তিনি হাতে-কলমে কাজ করে উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এর পিছনে যে কি রহস্য নিহিত আছে, ডক্টর অধিকারীর পত্নী ভিন্ন অন্য কেউই তা' জ্ঞাত নন। এজন্য পত্নী সারার কাছে ডক্টর অধিকারীকে সর্বদাই তটস্থ ও সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।

সেদিন ডক্টর অধিকারীকে অত্যন্ত প্রফুল্ল ও প্রসন্ন দেখে স্ত্রী সারা জিজ্ঞাসা করলেন : ব্যাপার কি ? হঠাৎ যে খুব খুসি দেখছি !

ডাক্তার বললেন : টাকার একটা গাছ পাওয়া গেছে—ধনকুবের হরপ্রসাদ ঘোষের মেয়ে চুরি গেছে শোননি, তার তদন্তের ভার

পেয়েছি—টাকা ত বটেই, সেইসঙ্গে এখানকার বাড়ী—গাড়ী সবই আমার জিম্মায় রেখে তাঁরা বোম্বে চলে গেছেন—এবাড়ীতে আর টেঁকতে পাচ্ছেন না ব'লে !...

শুনে স্ত্রী বললেন: তাহলে আমার রিণির পয় আছে দেখছি, আমি ত' ভেবেই খুন হচ্ছিলুম !

স্ত্রীর কথা শুনে ডাঃ সবিস্ময়ে সুধালেন: রিণি ? সে আবার কে ?

—আমার মামার মেয়ে। মামা প্লেনে বিলেত গেছেন—মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। খাসা মেয়ে ; কি রূপ ! তবে দুঃখু এই বোবা ! ওর ত' বাঁচার আশা ছিল না ; মেয়ের জান, তাই বেঁচেছে। কিন্তু বোল গেছে—

তিক্তকণ্ঠে ডক্টর অধিকারী বললেন: এই বোবা মেয়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে—একে পুষতে হবে ?

স্ত্রী বললেন: রাগছ কেন ? একে পুষতে হবে বলেই—টাকার গাছ তোমাকে ভগবান দিয়েছে। মেয়েটিকে দেখই না—দেখলেই মায়া হবে—

—বলেই সে ডাকল: রিণি—রিণি—

ফুলের মত ফুটফুটে বছর সাতেকের একটি মেয়ে ছুটে এল—ডাক্তারকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। ডাক্তারও মেয়েটিকে দেখে অবাক ! কি আশ্চর্য ! হরপ্রসাদের হারানো মেয়ের সংগে একি অপরূপ সাদৃশ্য এই মেয়েটির !

সারা জিজ্ঞাসা করলেন: কি হোল ?

ডাক্তার পকেট থেকে রেণুর ফটোখানা বার করে বললেন: যে মেয়ের সন্ধানের ভার পেয়েছি, এ তার ফটো—

ফটোখানা এক নজরে দেখেই স্ত্রী বললেন: বলো কি ! দেখলেই যে রিণি বলে মনে হয়—

ডাক্তার: তুমি কি একে আগে দেখেছিলে ?

স্ত্রী: দেখিনি ? সেই যে সেবার কাণপুরে গিয়েছিলুম—রিণি

তখন বছর পাঁচেকের—দিব্যি কথা বলেছে—আমার কি ন্যাওটাই না হয়েছিল! এখানে এসেও—দেখেই আমাকে চিনেছে।

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির সর্বাঙ্গ দেখতে দেখতে সুধালেন: তুমি কথা বলতে মোটেই পার না রিণি?

ঘাড় নেড়ে মেয়েটি জানাল যে সে পারে না।

ডাক্তার বললেন: সামনের ঐ ঘরটার ভিতরে গিয়ে বোস। কারুর সংগে তুমি মিসবে না। যাও। রিণি চলে গেল।

ডাক্তার নিজের মনে অস্ফুটস্বরে বললেন: রিণি—আর রেণু!

স্ত্রী বললেন: তোমার মতলব বুঝেচি—

ডাক্তার বললেন: বুঝে থাক মুখে ছিপি এঁটে রাখ। জেনো, ঘরের দেওয়ালও কথা শোনে!

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এর পর রিণি ও রেণুকে কেন্দ্র করে একটা পরামর্শ আরম্ভ হল।

দশ

হারানো মেয়ে রেণুর সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন আগেই বিভিন্ন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। এখন ডক্টর অধিকারী হরপ্রসাদের বন্ধু আর্টিষ্ট শম্ভুনাথের সম্পর্কে আর এক বিজ্ঞপ্তি দিলেন। দিন কতক পরে দানাপুর অডিট অফিসের কেরাণী নিবারণবাবু সেই বিজ্ঞাপন পড়ে বক্স নং ধরে এই মর্মে এক জবাব দিলেন যে, আর্টিষ্ট শম্ভুনাথ বসু তাঁর আত্মীয়। তিনি একমাত্র শিশু পুত্র নরনারায়ণকে তাঁরই আশ্রয়ে রেখে বিদেশে চলে গেছেন। তাঁর ছেলেকে তিনিই কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন।

খবরের কাগজের অফিসে বক্সএর বিজ্ঞাপনে ডক্টর অধিকারীর নাম ঠিকানা থাকায় অফিস থেকে চিঠি তাঁর কাছেই পাঠানো হয়।

চিঠি পড়ে ডক্টর নিজেই একদিন দানাপুরে ই, আই, রেলের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। নিবারণবাবু তখন নিজের সিটে বসে কাজ করছিলেন। বেয়ারা তাঁকে একখানা কার্ড দিল, তাতে প্রেরকের পরিচিতি ছাপা রয়েছে—Dr. Adhikari, Special Officer U. P. Government.—কার্ডখানা দিয়ে বেয়ারা জানালো—সাহেব বারাণ্ডায় খুরসিতে বসে আছেন—আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

নিবারণবাবু ভীতু প্রকৃতির মানুষ—কার্ডের নাম পড়ে বুকের ভেতরটা তাঁর ঢিপ ঢিপ করে উঠল। ভয়ে ভয়ে বাইরে এসে সাহেবকে নমস্কার করতেই সাহেব তাঁর আপাদমস্তক দেখে কি ধরণের মানুষ তিনি সেটি চিনে নিলেন। তারপর জানালেন যে, তাঁর ভগিনীপতি একটা গ্যাং কেসে জড়িয়ে পড়েন—এরা বিদেশ থেকে রিভলবার আমদানি করে। ধরা পড়ার পর জানা যায়, তিনি নাকি পাগল—তারপর হাসপাতালেই মারা পড়েন। কিন্তু জানেন ত 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।' সরকার তাঁর বিষয়সম্পত্তি ক্রোক করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন—সেই সংগে জানতে চান তাঁর গোষ্ঠীর কে কোথায় আছে। কেননা, তাদের চিনে রাখা দরকার।

এ খবর শুনে নিবারণ ভগিনীপতির শোকে কাঁদবেন না নিজের তাল সামলাবেন ভেবে পান না। শেষে কি ভেবে ডক্টর অধিকারীর হাত দু'খানি চেপে ধরে বললেন: আমাকে আপনি বাঁচান। আমি চাকরী করে খাই, আমার নাম সরকারের কালো খাতায় উঠলে হয়ত আমার চাকরী যাবে—পথে দাঁড়াব।

ডক্টর তখন যুক্তি দিলেন: আমি বুঝেছি, আপনি নিরীহ মানুষ। এখন এক কাজ করতে পারলে হয়ত' আপনাকে বাঁচাতে পারা যায়। অন্তত মাস ছয়েকের ছুটি নিয়ে আপনি এখান থেকে সরে পড়ুন। আর ঐ ছেলেটার নাম পালটে দিন। তাহলে আমি সরকারে এই বলে রিপোর্ট করবো—তার কেউ কোথাও নেই, একটা ছেলে ছিল, মারা গেছে।

ডক্টরের এই প্রস্তাব নিবারণবাবু মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

তাঁকে অবশ্য এর জন্য হাজার খানেক টাকা খরচ করতে হল।

ডাক্তার তখনি বোম্বায়ে হরপ্রসাদবাবুকে চিঠি লিখে জানালেন—আপনার বন্ধুপুত্রের সন্ধানে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। শম্ভুনাথ বসুর একটি পুত্র ছিল। যে সময় আপনার কন্যা চুরি যায়, ঠিক সেই সময়ে সেও মারা পড়ে। তাঁর মাতুল এখানে চাকুরী করেন, তাঁর কাছেই খবর সংগ্রহ করলাম। শম্ভুনাথের খবর এঁরা জ্ঞাত নহেন।

ডাক্তার অধিকারীর অন্তর্নিহিত চিন্তা অনেকদূরে এগিয়ে যায়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি বন্ধুবৎসল হরপ্রসাদকে নির্বান্ধব প্রতিপন্ন করতে চান। সেই জন্য এত প্রচেষ্টা।

আফিসের কাছেই কেরানি নিবারণবাবুর বাসা। আড়াইখানি ঘর। একটু অঙ্গন এবং সামনে তার দিয়ে ঘেরা এক ফালি জমি নিয়ে তাঁর কোয়াটার। অঙ্গনে ছোট ঘরখানির সামনে রোয়াকটির উপর বালক নরনারায়ণ তার চিত্রবিদ্যার সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে ছবি আঁকতে বসেছে। তার বসবার ভংগির সংগে তার স্বাভাবিক পরিবেশগুলি দিব্যি মিলে গেছে—সংকীর্ণ চাতালটির পাশে তারের বেড়া ঝাঁপিয়ে লবঙ্গলতার লতানে গাছগুলি ভিতরে এসে পড়েছে—লাল, গোলাপী ও সাদা রংয়ের ফুলের থোপাগুলি ছেলেটির মাথার উপরে ও আশেপাশে ঝুলছে। করবী গাছের পুরুষ্টু একটি ডাঁটার মাথাটুকু থেঁতো করে তুলি করা হয়েছে। কয়লা ঘষে, হলুদবাটা গুলে, গেরিমাটি গুঁড়িয়ে, সিঁদুর গুলে আলাদা আলাদা খুরিতে রেখে রঙের অভাব মিটিয়ে নিয়েছে। রামায়ণের একখানি ছবি ইটের ওপর হেলিয়ে রেখে তাকে করা হয়েছে 'মডেল', আর সেটি দেখে দেখে ক্যালেণ্ডারের একখানি সাদা মোটা কার্ডবোর্ডের ওপর রং তুলির সাহায্যে বালক চিত্রকর ক্ষিপ্র হস্তে দশস্কন্ধ রাবণ রাজার ছবি আঁকছেন।

খুট করে হঠাৎ ভিতরের দরজাটি খুলে গেল এবং প্রৌঢ় বয়স্কা একটি মহিলা এগিয়ে এসে মুখখানা মচকে বলে উঠলেন : ও মা, আমি চারদিকে খুঁজছি, আর ছেলের এখানে ঘটা করে ছবি আঁকা হচ্ছে!

শিল্পীর ভ্রূক্ষেপ নেই—নিরুত্তরেই কাজ করে চলেছে।

মহিলাটি এগিয়ে এসে সব দেখে স্বর আরো চড়িয়ে বললেন : আ আমার পোড়াকপাল! রামায়ণ থেকে ছবিখানা খুলে এনে খেলা হচ্ছে তোমার! আর কোন খেলা খুঁজে পাওনি—তোলা খুরিগুলো পেড়ে আমার পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে?

ছেলেটি এবার মুখখানা তুলে বলল : এই দেখ—তোমার চেঁচানিতে বেশি রং পড়ে গেল মামিমা, তুমি ভারি দুষ্টু!

মামিমা তর্জন করে উঠলেন, ওদিকে নিবারণবাবুও বাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর শুখনো মুখখানা দেখে গৃহিণী বলে উঠলেন : মুখখানা এরকম দেখছি কেন গা, কোন অসুখ বিসুখ করেনি ত'?

নিবারণবাবু বললেন : বড্ডো মাথা ধরেছে তাই সকাল সকাল চলে এলুম!

ক্লান্ত স্বামীকে বাতাস করবার জন্য গৃহিণী ঘরের ভিতরে সেঁধুলেন পাখাখানার সন্ধানে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন : অ—মা, কি সর্বনাশ, সিঁদুরটুকু পর্যন্ত ঢেলে নিয়ে গেছে গা! হতচ্ছাড়া ছেলে কোথাকার। ঘরময় সিঁদুরের ছড়াছড়ি?

নিবারণবাবু তখন ভাগিনেয়ের ছেলেখেলা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। এ খেলার সংগে তিনি অপরিচিত নন। তাই বললেন : আহা কেন ওকে বকছ! কত ছেলে ত' কত রকমই খেলে কিন্তু কোন ছেলেকে এভাবে খেলতে দেখেছ? তোমার আহ্লাদ হয় না?

স্বামীকে বাতাস করতে করতে স্ত্রী বললেন : আহ্লাদ হবে না? কত সাদ্ধি সাধনা করে নেবুফুলের দেওয়রকে বলে কলকাতা থেকে এক বাণ্ডিল সিঁদুর আনিয়েছিলুম, দজ্জাল ছেলে কৌটা উপুড় করে সবটুকু ঢেলে এনেছে—এতে আহ্লাদ হবে না!

নিবারণবাবু বললেন : আর তোমার নেবুফুলের খোসামদ করতে হবে না; কলকাতায় গিয়ে আমি তোমাকে তিন বাণ্ডিল সিঁদুর কিনে দেব, সাধ মিটিয়ে সিঁথিতে দিও।

চমকিত হয়ে গৃহিণী বললেন : কি হয়েছে বলত? সিঁদুরের কথায় কলকাতায় যাবার কথা তুললে যে? কে যাচ্ছে কোলকাতায়?

নিবারণবাবু বললেন : আমরা সবাই—মাস ছয়েকের ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাব স্থির করেছি। তবে এখানকার পাট তুলেই যেতে হবে।

গৃহিণী গণ্ডে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কথাটার গুরুত্ব সম্বন্ধে ভাবতে বসলেন।

ভাগনের কাণে কথাটা যেতেই সে বলল : আমি কিন্তু ছবিগুলো সব নিয়ে যাব মামা—আর এই তুলিগুলো, রংএর খুরিগুলোও—

মামা বললেন : কলকাতায় গিয়ে আমি তোমাকে ছবি আঁকবার একটি বাক্স কিনে দোব। তার মধ্যে নানারকম রঙ, তুলি, বাটি থাকে!

আনন্দে বালকের দুই চক্ষু চক চক করতে থাকে। সোল্লাসে বলে ওঠে : উঃ, কি মজা! তাহলে আর মামীমার বকুনি খেতে হবে না!

মামা বললেন : কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে বাবা, তাহলেই ঐ বাক্স পাবে। তোমার নামটাকে ছোট করতে হবে—কলকাতায় অত বড় নাম চলে না। এখন থেকে তোমাকে আমরা নরেন বলে ডাকবো। ভাগনের নাম পালটানোর ব্যাপারে মামীমা কৈফিয়ৎ চাইলে নিবারণ জানালেন : ওর বাবার ইচ্ছাতেই নাম ও পদবী বদলানো হচ্ছে। আসলে ওদের পদবী ছিল বিশ্বাস—সরকারী খেতাব ওটা। ওর বাবা সেটা ছেড়ে বোস পদবী নিয়েছিলো। পদবী পাল্টে কিন্তু ভালো হোল না—তাই সাবেক পদবী বাহাল করতে লিখেছে। ভাগনে এ সময় সাগ্রহে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে মামা বললেন : জান ত' তিনি বিদেশে গেছেন, সেখান থেকেই তিনি চিঠি দিয়েছেন—ফিরবেন কবে ঠিক নেই।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নিবারণবাবু ছুটী নিয়ে সপরিবার কলকাতায় রওনা হলেন।

॥ এগার ॥

শম্ভুনাথের ছেলের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ডক্টর অধিকারী রিণিকে নিয়ে পড়লেন। নিজেই উদ্যোগী হয়ে হাতের কোন লোককে দিয়ে একটা মূক-বিদ্যালয় খোলা হল। সেখানে সংগোপনে রিণির শিক্ষা চলতে লাগল। তাঁর দুরাশা—যথাকালে তিনি রিণিকেই হরপ্রসাদের অপহৃতা কন্যা রেণু করে ভাগ্য ফিরাবেন। এই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় তিনি আত্মীয়কন্যা রিণিকে ভবিষ্যৎ অস্ত্ররূপে ভেবে তাকে তালিম দিতে লেগে পড়লেন। মূক-শিক্ষার প্রণালী আয়ত্ত করে রিণিকে তিনি নিজেই শিক্ষা দিতে থাকেন। লিখে লিখে প্রশ্নোত্তর চলে।

লিখে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার নাম?

রিণি লিখে জানায় বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষরে—রেণু।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন লেখেন—তোমার বাবার নাম?…রিণি লিখে জানায় বাবু হরপ্রসাদ ঘোষ—

সারা এসে বলল: গাধাকে পিটে সত্যই দেখছি ঘোড়া করতে লেগেছ!

এইভাবে ডাক্তার অধিকারী আট-ঘাট বেঁধে অতি সন্তর্পণে যে-সময় তাঁহার কূটবুদ্ধির সূতায় একটা মহাজাল রচনা করছিলেন। তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনধামে আনন্দ স্বামীর সিদ্ধাশ্রমে দুই স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ আর একখানি মহাজাল বোনবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধহস্তে যে ভাবে সূতা পাকাচ্ছিলেন সেটাও কৌতূহলোদ্দীপক ও চমকপ্রদ।

বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশী পরিক্রম-পথের বাহিরে—যমুনার গতি যেখানে পরিবর্তিত হয়েছে, সেই জনবিরল বিস্তীর্ণ সৈকতভূমিটি কেল্লার মত সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টনে আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রম নামে অল্প কয়েক বৎসর হল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু আশ্রমটির বিধি-

নিষেধ এমনই কড়া যে, ইচ্ছামাত্রই বাইরের কারও পক্ষে এর ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় নেই। তার কারণ, দেবসেবা, অতিথি সংকার প্রভৃতি প্রচলিত প্রথাগুলিকে সন্তর্পণে বর্জন করে আশ্রম কর্তৃপক্ষ একমাত্র যে লক্ষ্যবস্তুটির জন্য এখানে কঠোর সাধনায় ব্রতী—জনসাধারণের সহিত তার কোন সম্বন্ধ নেই। আশ্রমের মতে, সকল জাতি এবং সকল ধর্মাবলম্বীর প্রাণশক্তি হচ্ছে নারীজাতি। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ভারতের নারীজাতি আজ প্রাণহীনা। উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার দ্বারা এই নারীজাতিকে প্রাণময়ীরূপে সর্বসিদ্ধা করে তোলাই এই সিদ্ধাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য। আশ্রমের নারী মাত্রই অপাপবিদ্ধা, চিরশুদ্ধা। শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে নারী সিদ্ধিলাভ করলেই আত্মদর্শনের শক্তি পাবে এবং সমাজের অকল্যাণ নিবারণ করতে সমর্থ হবে।

সিদ্ধাশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি এই পর্যন্তই জানতে পারা যায়। কিন্তু কি ভাবে নারীজাতিকে সিদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হয় এবং সিদ্ধি পেলে তারা কোন্ প্রণালীতে সমাজের কল্যাণসাধন করে থাকে, সে সব তথ্য এ পর্যন্ত রহস্যাচ্ছন্নই আছে। তবে এটাও সুস্পষ্ট সত্য যে, জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সাহায্য গ্রহণে আশ্রম বরাবরই বিরত, এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ আশ্রম কর্তৃপক্ষ তাঁদের এলাকায় সাধারণের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করতে সমর্থও হয়েছেন। কিন্তু এটাও ধ্রুব সত্য যে, অর্থের বেদীতে উপবিষ্ট কমলার বরপুত্রদের স্বর্ণ-মুষ্টির আকর্ষণে সিদ্ধাশ্রমের কোষাগারের দ্বার যেমন খুলে যায়, ঘটনাচক্রে তাঁদের আবির্ভাব হলে আশ্রমের সিংহদ্বারও তখন আর রুদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না। তবে পদস্থ রাজপুরুষ এবং বৈদেশিক টুরিষ্টগণের পক্ষে সিদ্ধাশ্রমের পথ সাধারণতঃ নিরঙ্কুশ থাকে বলেই শুনা যায়। আর, জনসাধারণের পক্ষে সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি দিন সাম্বৎসরিক উৎসবকে উপলক্ষ করে কয়েক ঘণ্টার জন্য এই সুযোগটি উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসবার পূর্ব থেকেই আবেদন করে

প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। প্রত্যেক পৌষ-সংক্রান্তিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বা'র হতে দেখল সিদ্ধাশ্রমটিকে সুরক্ষিত একটি দুর্গ বলেই ভ্রম হয়। সুউচ্চ দেওয়াল কেল্লা-প্রাচীরের মত সমগ্র আশ্রমটিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। সম্মুখেই বৃহৎ ফটক। এর পরেই দিঘীর মত বিশাল এক পুষ্করিণী। তার চারিটি কিনারাই প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী দ্বারা শোভিত। দীঘির উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত অঙ্গন। দুই অঙ্গনের উপর দিয়ে দুটি পথ ঘুরে দিঘীর পিছনে গিয়ে মিশেছে। এই সংযোগস্থলটির সম্মুখে আর একটি ফটক সিংহদ্বারের মত দেখা যায়। এই দ্বার অতিক্রম করে যে প্রস্তরময় সমচতুষ্কোণ চত্বরটিতে উপনীত হওয়া যায় তার প্রায় চার দিকেই সারিবদ্ধ কক্ষশ্রেণী এবং সম্মুখে বরাবর টানা দালান। ঘরের ছাদগুলি পাথরে তৈয়ারী, দালানের দিকটায় রক্তবর্ণ টালির ছাদ ঢালু হয়ে সুশ্রী স্তম্ভগুলিকে অবলম্বন করেছে। চত্বরটির বামে ও দক্ষিণে দুটি অংশে একটি আশ্রমের গদীঘর, অপরটি গ্রন্থাগার। গদীঘরখানি প্রাচীন আদর্শে সজ্জিত। দেওয়ালে বিশ্বের মহীয়সী নারীদের দুষ্প্রাপ্য আলেখ্যরাজির সমাবেশ। বসবার আসনগুলি বিভিন্ন পশুচর্মে আবৃত। দেওয়ালের দিকে জয়পুরী পাথরের আধারে ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধা নারীদের ব্যবহৃত বলে অভিহিত দুর্ল্লভ দ্রব্যগুলি সুরক্ষিত। যথা: রাণী দুর্গাবতীর তরবারি, চাঁদ সুলতানার কটিবন্ধ, অহল্যাবাঈএর ভল্ল, রাণী ভবানীর কঙ্কন, দেবী চৌধুরাণীর খেঁটে—এমনই সব চমকপ্রদ নিদর্শন। গদীঘর বলে পরিচিত হলেও ঘরখানি যেন মিউজিয়মের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। সম্মানভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই ঘরেই অভ্যর্থনা করে বসানো হয়ে থাকে। এরই একাংশে আশ্রমের কার্য-নির্বাহ-সংক্রান্ত খাতাপত্রগুলিও পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত থাকে। অপর পার্শ্বের পাঠাগারটি বহুভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তকসম্ভারে পরিপূর্ণ বললে অত্যুক্তি হয় না। হস্তলিখিত পুঁথি থেকে আরম্ভ করে মুদ্রিত পুরাণ, ইতিহাস,

রাজনীতি, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য এমন কি রোমাঞ্চকর অপরাধতত্ত্বমূলক গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে সংগৃহীত ও শৃঙ্খলার সংগে সন্নিবেশিত। সুপ্রসিদ্ধ প্রাদেশিক সাময়িক পত্রিকাগুলির ফাইল রাখবার পদ্ধতি দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-পরিধি শুধু আশ্রমেই সীমাবদ্ধ নহে—নিখিল বিশ্বের গতিবিধির সহিত তাঁরা যোগসূত্র রক্ষা করে থাকেন। অন্যান্য কক্ষগুলিও আশ্রমের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত এবং প্রাসঙ্গিক দ্রব্যাদির সংযোগে প্রত্যেকটিই এক-একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মত।

এই বৃহৎ অংশটি পর্যবেক্ষণ করলেই মনে হয়, বুঝি দেখবার আর কিছু নেই। কিন্তু ব্যায়ামাগার নামে পরিচিত কক্ষটির বিচিত্র দ্বারটি উন্মুক্ত করলে দেখা যায় যে, প্রস্তরবদ্ধ সঙ্কীর্ণ একটি পথ ক্রমশঃ ঢালু-ভাবে নিম্নাভিমুখী হয়েছে। এই পথে কতকটা নিম্নে নামলেই সিদ্ধাশ্রমের সর্বাধিক বৃহৎ প্রাঙ্গণটি দর্শকচক্ষুকে চমৎকৃত করে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে, এইটিই প্রকৃত আশ্রম—পুরাণের পবিত্র ঋষিস্থানের আদর্শেই যেন এই অংশটি সযত্নে রচিত হয়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণ-মধ্যবর্তী পর্ণময় আটচালাটি যজ্ঞস্থলের মত শোভা পাচ্ছে।

অবশ্য বৈদিক যুগের আদর্শ অনুসরণে কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান এই পর্ণমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় না সত্য, কিন্তু আশ্রমবাসিনী বিভিন্ন বয়সের কুমারীদিগকে এই স্থানেই জীবনযজ্ঞে ব্রতী হবার জন্য নানা ভাবে দীক্ষা নিতে হয়। আটচালাটির উভয় পার্শ্বে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-সমাচ্ছন্ন দুইটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শেষ প্রান্তে অত্যুচ্চ প্রাচীর-সংলগ্ন বাঁশবনের সংগে মিশেছে। আশ্রমের পিছনের দিকে অবস্থিত এই সুবৃহৎ অংশটি শুধু পূর্বোক্ত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নহে—প্রাচীর-সংলগ্ন কণ্টকাকীর্ণ বেউড় বাঁশের দুর্ভেদ্য ঝাড়গুলি কুম্ভীরদেহের মত প্রাচীরটিকে বরাবর আবৃত করে রেখেছে। মধ্যবর্তী আটচালাটিকে 'বুড়ি' করে উভয় পার্শ্বের উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রম-বালিকাদের নানারূপ খেলাধূলা

চলে। প্রান্তরের পরেই তপোবনের আদর্শে উদ্যান-সমন্বিত কুটীরগুলির সংস্থান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেক কুটিরে স্বতন্ত্র আঙ্গিনা এবং বিভিন্ন বর্ণের অজস্র কুসুমিত বৃক্ষবল্লরীর ঘনসন্নিবিষ্ট আবেষ্টন প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য এবং আশ্রমোচিত সুচিতা রক্ষা করেছে। এই কুটীর-অঞ্চলের পরেই অপরূপ এক বৃহৎ পুষ্করিণী। তাহার তীরগুলির খানিকটা অংশ সুপরিচিত জলজ কুসুমদামে সমাবৃত। উপরের বাঁধে সারিবদ্ধ অনুচ্চ বাহারী ঝাউগাছগুলি গায়ে গায়ে মিশে সবুজবর্ণের বিচিত্র প্রাচীরের মতনই যেন দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রমের পরিভাষায় পুষ্করিণীটি কন্যা-সরোবর নামে পরিচিত। কন্যা-সরোবরের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি ক্রমশঃ 'চড়াই' ভাবে উঠে যথাক্রমে বৃক্ষবল্লরী ও বংশপ্রাচীর পরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা-সমন্বিত সুরম্য আশ্রমটির দ্বারদেশে মিশেছে—সেইটিই সিদ্ধাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ আনন্দস্বামীর আবাসস্থান। এই উদ্যান-অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমিখণ্ডে সর্বজনমান্য স্বামীজীর আস্তানাটি স্বতন্ত্র একটি আশ্রমের মতই মনোহর এবং সম্ভ্রমসূচক। প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রস্তরবদ্ধ কূপ এবং তারই সান্নিধ্যে রক্তবর্ণ বৃহৎ চত্বরটি বৃত্তাকারে অতিকায় এক নিম্ববৃক্ষকে পরিবেষ্টন করে আশ্রমের গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য যেন ব্যক্ত করছে। প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ঘরগুলিও প্রিয়দর্শন, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচির পরিচায়ক। প্রত্যেক গৃহটি প্রয়োজনানুযায়ী বস্তুসম্ভারে সজ্জিত।

সর্বাধ্যক্ষ আনন্দস্বামীর বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক কক্ষটি সুনির্দিষ্ট। অধ্যয়ন, সাধনা, ভোজন, শয়ন এবং আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষেই যথাযথ ভাবে নির্বাহ হয়ে থাকে। স্বামীজীর নির্দেশ মত আর দু'খানি সজ্জিত কক্ষ যার জন্য নিয়োজিত হয়েছে, এই সুদৃশ্য আশ্রমটির আনন্দ, উৎসাহ এবং জীবনস্বরূপ বলেই তাকে অভিহিত করা যায়। এই আনন্দদায়িনী বালিকাটিই—হরপ্রসাদ ঘোষের কন্যা রেণু। কিন্তু

স্বামীজী তার নূতন নামকরণ করেছেন—দেবী। নামকরণের সংগে সংগে স্বামীজী তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে দেবীর মনটি নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলেছেন।

কুম্ভমেলা থেকে অপহৃতা অনেকগুলি বালিকাই সিদ্ধাশ্রমের শোভাবৃদ্ধি করছে এবং তাদের জন্য যে স্বতন্ত্র অঞ্চলটি নির্বাচিত হয়েছে, তার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক লালা লছমন দাস। লালাজীর নির্দেশ মতই সেখানে অন্যান্য বালিকাদের শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধূলা প্রভৃতি নির্বাহ হয়ে থাকে, কিন্তু দেবীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে গড়ে তুলবার ভার নিয়েছেন স্বামীজী স্বয়ং। তাঁর সাধন-ভজন, যোগ অধ্যয়ন, চিন্তা-পরিকল্পনা—সব-কিছুই এখন এই বালিকাটির তনুলতাটি ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। লালাজীর বহু অনুরোধে, অপরাহ্নের দিকে মাত্র একটি ঘণ্টা দেবীকে তিনি ছুটী দিয়ে থাকেন—লালাজীর আশ্রম-বালিকাদের সংগে মিশে খেলাধূলা এবং শক্তি-চর্চার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেও অধিকাংশ দিন খেলা দেখবার অছিলায় স্বামীজীকে দেবীর সন্ধানে উপস্থিত দেখা যায়।

॥ বার ॥

আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজীর সাধনার প্রভাবেই হোক, বা সাধনালব্ধ কোন দিব্য ঔষধের গুণেই হোক, প্রায় সম্বৎসরের মধ্যেই অন্যান্য মেয়েগুলি আপনাদিগকে এই আশ্রমেরই প্রতিপাল্য কন্যা ভেবে বাঁধাধরা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেবীকে নিয়ে স্বামীজীকে যে ভাবে হিম-সিম খেতে হয় সেটি সত্যই বেদনাদায়ক। বলবান রোগীকে 'ক্লোরোফরম' সাহায্যে অজ্ঞান করবার চেষ্টা যে-ভাবে উপর্যুপরি ব্যর্থ হয়ে যায়, স্বামীজীর অব্যর্থ শক্তির প্রভাব অতিক্রম করে এই দুরন্ত

মেয়েটি তাঁকে তেমনিই বিব্রত করে তোলে। দাড়ী ছিঁড়ে, পুঁথি-পত্র তছনছ করে, ইংরাজী বাঁধানো কেতাবগুলিকে লোষ্ট্রের মত ব্যবহার করে সে স্বামীজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। স্বামীজীকে অগত্যা বাধ্য হয়ে বহু দিনের শ্মশ্রুগুম্ফের পাট তুলে দিতে হয়। একদা গভীর রাত্রিতে এই ভাবে ক্ষৌরকার্য চলে। পরদিন প্রত্যুষে স্বামীজীর শ্মশ্রুগুম্ফহীন প্রসন্ন মুখের তরল হাসি, সদ্যোনিদ্রোত্থিতা বালিকা বুঝি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দেখছিল। এর পর বালিকার মনোবৃত্তির আশ্চর্য পরিবর্তন আশ্রমশুদ্ধ সকলকেই চমৎকৃত করে দেয়। কেন না, দেবীকে আর কোন দিন কেহ কোন প্রকার বিদ্রোহ করতে বা স্বামীজীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে দেখেনি। সে যেন স্বামীজীর ইচ্ছাশক্তির নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

সেই দিন থেকেই দেবীর সকল ভার স্বামীজীকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, পরিচ্ছদের ধারা, ভোজনের তালিকা, খেলাধূলার ব্যবস্থা—প্রত্যেকটি সুচিন্তিত পরিকল্পনায় স্বামীজী নির্বাচিত করে দেন। শিষ্ট বালিকার মত দেবী নির্বিচারেই সেগুলি অধিকাংশ সময় মেনে চলে সত্য, কিন্তু এক এক সময় সহসা তার চক্ষুর তারা দুটি যেন জ্বলে উঠে এবং সংগে সংগে একটা বিপর্যয় কাণ্ড করে বসে। সে সময় কেউ দেবীকে সামলাতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু আশ্চর্য, স্বামীজীর উপস্থিতিতেই বহ্নি নির্বাপিত হয় ; দেবীর উদ্ধত তনুলতা পুনরায় নম্র হয়ে সকলকে অবাক্ করে দেয়।

সে দিন স্বামীজীর খাস-কামরায় লালাজীর সংগে দেবীর এই আচরণ সম্পর্কেই স্বামীজীর আলোচনা চলছিল।

স্বামীজী ঈষৎ হেসে বললেন : সার্কাসের পোষা বাঘ দেখেছ ত লালা, দিব্যি খায়-দায়, বেড়িয়ে বেড়ায়, হাজার হাজার লোকের সামনে কত রকম খেলা দেখায়, ছাগল-ছানাকে পিঠে

তুলে নাচে। কিন্তু এরই ফাঁকে আগেকার স্বাধীন অবস্থার স্মৃতি তার মধ্যে কোন রকমে স্পষ্ট হয়ে উঠলেই সে তোলে বিদ্রোহ—বর্তমানের বন্ধন ছেঁড়বার জন্য তখন তাকে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই মেয়েটিরও হয়েছে তাই।

লালা: তাহলে কি আপনি বলতে চান, আপনার দেবীর মনে এখনো পূর্বস্মৃতি জাগে? এখনো কি এলাহাবাদের কথা সব ভুলতে পারেনি?

স্বামীজী: বাঘের উপমা দিয়ে যা বলেছি তাতেই কি তোমার প্রশ্নটির উত্তর পাওনি? সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলবার সময় এমন কিছু ঘটে, যাতে মনটা তার ফুটো হয়ে যায়, আর তারই ফাঁক দিয়ে পূর্বস্মৃতির আলো অমনি চোখে এসে পড়ে। এই জন্যেই আমি তাকে কারুর সঙ্গে মিশতে দিতে চাইনি।

লালা: কিন্তু মিশতে না দিলে তার স্বভাবটিই যে বুনো হয়ে যাবে দাদাজী! দশটা মেয়ের সঙ্গে না মিশলে, দৌড়-ঝাঁপ, ছুটোপাটি, মারামারি—এ সব না করলে আপনার দেবীকে সব দিক দিয়ে আপনি চৌখোস করবেন কি করে? শুধু লেখাপড়া শেখালে, আর খবরের কাগজ পড়ে বোঝালেই কি তাকে আপনার 'দেবী চৌধুরাণী' করে তুলতে পারবেন?

স্বামীজী: তোমার এ-যুক্তি ত আমি অস্বীকার করিনি লালা! সেই থেকেই ত দেবী ও-পড়ায় গিয়ে রীতিমত মিশছে, খেলছে, দৌড়ঝাঁপ করছে। কিন্তু তাতে অসুবিধে হচ্ছে কি জান,—ওদিকের আকর্ষণটা এত বেশী যে এখানকার কাজগুলো যেন একপেশে হয়ে পড়ছে।

লালা: ত্রুটিটা কি ওরই ঘাড়ে চাপাতে চান দাদাজী? বয়সটা দেখে তবে বিচারটা করা উচিত। আরো দু-চারটে বছর যেতে দিন, দেখবেন তখন—এদিকের 'এলেম'টিও কতকটা দখল করে বসেছে। এখনই যা শিখেছে, তা কি বয়স হিসাবে অন্যের পক্ষে পর্বত নয়?

স্বামীজী : সেটা ঠিক। তবে কি জান লালা, আমার যেন আর সবুর সইছে না। নিজের বয়স যত গড়িয়ে চলেছে, ততই দুশ্চিন্তা গভীর হয়ে উঠেছে—জীবনের সাধটা বুঝি অপূর্ণই থেকে যায়। তোমারই চেষ্টা আর উদ্যোগে মেয়েটাকে পেয়ে আমি জীবনের মোড়টা পিছন থেকে ফিরিয়ে জোর করে সামনের দিকে নিয়ে চলেছি ; —তাকে টানছে ঐ মেয়েটা।

লালা : সে ত দেখতেই পাচ্ছি। জীবনটা মরচে ধরে ক্রমশঃই অচল হয়ে পড়ছিল, এখন ঐ মেয়েটা তেজী ঘোড়ার মত টেনে শুধু যে সফল করেছে তা নয়, শ্রী-ছাঁদ পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। তার সাক্ষী আপনার চেহারা, খাওয়া-পরা আর হাল-চাল। প্রয়াগের মেলায় যে লোক আপনাকে দেখেছিল, হলফ করে বললে বিশ্বাস করবে না যে সেই লোক আপনি! সেফ্‌টি ক্ষুরে নিত্য খেউরি হন, স্নো-পাউডারের প্রলেপ দেন! ভাগ্যিস্ মেয়েটার দাড়ীর ওপরে অতটা বিষদৃষ্টি হয়েছিল।

লালার শেষের কথাগুলি, স্বামীজীর সর্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ তুলে দিল। আত্মবিস্মৃতের মত বিহ্বল ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন : দেবীর ঐ দৃষ্টির মধ্যেই আর একটা মেয়ের মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠে আমাকে ঠেলে দিত পিছনে, অমনি সব গোলমাল হয়ে যেত!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানেই লালা চেয়েছিল। মনে মনেই তিনি বুঝি স্বামীজীর অস্পষ্ট কথাগুলির একটা অর্থ স্থির করে সহসা দৃঢ় স্বরে বলল : আজও গোল করে ফেলছেন দাদাজী, নিজের কথাতেই ধরা পড়ে গেছেন। এখন কবুল না করে আর উপায় নেই।

উভয় চক্ষুর দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং প্রশ্নভরে স্বামীজী বললেন : তার মানে ?

লালাজী গম্ভীর মুখে বললেন : আপনিই মনে করুন, বুঝতে পারবেন।

ইহাতেও স্বামীজীর মুখের ভাব অপরিবর্তিত দেখে লালাজী বললেন : সাধারণ লোকে যে ভুল করে পস্তায়, আপনার মত লোকের পক্ষে সে-রকম ভুল করা কি ঠিক দাদাজী? দেবীর ব্যাপারে প্রথম দিনই এলাহাবাদে আপনি এমনি একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আপনার ঐ ভুলের মধ্যে ঢুকে মনের সন্ধান কিন্তু পাইনি। তবে আমার ব্যগ্রতা দেখে নিজেই তখন বলেছিলেন—মনটাকে যদি আর কোন দিন এ ভাবে নড়তে দেখ লালা, সেদিন চাপা-পড়া মাটিগুলো তুলে গোড়াটা দেখিয়ে দেব। আজ যে কথায়-কথায় মনটি ঠিক সেই ভাবে নড়ে উঠেছে দাদাজী!

স্তব্ধ ভাবে ক্ষণকাল লালাজীর মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বামীজী বললেন : তুমি দেখছি আমার চেয়েও সয়তান!

তৎক্ষণাৎ মাথাটি নত এবং হাত দুখানি স্বামীজীর পাদদেশে প্রসারিত করে লালাজী বললেন : এ যে আমার পক্ষে মস্ত একটা 'সার্টিফিকেট' দাদাজী!

স্বামীজী গম্ভীর মুখে বললেন : আমি এখন বুঝছি লালা আমার মনোবিজ্ঞানের খান কয়েক পাতা তোমাকে না পড়িয়ে মস্ত একটা ভুল করেছি। কিন্তু সে পাতাগুলো খোলবার আগে তার ভূমিকাটা তোমাকে সংক্ষেপে না শোনালে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে, বিশ বছর আগেকার মনে-লাগা কোনো একটা গানের সুর হঠাৎ যদি কানে লাগে, অমনি সমস্ত গানটি মনে প'ড়ে যায়। এটা হচ্ছে মনের কাজ, এরই নাম মনস্তত্ত্ব। এমনি আমাদের অতীত জীবনে বড় রকমের ব্যাপার যা ঘটে যায়, তার একটা প্রতিবিম্ব আমাদের মনের অবচেতন স্তরে যুগ যুগ ধ'রে জমা হয়ে থাকে, কোন হদিসই পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ—তার সংগে সম্বন্ধ আছে এমন সামান্য একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবামাত্রই সেই ঘটনার প্রতিবিম্বটি

অবচেতন থেকে একেবারে চেতন স্তরে এসে একটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে, পুরানো অনুভূতিটাও সংগে সংগে জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই জন্যই রক্ত দেখলে কিম্বা মাংসের গন্ধ পেলে চিড়িয়াখানার বাঘ গর্জন করে আনন্দ পায়। আমার উত্তেজনাটাও এমনি একটা পুরানো অনুভূতির আকস্মিক জাগ্রত অবস্থা—বুঝলে?

লালা: মনস্তত্ত্বের চেয়ে আমি দেহতত্ত্বটিই যে বেশী বুঝি দাদাজী! আমার মনে হয়, মনের ব্যাপারগুলো সবই অবাস্তব, কিন্তু দেহের কাজগুলো পুরোপুরি বাস্তব। তবে এই বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে যে একটা পুরাদস্তুর মাখামাখি ভাব আছে, তা-ও না বলতে পারি না। যাই হোক, ভূমিকা ত' শুনলুম, এবার কেতাবখানি শুনিয়ে দিন।

স্বামীজী: সত্যভঙ্গ আমি করব না লালা, অকপটেই আমার জীবনের অতীত অধ্যায়টি বলছি, শোন: আমার সম্বন্ধে এইটুকু তুমি জান যে, কতকগুলো ছেলেকে ধরে-বেঁধে দল পাকাবার জন্যেই আমার জেল হয়। কিন্তু তার আগের কোন পরিচয় তুমি পাওনি। শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার ছন্দই আমার ছাত্র জীবনকে মনোরম করেছিল। বাবা ছিলেন যাজক, বিশিষ্ট ভট্টাচার্য পদবী-ধারী বংশ। অর্ধকালীর সিদ্ধ-বংশধর বলে আমরা সমাজে সম্মানিত ছিলুম। ধর্ম আর ভগবান, ন্যায় আর পুণ্য—এই আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই মানুষ হয়েছিলুম। মেধাবী ছাত্র ব'লে নিজের খ্যাতিও বড় কম ছিল না। ইংরেজী আর দর্শনে এম-এ পাশ করে যখন কুইন্স কলেজের অধ্যাপকপদে পাকা হয়ে বসি, আমার বাবাও তখন সেইখানেই সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকরূপে নাম করেছেন খুব। কলেজের কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় নিজেদের বাড়ী। তার কাছাকাছি বড় একখানা বাগানবাড়ীতে থাকতেন বেনারসের ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাহেব। তিনি ছিলেন আবার বাবার বাল্যবন্ধু, ময়মনসিং জেলার এক প্রসিদ্ধ

গ্রামেই তাঁদের নাকি বাল্যজীবন কেটেছিল। কাশীতে কর্মস্থানে দীর্ঘকাল পরে একই অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার সুযোগে তাঁদের শৈশব-জীবনের হৃদ্যতা আবার নূতন করে এমন জেঁকে উঠল যে, দুই বাড়ীর মধ্যে সঙ্কোচের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জজ সাহেব হলেন সম্পর্কে কাকা, তাঁর মেয়ে অনুপমা সেই সম্পর্ক ধরে দাদা বলেই আমাকে মেনে নিল। তন্বী সুন্দরী সে, মুখখানা এত চমৎকার যে, চোখে পড়লে পল্লব পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়, বয়স তখন বছর পনেরো, এনি বেসান্তের থিওজফিক্যাল গার্ল'স স্কুলে পড়ছে। জজ সাহেব বরাবর বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছেন, তাঁর মতটিও ছিল খুব উদার, তাই তখন পর্যন্ত মেয়েকে আইবুড়ো রেখে স্কুলে পড়াচ্ছিলেন, আর—আমার মত তরুণ বয়স্ক যুবকের সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারে মিশতে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি কিম্বা মনে কোন রকম অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

লালা নিবিষ্ট মনেই কথাগুলি শুনছিল, এই সময় সহসা বলে উঠলো : অবিশ্বাসের কথাই বা এল কেন দাদাজী? দু'পক্ষে অত মাখামাখি যখন, বিয়ের কথাটাই ত'...

লালার কথায় বাধা দিয়ে স্বামীজী একটু চাপা গলায় বললেন : শোন কথা; আরে বোকা, বিয়ের কথা ওখানে উঠবে কোথা থেকে! বললুম না, আমি হচ্ছি ভট্টাচার্যের ছেলে আর জজ সাহেব যে কায়েত—অর্থাৎ বাংলা দেশের 'লালা'। বামুন-কায়েতের মধ্যে বিয়ের কথা তুলবে সামাজিক মানুষ? অসম্ভব! কিন্তু আমার মন যে কোন্ ফাঁকে সমাজের এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটাকে বিস্তীর্ণ করে ফেলেছে, আর, আত্মার মিলনেচ্ছাটিই সেখানে বড় হয়ে মানুষের তৈরী ব্যবস্থাটাকে একেবারে মুছে দিয়েছে, সেটি জানতে পারিনি। জানতে পারলুম সেই দিন—কলেজ-ম্যাগাজিনে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে আমার লেখা একটা প্রবন্ধের ব্যাপার নিয়ে যখন খুব সাড়া

পড়ে গেছে,—আর সেটা অনুর কানে পর্যন্ত গিয়ে উঠেছে। কেন না, সেদিন সন্ধ্যার সময় তার পড়ার ঘরে ঢুকতেই সে একখানা কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল—'পড়াতে বসবার আগে টিকিটি তোমার কেটে ফেল দাদা!' এর আগে আর একদিন সে আমার কিশলয়ের মত নূতন গজানো দাড়ীগুলি নিশ্চিহ্ন করবার জন্য জিদ ধরেছিল। সে দিনের যুক্তি ছিল তার—টিকি আর দাড়ী দুটোয় মিশ খায় না। তবে বাধ্য হয়েই সেদিন আমাকে টিকি আর দাড়ী দুটোরই মাহাত্ম্য প্রচার করে তবে তাকে শান্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু এ-দিন আর তাকে বশে আনা গেল না। ধনুর্ভঙ্গ-পণ তার—টিকি না কাটলে কিছুতেই আমার কাছে সে পড়বে না। জেদে আমিও কম যেতুম না, বললুম—বিদ্যাসাগর নতুন মতবাদ প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে কেউ তাঁকে টিকি কাটতে বলেনি। উত্তরে অনু তার মুখখানার এক অপূর্ব ভঙ্গি করে বলল—বিদ্যাসাগরের কোন বিধবা ছাত্রী ছিল আর তার ওপর নিদারুণ একটা লোভ থাকার জন্যই যে তাঁকে বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা প্রচার করতে হয়েছিল—এমন কথা শুনিনি। মেয়েটির প্রতিবাদের যুক্তি আর মুখের ভঙ্গি আমার চোখের পর্দা যেন খুলে দিল। বুঝতে আর বাকী রইল না, তাকে পাবার লোভ আমার ঐ লেখাটার ভিতর দিয়েই তার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে। মনে মনে খুসীই হলুম, আর মনের সঙ্গে মিলিয়েই ঝাঁ করে কথাটার পাল্টা জবাব দিলুম—সে-রকম সুযোগ যদি তাঁর আস্‌ত তখন, তাহলে তাঁর মতবাদ অত বাধা পেত না। কথায় আছে—'আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যে শিখাইবে।' এদিক দিয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবান! কথাগুলো বক্তৃতার সুরে এক নিশ্বাসে শেষ করে আমি তার মুখের পানে তাকাতেই দেখলুম, এত বড় কথা শুনে তার মুখের ভাব একটুও বদলায়নি, ঠোঁটের কোণে স্বচ্ছ হাসিটুকু তেমনি জড়িয়ে আছে, শুধু চোখের তারা দুটি একটু বেশী চক্‌চক্‌ করছে। চোখাচোখি হতেই অনু বলে উঠল—আজ থেকে আর দাদা বলে তোমাকে

ডাকব না, টিকি দাড়ী আর যুক্তির জোরে তুমি সাধু হয়ে গেছ। আমি তোমাকে সাধুজী বলেই ডাকব। এর পর আমাকে দেখলেই সে সাধুজী বলে ডাকত, আর এমন অপূর্ব একটা স্বুরে ডাকত যে শুনেই তন্ময় হয়ে যেতুম।

লালা এই সময় ঝাঁ করে বলে উঠল ঃ এখন বুঝতে পেরেছি দাদাজী, দেবীকেও আপনি সাধুজী ব'লে কেন ডাকতে বাধ্য করেছেন! দেবীর গলার মিষ্টি স্বুরের ভিতর দিয়েই অতীতের সেই অতিবাঞ্ছিত ডাকটি অনুভব করতে চান!

লালার কথাটার কোন উত্তর না দিয়ে স্বামীজী আপন মনেই বললেন ঃ এখন গল্পটার উপসংহার করা যাক। এর পর মনের উৎসাহ এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ল যে, বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সমাজের যা-কিছু প্রচলিত মতবাদ, প্রত্যেকটিকে পরিহাস করে একখানি কেতাব লিখে ফেললুম। বইখানা ছাপাবার জন্যে একটি মাস আমাকে এলাহাবাদে বাস করতে হয়। সেখান থেকেই ছাপা বই সর্ব্বপ্রথম রেজিষ্টারী ডাকে অনুর নামে পাঠিয়ে দিই। টাইটেলের পরেই উৎসর্গ পত্রে বড় বড় অক্ষরে যে কয়টি কথা ছাপা হয়েছিল, এখনো তা মনে আছে।

কথাগুলি হচ্ছে ঃ যাকে প্রথম চোখে দেখেই আমার মনের ঘটে এই উদার মতের বীজগুলি সঞ্চিত হয়, যার নিবিড় সংস্পর্শে ক্রমশঃ সেগুলি অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে ওঠে, আজ সেই সযত্ন-গ্রথিত মত-মঞ্জরীগুলি মঞ্জুভাষিণী অনুপমার মঞ্জু-করে সাদরে উপহার দিলাম।

বিস্ময়ের স্বুরে লালা বলে উঠল ঃ বলেন কি? অবিবাহিতা কন্যার নামে বইয়ের পাতায় এই কথাগুলো ছেপে দিলেন?

স্বামীজী সহজ স্বুরেই বললেন ঃ তখন যে ভাব-জগতে বিচরণ করছিলুম; তরুণ বয়স, তার ওপর রূপ আর মতের মোহ—দুটোই দুর্বার। সমাজের দৃষ্টিতে যে খুবই খারাপ, সেটা তখন মনে

আসেনি। এর পর ছাপানো বইগুলো নিয়ে কাশীতে ফিরে এসে জজ-সাহেবের বাড়ীতে ধূলো-পায়ে ঢুকতেই প্রথম ধাক্কাটা খেয়ে আকাশ থেকে পড়লুম আর কি! জজ-সাহেব তখন তাঁর বসবার ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। আমাকে দেখেই চাপরাসীকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। কাছে গিয়েই মামুলী প্রথায় স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেই আঙ্গুল দিয়ে সামনের ঘরখানা দেখিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকে তাঁর মুখের পানে তাকাতেই চম্‌কে উঠলুম। মনে হল, সেই হাস্যময় সদা-প্রসন্ন মুখখানার উপর একটা হিংস্র জানোয়ারের মুখ কে যেন বসিয়ে দিয়েছে, চোখ দুটো জ্বলছে। ঘরের দরোজাটা পিঠ দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বাম দিকের র‍্যাক থেকে একখানা বই তুলে আমার সামনে গোল টেবিলের মাঝখানে ফেলে দিলেন, আর সেই সঙ্গে ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে হুকে টাঙ্গানো সাপের ন্যাজের মত চামড়ার চাবুকটি টেনে নিয়ে সেইটিই আঙ্গুলের মতন হেলিয়ে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলেন—এ বই তোমার লেখা? সেটি আমারই জ্ঞান-বৃক্ষের প্রথম ফুল বা ফল—এলাহাবাদ থেকে ডাকযোগে যেখানি অম্বুর নামে পাঠিয়েছিলুম। তখন পর্যন্ত অবস্থাটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি, সপ্রতিভ ভাবেই স্বীকার করলুম যে বইয়ের লেখক আমিই। এর পর তাঁর দাঁতের ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন বেরিয়ে এল আরও তীক্ষ্ণ হয়ে—বই লেখবার স্বাধীনতা তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার মেয়ের নামের সঙ্গে এই নোংরা কথাগুলো ছাপবার অধিকার তোমাকে কে দিলে?—প্রশ্নের সঙ্গেই যেন মগজের চাপা পরদাটা কে খুলে দিল একটানে। সত্যই ত, অম্বুর নামটি স্পষ্ট করে ছেপে দেওয়াতেই আজ অধিকারের কথা উঠেছে! কিন্তু পরক্ষণেই তারুণ্যের অভিমান দীপ্ত হয়ে আমাকে তাতিয়ে দিল। চোখ তুলে উত্তর করলুম—'যা সত্য, তাই অকপটে লিখেছি। কাউকে কিছু দেওয়াটা হচ্ছে আমার ইচ্ছাধীন, তবে নেওয়াটা অন্যের ইচ্ছার

উপরেই নির্ভর করে। এখানে অধিকারের কোন প্রশ্ন নেই।' চাবুকের মাথাটা টেবিলের ওপর সজোরে ঠুকে জজ-সাহেব হুঙ্কার তুললেন—সাট-আপ্! কি বলব, তুমি জাতে ব্রাহ্মণ, তার ওপর তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু, নতুবা এই চাবুক দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া তুলে ও-কথার জবাব দিতাম।—এত বড় কথার পর আর বসে থাকা চলে না, মাথার ভিতরে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। মুখের কথা মুখেই চেপে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু হাতের চাবুকটি তুলে জজ-সাহেব শাসালেন—'যাবে কোথায়? তোমার বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি আসছেন। তাঁর সামনেই এ ব্যাপারের হেস্ত-ন্যেস্ত একটা হলে তবে তোমার নিষ্কৃতি।'

পরের ব্যাপারটির কথা সংক্ষেপেই শেষ করছি। সেই ঘরেই ঘণ্টা খানেক আমাকে আটক রেখে আমার বাবা আর অনুর বাবা দুই ঝুনো বৃদ্ধের পাকা মাথা থেকে যে যুক্তি-বহ্নি বেরুল, তাতে ছাপা বইগুলিকে আনিয়ে আমার চোখের সামনে পুড়িয়ে ফেলা হল। এর ওপর জজ-সাহেব জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাড়ীর দরজাই যে শুধু আমার জন্যে বন্ধ থাকবে তা নয়, আমাকে কাশী ছেড়ে অন্তত একটি বছর এলাহাবাদে থাকতে হবে, সেখানকার কায়স্থ কলেজে তিনি আমার চাকরী জুটিয়ে দেবেন! আর, আমার বাবাও বন্ধুর এই ব্যবস্থা নির্ব্বিচারে মেনে নিয়ে হুকমী দিলেন যে, এর অন্যথা হলে তিনি আমাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করবেন না! ব্যস্. দুর্জয় জেদ আমাকেও পেয়ে বসল, যেমন ধূলো-পায়ে জজ-সাহেবের বাড়ীতে সেঁধিয়েছিলুম, সেখান থেকেও তেমনি সেই অবস্থাতেই বৈরাগ্যের পথে পাড়ি দিলুম।

লালা এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন: জজ-সাহেবের মেয়ের সংগেও দেখা করলেন না?

স্বামীজী গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন: না, তার যে মূর্ত্তি মনের মধ্যে এঁকে ফেলেছিলুম তাকেই ফুটিয়ে তোলা হল আমার কিছু

কালের সাধনা। প্রিয়জনদের পরিত্যাগ করলুম, বন্ধুদের সঙ্গ হারালুম, প্রফেসারী ছেড়ে দিলুম, কিন্তু অনুর স্মৃতি ভুলতে পারলুম না। বছর দুই পরে খবরের কাগজে দেখলুম, জজ-সাহেব বোম্বায়ে বদলী হয়েছিলেন, সেখানেই হার্টফেল করে মারা গেছেন। তখনো চলেছে পূরা উদ্যমে আমার মানস-প্রতিমার নিয়মিত অর্চনা। খবরটা পেয়েই মনটা দুলে উঠল, আমি তখন কন্‌খলে। সেখান থেকে লম্বা একখানা চিঠি ছাড়লুম অনুর নামে। পিতৃশোকে সমবেদনার সঙ্গে মানস-প্রতিমার উদ্দেশে কঠোর সাধনার কথাও বিস্তারিত ভাবেই তাতে লেখা ছিল। কিন্তু পত্রের উত্তর পেয়ে একবারে যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লুম। উত্তর দিয়েছেন - হরপ্রসাদ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক। খুব সংক্ষেপে লিখেছেন তিনি—অনুর কাছে আপনার ইতিহাস সবই শুনেছি আমি। আমরা ভেবেছিলুম, সর্বত্যাগী হয়ে আপনি মানস-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন! কিন্তু তার বদলে আপনি যে পূর্ণ উদ্যমে মানস-প্রতিমা গড়তে লেগে গেছেন, এ খবর পেয়ে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করছি। অনুগ্রহ করে একদিন অধীনের অফিসে পদধূলি দিয়ে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী অনুপমার বাস্তব-প্রতিমার সঙ্গে আপনার মনে-গড়া মানস-প্রতিমাটি মিলিয়ে দেখতে পারেন।

লালা বিস্ময়ের সুরে বলল: সর্বনাশ! এ যে সেই—গ্রীক্ মিট এ গ্রীক্—অর্থাৎ সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলির মতন হল। তারপর? গেলেন নাকি বোম্বায়ে?

স্বামীজী শুষ্ক স্বরে বললেন: পাগল! তাহলে বুকের ছাল তুলে ছবি খুঁজে বার করত ঐ হরপ্রসাদ! ডাইরেক্টরী খুলে জানতে পারি—সে একটা মস্ত মার্চেণ্ট ওখানকার। অবিশ্যি কারবারটা জজ সাহেবই ফেঁদেছিলেন। সেই দিন থেকেই মনের ছবির ওপর পরদা ফেলে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরলুম। খেয়ালের বশে অনেক কিছুই করা গেল, নানা রকম রাস্তা খুঁজে বার করে

খুব ছুটোছুটিও চলল। কিন্তু কেউ যদি সন্ধানী দৃষ্টিতে তল্লাস করত, তাহলে বোধ হয় বেরিয়ে পড়ত যে ও-সবের তলে তলে রয়েছে মস্ত একটা আক্রোশ—ঐ মেয়েটাকে ঘিরে। কিন্তু ক্রমে তার স্মৃতি চাপা পড়েই গিয়েছিল। সে চাপা খুলে দিল তার মেয়ে···আর উপলক্ষ হলে তুমি।

লালা: কিন্তু এখন আপনি ইচ্ছা করলেই মনের আক্রোশ মেটাতে পারেন। হরপ্রসাদ ঘোষ মেয়ের জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

স্বামীজী: তাহলেই কি মনের আক্রোশ আমার মিটবে বলতে চাও?

লালা: টাকার লোভ আপনার নেই তা জানি, এদিক দিয়ে আপনি পরমহংস; টাকা-পয়সা স্পর্শও করেন না। তবে একটা মতলব ত কিছু আছে। না হয় দেবী চৌধুরাণীই তৈরী করলেন, কিন্তু তারপর? মেয়েকে দিয়েই কি শেষে বাপের ঐশ্বর্যের উপর ডাকাতি করে কিম্বা মাকে ধরে এনে মনের ঝাল মেটাবেন দাদাজী?

স্বামীজী: এ কথার উত্তর আমি তোমাকে এখন দিতে পারব না লালা; কেন না, আমি নিজেই তা জানি না। এখন আমি ওকে শুধু আমার মনের মতন করে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব—যে পর্যন্ত বয়স ওর ষোল পূর্ণ না হয়। অনুর ছবি আমার মানস-পটে যখন আঁকতে সুরু করি—তখন সে-ও ছিল প্রায় ষোড়শী···এর বেশী আর কিছু বলব না লালা, তুমিও এ-সম্বন্ধে আর প্রশ্ন তুল না ভাই! সময়ে সবই জানতে পারবে—বুঝেছ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে লালা বলল: আপনি যতটুকু বললেন দাদাজী, এই যথেষ্ট। এর পরের অধ্যায় জানবার প্রলোভন আমার নেই। আমি অতীত আর ভবিষ্যৎ ছেড়ে বর্তমানকে নিয়েই সাধনা চালাতে ভালবাসি।

স্বামীজী: তাই উচিত, বুদ্ধিবৃত্তির এইটিই হচ্ছে প্রধান অঙ্গ।

আজ কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বসে দেবীর খেলা দেখতে আর যাওয়া হল না। তুমিও সেখানে অনুপস্থিত, খেলা বোধ হয় ওদের আজ আর হবে না।

লালা: আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলেই খেলার একটা নতুন ধারা দেখিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনার দ্রোণাচার্যের অনুকরণ আর কি! একটা পাখী তৈরী করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছি। একশো হাত তফাতে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে তার চোখটি বিঁধতে পারলেই বাঁধন কেটে পাখীটা ঝুপ করে পড়ে যাবে। সেই প্রতিযোগিতাই ওদের চলেছে।

স্বামীজী উঠবার উপক্রম করে বললেন: চল তাহলে দেখা যাক খেলাটি কি ভাবে শেষ হল; মেয়েটাও অনেকক্ষণ চোখের আড়ালে রয়েছে।

স্বামীজীকে উঠতে দেখে লালাও উঠল। পরক্ষণেই কক্ষের রুদ্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল দেবী। হাতে তার বাখারীর ধনুক, পিঠের দুই দিকে দুইটি তূণ পরিপাটি করে বাঁধা, তাতে নলখাগড়ার মুখে সংযুক্ত লোহার সরু-সরু ফলাগুলি চিক্-চিক্ করছে। মেয়েটির কালো লম্বা চুলগুলি বেণীবদ্ধ হয়ে পিঠে দুলছে, তার প্রান্তভাগে একটি পঞ্চমুখী জবাফুল বাঁধা। লাল পাড়ের যোগিয়া রঙের সাড়ীখানি হাতকাটা জামাটির সংযোগে আঁটসাট করে তার সুডৌল দেহটিকে আবৃত করেছে। অনাবৃত বাহুমূলে ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার আকারে সুশ্রী ফুলের বেষ্টনী। কানে রক্তবর্ণ দুটি প্রবাল ঝুলছে, ললাটে সিন্দুরের উজ্জ্বল ফোঁটাটি যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে, তার একটু উপরে চুল ঘেঁসে ফিতার মত প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণের এক শ্রেণীর লতার দ্বারা ফেট্টি বাঁধা; সুন্দর মুখখানি সাফল্যের উল্লাসে সমুজ্জ্বল।

দেবী আসতেই উভয়ে পুনরায় বসলেন এবং স্বামীজী লালাকে লক্ষ্য করে বললেন: একেবারে শিকারী সাজিয়েছ দেখছি!

দেবীই উপরপড়া হয়ে তাড়াতাড়ি কথাটার উত্তরে বলল : শুধুই সেজেছি নাকি, শিকারও করেছি। আপনি ত' শিকার দেখিয়ে এলেন ওস্তাদজী, তারপর যা মজা হল।

ওস্তাদজী অর্থাৎ লালা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেবীর পানে চাইতেই দেবী বলল : আপনার চামেলী জোর করে বলেছিল, পাখীটার চোখ বিঁধতে সেই পারবে। কিন্তু পেরেছি আমি, চামেলীর মুখ চূণ হয়ে গেছে।

সিদ্ধির আহুতিরূপে সিদ্ধাশ্রমে যে কয়টি জীবন্ত সমিধ আহৃত হয়েছে, চামেলী নামে মেয়েটি তাদেরই একজন। আশ্রমেই মেয়েদের মধ্যে এই পাঞ্জাবী মেয়েটিই দেবীর মত বুদ্ধিমতী এবং খেলাধূলায় তার প্রতিযোগিণী।

লালা : বল কি, তুমি ত' তাহলে লক্ষ্যভেদেও সবার ওপরে উঠে গেলে !

তাই ত', তোমার লক্ষ্যভেদটা দেখাই হল না আমাদের! সে-দিন সাঁতার কাটা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলুম।

দেবী : সাঁতারেও চামেলী আমাকে হারাতে পারেনি, তিন বারই আমি সবার আগে পার হয়েছি।

লালা : কিন্তু দৌড়ে তুমি চামেলীকে হারাতে পারনি, দেবী! তিনটে দৌড়েই সে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

দেবী : এবার যে-দিন দৌড়ের পরীক্ষা হবে দেখবেন—কে কাকে হারায়।

লালা : বল কি, তুমি ঐ দৌড়বাজ মেয়েটাকে হারিয়ে দেবে ভেবেছ ? পারবে ?

দেবী : না পারি ত' নিজের ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলব। প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দৌড় শিখছি, তা বুঝি জানেন না ? চামেলী এবার আসুক না ছুটতে।

লালা : ভাল, দেখা যাবে কে হারে কে জেতে—কালই তোমাদের দৌড়ের পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

স্বামীজী: শিকারীর সাজ এখন ত' ছেড়ে ফেল, এবার পড়া চলবে।

দেবী: পড়া নয়—গল্প। পড়বার আগে ত' গল্প শোনবার কথা। কালকের গল্পটি আজ শেষ করতে হবে সাধুজী! অর্ধেক শুনেছি; মনে থাকে যেন কাপড় ছেড়েই আমি এখুনি আসছি—বলেই দ্রুতবেগে সে কক্ষান্তরে চলে গেল।

লালাজী জিজ্ঞেস করলেন: কিসের গল্প এখন চলছে দাদাজী?

স্বামীজী বললেন: দেবী চৌধুরাণীর। কাল বলা সুরু হয়েছে, আজ শেষ করতেই হবে।

বলল: রোখ দেখলেন ত', কোন বিষয়েই পেছপাও নয়, কারুর পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। বলল শুনলেন ত'—এবার হেরে গেলে পা ভেঙ্গে ফেলব! দৌড়ে চামেলীর সংগে পারেনি বলে প্রজাপতির সংগে পাল্লা দিয়ে দৌড়ের কসরৎ করছে!

স্বামীজী হেসে বললেন: সেই জন্যই ত' দেবী চৌধুরাণীর গল্পটা শুনিয়ে জমি তৈরী করে রাখছি; এর ওপর তুমি আবার ওকে ঝাঁকে মিশিয়ে যে ভাবে পাকাপোক্ত করে তুলছ সব রকমে, ষোলয় পড়লে দেখো এ মেয়ে কি হয়!

লালাজী কি ভেবে সহসা প্রশ্ন তুললেন: আচ্ছা দাদাজী, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—মনের জোর যার এই বয়সেই এতখানি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে কি একটা টোটকা ওষুধ আর আপনার ইচ্ছা-শক্তির জোরে আগের কথা সব ভুলে গেছে মনে করেন?

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লালাজীর মুখের পানে চেয়ে স্বামীজী বললেন: তোমার টোলের মেয়েগুলোর অবস্থা দেখেও কি এটা বুঝতে পারনি লালা?

লালা: তাদের কথা আলাদা। তবুও কাউকে কাউকে আনমনা হতে দেখেছি, ঘুমের ঘোরে এক এক জন হেদোয়, বাপ মা ভাই বোনকে ডাকে। চামেলীকেই কিছু বেশী বাড়াবাড়ি করতে দেখছি।

তবে আমার সামনে সজাগ অবস্থায় এখন আর কেউ টুঁ শব্দটিও করে না।

স্বামীজী : নিদ্রিত অবস্থায় ওদের অবচেতন মন জাগ্রত হয়ে ওঠে, ওগুলো তারই ক্রিয়া। কিন্তু দেবীর সম্বন্ধে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, জাগ্রত অবস্থাতেও তার অবচেতন মন পূর্বস্মৃতির সামান্য একটু স্পর্শেই সাড়া দিয়ে ওঠে। কাল সেই অবস্থাই দেখা গিয়েছিল।

লালাজী : কি রকম ?

স্বামীজী : দেবী চৌধুরাণীর গল্প বলতে বলতে যেই হরবল্লভের কথা উঠল, অমনি দেবী তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় করে নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে উঠল—হরবল্লভ ? বউকে তাড়িয়ে দিল !···আচ্ছা, আমার বাবার নামও হর···এই পর্যন্ত বলতেই আমি তার চোখের পানে চেয়ে জোর-গলায় বললুম—তোমার বাবার ও-নাম হতে যাবে কেন ?

লালাজী : তার পর ?

স্বামীজী : একবার চম্‌কে উঠেই আস্তে আস্তে বলল—'তাই ত', আমার বাবা হলে অমন করে কখনও তাড়িয়ে দিত না।' বুঝলুম, গল্পের হরবল্লভ নামটি শুনেই ওর অবচেতন মনের-তারে বাপের হরপ্রসাদ নামটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। এর পর হরপ্রসাদের নাম চেপে 'ব্রজেশ্বরের বাবা' বলে গল্প শুনিয়ে তবে নিষ্কৃতি পাই। এমনি করেই এই শক্ত মেয়েটির মন থেকে পূর্বস্মৃতি আমাকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে লালা। এ যেন সেই—বাঘের সঙ্গে খেলা চলেছে, একটু ভুল হলেই হালুম করে লাফিয়ে উঠবে।

লালা একটু থেমে বললেন : এ মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মনের মত করে গড়ে তোলা বড় সোজা কথা নয় ; আপনি বলেই পারছেন। যা হোক, চামেলীকেও এখন থেকে আপনাকে একটু ভাল করে তালিম দিতে হবে দাদাজী।

স্বামীজী মৃদু হেসে বললেন : সে তো দিচ্ছিই গো—যখনই

যেখানে জল পড়ছে বলছ, সামলানো যাচ্ছে না, তখনই ছুটতে হয়েছে ছাতি ধরে। বল ভায়া, কোন দিন 'না' বলেছি ?

লালা বলল : আমরা যাই করি না কেন, এটা ভাল করেই জানি মাথার আপনি স। কাজ যেখানে আটকাবে, আমার সাধ্যে কুলাবে না—সেখানেই আপনি গিয়ে দাঁড়াবেন 'মুস্কিল আসান' হয়ে। আচ্ছা, এখন তা হলে উঠি দাদাজী, আপনার ত' এখন গল্পের আসর বসবে, আমার ছাত্রীরাও আটচালায় গিয়ে জমেছে—পাঠশালা সেখানে বসিয়ে গুরুম'শায় হতে হবে আমাকে।

স্বামীজী বললেন : হ্যাঁ হে ভায়া, তোমার মেয়েগুলোকে নাকি জাত-ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষায় লায়েক করে তুলতে উঠে-পড়ে লেগেছ ! ব্যাপার কি ?

লালা উত্তর করল : ব্যাপারটা একটু বাঁকা রকমের দাদাজী ! আপনি যেমন দেবীকে বাংলা, হিন্দী, উর্দু আর ইংরেজী—এই চারটে ভাষায় লায়েক করে তুলতে চান, ওদের সম্বন্ধে আমার ইচ্ছাটিও তাই। তবে কি জানেন, বাঙ্গালী জাতটা ওপরপড়া হয়ে পরের ভাষা শেখে, বিদেশে গিয়ে মনের জোরে বিদেশী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু অন্য জাত এর ঠিক উল্টো। তারা যেখানেই যাক, জাত-ভাষার মায়া কিছুতেই ছাড়বে না। এই জন্যেই ওদের জাত-ভাষাগুলোর ওপর আপাতত ধামা চাপা দিয়ে বাঙলা আর ইংরেজীকেই চালু করে দিয়েছি। এরাও যখন সব যোলয় পড়বে—তখন এর ফল কি হয় দেখবেন !

ঈষৎ হেসে স্বামীজী একটি সংস্কৃত প্রবচন আবৃত্তি করলেন—

এক ভূরুভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥

লালা বলল : শ্লোকটির অর্থ ত' ঠিক বুঝতে পারলুম না দাদাজী !

স্বামীজী বললেন : অর্থ হচ্ছে—একই ক্ষেত্রে শালি এবং শ্যামা ধান জন্মে, উভয়ের দল কাণ্ড প্রভৃতি একই রকম ; কিন্তু ফলের দ্বারা উভয়ের প্রভেদ জানা যায়।

মুখখানা গম্ভীর করে লালা বলল: আপনার শ্লোকটি সত্যই ভাববার মত; এটা আমার কাজে লাগবে। তাহলে এখন চললুম দাদাজী!

লালাজীর প্রস্থানের পরক্ষণেই দেবী বেশ-পরিবর্তন করে স্বামীজীর কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করল। পরনে একখানি ছাপানো বৃন্দাবনী শাড়ী, মাথার চুলগুলি বেণীবন্ধন হতে মুক্তি পেয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, অঙ্গে ফুলের আভরণগুলির কোন চিহ্ন নেই, সে স্থলে হাতে দু'গাছি করে সুশ্রী শাঁখা এবং গলায় এক ছড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শঙ্খেগাঁথা বিচিত্র মালা, ললাটে কাচপোকার একটি সুচিক্কণ টিপ। এই সামান্য বেশ-ভুষাতেই তার রূপশ্রী উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠে ঘরখানিকে যেন আলো করে তুলেছে!

নির্দেশ মত দেবী স্বামীজীকে 'সাধুজী' বলে ডাকতে অভ্যস্থ হয়েছে। দেবীর ন্যায় আশ্রমের অন্যান্য বালিকারাও তাঁকে 'সাধুজী' সম্বোধনেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। সপ্তাহে দু'দিন করে স্বামীজী আটচালার আসরে উপস্থিত হয়ে আশ্রম-বালিকাদিগকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁর আবাসভবনে একমাত্র দেবীই নিত্য নিয়মিতরূপে তাঁর নিকট অধ্যয়ন এবং উপদেশ ও গল্প শুনে জ্ঞানার্জন করবার সুযোগ পেয়েছে। স্বামীজী বেছে বেছে বিশ্ব ইতিহাস এবং উপন্যাসের তেজস্বিনী নারী-চরিত্রমূলক আখ্যানগুলি শুনিয়ে বালিকার কোমল অন্তরটির উপর একটি বলিষ্ঠ অনুভূতির সঞ্চার করতে বদ্ধপরিকর। গল্প শুনতে দেবীর আগ্রহ এবং উৎসাহ এরূপ প্রচুর যে, বড় বড় আখ্যায়িকা এক দিনেই সে নিঃশেষ করতে উৎসুক; কিন্তু স্বামীজী তার আগ্রহকে অধিকতর উদগ্র করবার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক স্থানেই গল্পের বিরাম দিয়ে পরদিনের জন্য ঝুলিয়ে রাখেন। অপরাহ্ণে খেলাধূলার পরই তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে সে স্বামীজীর বসবার ঘরে গল্প শুনবার আগ্রহে প্রবেশ করে এবং গল্পটি সম্পূর্ণ হবার পর স্বামীজীর সংগেই

তাকে সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এরূপ বাঁধা-ধরা নিয়মের চাপে পড়ে তার পূর্ব-স্মৃতি সমাহিত হয়ে পড়ে এবং পুনরায় যাতে অতর্কিতে সমুখ হয়ে ছাত্রীটিকে চঞ্চল বা চিন্তান্বিত করে না তোলে, সেদিকে স্বামীজীকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়।

লালাজীকে বিদায় দিয়ে স্বামীজী তাঁর গল্পের খেইটি ধরবার উপক্রম করছেন, এমন সময় দেবী তড়িৎগতিতে এসে একবারে তাঁর গা ঘেঁসে বসে বলল : কাল যে আপনি বলছিলেন সাধুজী, আমার বাবার ও-নাম হবে কেন,—আজ কিন্তু আমি ভেবে ভেবে জেনেছি—আমার বাবারও নাম ছিল 'হর'……

বালিকার কথার সংগে সংগে স্বামীজীর চক্ষুর তারা দুটিও এরূপ প্রদীপ্ত হল যে তার আভায় দেবীর কোমল মুখখানি বুঝি ঝলসিয়া গেল। দেবীর কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হতেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির সংগে স্বামীজী গর্জন করে উঠলেন : 'মিছে কথা, অমন কথা মনে ভাবাও মহাপাপ, দেবী! তোমার বাবার ও-নাম নিশ্চয়ই ছিল না।'

দৃষ্টির প্রখরতা এবং কণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বরের প্রভাবে বালিকা অভিভূত হয়ে পড়লেও মুখখানি তুলে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : ছিল না?

তার জিজ্ঞাসু চক্ষু দুটির উপর নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্বামীজী দৃঢ় স্বরে বললেন : না—ছিল না।

বালিকার কণ্ঠ তথাপি স্তব্ধ হল না, প্রশ্ন উঠল : কিচ্ছু ছিল না? আমার বাবা, আমার মা, আমার দিদি, আমার বাড়ী……

তর্জনের মত স্বরে স্বামীজী বললেন : না—না—না, আমি বলছি—না, কিছুই তোমার নেই। আমি বল্‌ছি…নেই—নেই—নেই।

বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীজীর পানে চেয়ে বালিকা স্বপ্নাবিষ্টের মত বলল : নেই—নেই—নেই! সংগে সংগে তার দুটি চক্ষু মুদিত হয়ে এল। স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ তার চিবুকটি তুলে ধরে আহ্বানের সুরে ডাকলেন : দেবী—দেবী……

ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে দেবী এবার মুদিত দুই চক্ষু

বিস্ফারিত করে চাইল, তার পর অপ্রতিভের মত হয়ে বলল: অ-মা, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নাকি?

স্বামীজী বললেন: বেশ, যা হোক, গল্প শুনবে বলে এসে বসলে, তারপর অমনি মেয়ের ঘুম! শিকারের খেলায় ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—নয়? গল্প শোনা তাহলে আজ থাক, কি বল?

বালিকার উৎসাহ পুনরায় জাগ্রত হয়ে উঠল, কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়ে বলল: বা-রে, গল্প শুনব বলে ছুটে এলুম, আর আপনি বলছেন আজ থাক। না, তা হবে না, আজ ও-গল্প শেষ করতেই হবে।

স্বামীজীকে তখন মৃদু হেসে তাঁর গল্পের শেষাংশ আরম্ভ করতে হল:—সেই ত' সাহেব আর ব্রজেশ্বরের বাবাকে বোকা বানিয়ে দেবী রাণী তাঁর বজরায় তুলে দিলেন। ঠিক সেই সময় আচমকা একটা ঝড় উঠে সব ওলট-পালট করে দিল। সাহেবের বরকন্দজরা নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, আর দেবীর বজরা তখন ছুটল তীর বেগে। বুদ্ধি খেলিয়ে আগে থাকতেই যে ফাঁদটি দেবী রাণী পেতে রেখেছিলেন, তাতেই সাহেব-বাঘটি ধরা পড়ল, আর তার সাথী ব্রজেশ্বরের বাবাও রেহাই পেল না। এখন এদের সংগে দেবী চৌধুরাণীর একটা বোঝাপড়া করবার সময় এল······

স্বামীজী গল্প যখন এভাবে জমিয়ে দেবীর মনে একটা পুলকের শিহরণ তুলছিল, সে সময় আশ্রমের অপর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ আটচালার মধ্যে অন্যান্য বালিকাগুলিকে নিয়ে লালাজীর বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানের বিচিত্র কসরৎ চলছিল।

এ-সম্বন্ধে লালাজীর উদ্দেশ্যের আভাস পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে। স্থির করেছেন যে, লালাজী তাঁর ছাত্রীগুলিকে সর্বাগ্রে বাঙ্গালা ভাষায় পাকা-পোক্ত করে নেবেন এবং সংগে সংগে ইংরেজী শেখাবেন। দেবীর যেমন বাঙ্গালা ভাষায় স্বাভাবিক জ্ঞান প্রচুর, এই মেয়েগুলিও তেমন হিন্দী ও উর্দু বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু লালাজীর ধারণা, ভালো করে বাঙ্গালা ভাষাটা শিখতে পারলে, যে-কোন ভাষা শেখবার আগড় খুলে যাবে।

শ্রীবৃন্দাবনের বিখ্যাত নিকুঞ্জনাটের কার্যধারা প্রয়াগের মহামেলার পরবর্তী একটি বছর ধরে এ ভাবে বিচিত্র গতিতে চলতে থাকে।

॥ তের ॥

বার বছর পরে···

পূর্বোক্ত ঘটনার পর অনেকগুলি বৎসর কালের পরিবর্তনশীল আবর্তে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং যুগান্তে যে কাল সবুজের হিল্লোল তুলে প্রগতির পথে অভিনব রূপে দেখা দিয়েছে—কর্মীপুরুষ হরপ্রসাদ তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। সে সংগে তাঁর গত যুগের বলিষ্ঠ উদার মনোবৃত্তি যেন আশ্চর্য রকমে বদলে গিয়ে দুর্বল ও কৃপণ হয়ে পড়েছে।

প্রয়াগের বেদনাদায়ক দুর্ঘটনার বৎসরটির শেষভাগে হরপ্রসাদ সেই যে সপরিবার তাঁর সযত্নরচিত প্রাসাদতুল্য নব বাসস্থান ত্যাগ করে বোম্বাই যাত্রা করেছিলেন, তারপর আর একটি দিনের জন্যও তাঁকে কেহ সেই অভিশপ্ত ভূমির ছায়াও স্পর্শ করতে দেখেনি। পাছে এলাহাবাদের বৈষয়িক আকর্ষণ ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তজ্জন্য এলাহাবাদের আফিস কানপুরে স্থানান্তরিত করেছেন এবং বাড়ী দু'খানি ডাক্তার অধিকারীর নির্বন্ধাতিশয্যে বিক্রয় না করে তাঁকেই বার বৎসরের জন্য এই সর্তে লীজ দিয়েছেন যে—বাড়ীর আয় হতেই তাদের সরকারী ট্যাক্স সরবরাহ এবং সংস্কারাদি চলবে, উপরন্তু হরপ্রসাদবাবুর নিরুদ্দিষ্টা কন্যার অনুসন্ধান-সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ-পত্রও নির্বাহ করতে হবে। ইতিমধ্যে ডাঃ অধিকারী রেণুকে যদি খুঁজে বের করতে সমর্থ হন—নির্ধারিত পুরস্কার ত' পাবেনই, উপরন্তু বসত-বাড়ীখানাও বোঝার উপর শাকের আঁটির মত কায়েমী ভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন হবে। কিন্তু বারো বৎসরের মধ্যে যদি তিনি রেণুর সন্ধানে অকৃতকার্য্য হন, তা হলে তাঁকে লীজ ফুরোবার সংগে

সংগে বার্ষিক পাঁচ শত টাকা হিসেবে বার বৎসরের দরুণ ছ' হাজার টাকার সহিত সুসজ্জিত বাড়ী ছ'খানি নিখুঁত অবস্থায় বিনা ওজরে হরপ্রসাদবাবু বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের হস্তে সমর্পণ করতে হবে।

এলাহাবাদের পাট যখন এভাবে দীর্ঘকালের মত চুকে যায়, সে সময় কলকাতায় মোটা রকমের কোন পাওনা টাকার ব্যাপারে বালিগঞ্জ অঞ্চলের কয়েক বন্দ জমি হরপ্রসাদের হাতে আসে। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান হরপ্রসাদ কমলার দেওয়া এহেন সুযোগটির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করলেন। পাশাপাশি ছ'টি প্লটের একটি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে অপর প্লটটির উপর ব্যবসাদারের উপযুক্ত পরিকল্পনায় এমন একখানি বড়সড় বাড়ী তৈরী করালেন যে, নিজেরা থেকেও বাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি ভাড়া দিয়ে রীতিমত আয়ের সংস্থান হয়। বাড়ী তৈরী হলে তাঁর বারো বছর পূর্বে হারানো মেয়ে রেণুর নামেই তার নামাকরণ করে আস্বস্ত হলেন।

নূতন বাড়ীতে সস্ত্রীক আসার পর ঘটনাচক্রে পরম রূপবান দিব্যকান্তি প্রিয়দর্শন একটি তরুণ যুবা বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ছেলেটির আশ্চর্য রকম দীর্ঘ ঋজু দেহ, বলিষ্ঠ বাঁধুনী, সর্বোপরি সহাস্য মুখখানি তাঁকে যেন অবাক করে দেয়। কলকাতায় এসে অবধি কত ছেলেই ত' তাঁর চোখে পড়ছে। চেয়ে চেয়ে তিনি বাংলার ছেলেদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যেন যাচাই করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এমন স্বাস্থ্যপুষ্ট বলিষ্ঠগঠন প্রিয়দর্শন ছেলে এই বুঝি তাঁর চিত্তে সর্বপ্রথম দোলা দিল।

ছেলেটির সংগে আলাপ পরিচয় করে জানতে পারেন, ছনিয়ায় আপনার বলতে তার কেউ নেই। ১৯৩৫ সালের ভূমিকম্পে তার আপন জন বা অভিভাবক বলতে যাঁরা ছিলেন একদিনে এক দণ্ডের মধ্যে একই সংগে ভূগর্ভে তলিয়ে গেছেন। ছেলেটি তখন কলকাতায় মেসে ছিল বলেই রক্ষা পায়। তারপর সে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে নিজের চেষ্টায়, সেই সংগে চিত্রবিদ্যায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে এই তরুণ

বয়সেই। লেক অঞ্চলে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে থেকে তাঁর ছেলেপুলেদের পড়াত এবং তাঁরই দেওয়া একখানি ঘরে তার ছবির সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ছবির কাজ করত। খাওয়া-দাওয়া মেসেই হত। কিন্তু সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি বদলী হয়ে স্থানান্তরে যাওয়ায় তাকে বড়ই বিব্রত হতে হয়েছে।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সময় হরপ্রসাদবাবুর সংগে তার পরিচয় ঘটে। সব কথা শুনে হরপ্রসাদবাবু নিজের বাড়ীতে এনে তাকে আশ্রয় দেন। নিচের তলায় একখানি ঘর ছেড়ে দেন। সেই ঘরে ছেলেটি তার ষ্টুডিওটি একটু জাঁকিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে। হরপ্রসাদবাবু তাকে বলেছেন—আমার ত' ছেলেপুলে নেই বাপু, যে পড়িয়ে ঘরভাড়া বা খাওয়াপড়া উসুল দেবে। তবে একটা ব্যবস্থা আমি স্থির করেছি। নিচের যে ঘরখানি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, এখনি তার চল্লিশ টাকা ভাড়া হয়। তারপর উপরে আমরা দু'বেলা খাব, আর তুমি হোটেল থেকে যাচ্ছেতাই খেয়ে স্বাস্থ্য হারাবে, সে হ'তে পারে না। তাই স্থির করেছি—আমার সংসারেই তোমার দু'বেলা খাওয়া, জল খাবার ইত্যাদি চলবে। তুমি বরং এ সবের দরুণ মোটামুটি কিছু ধরে দিও। যোয়ান ছেলে, শিল্পী, ছবি এঁকে দু'পয়সা উপার্জন করছ, কাজেই তোমাকে আমি ছোট হতে দেব না।

ছেলেটির নাম নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তবে নরেন বা নরু নামেই সে পরিচিত। হরপ্রসাদবাবুর প্রস্তাব শুনে সে যেন বর্তে গেল। তখনি জানাল: আমি যদি আপনাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিই দাদামশায়?

হরপ্রসাদ বললেন: আরে, তুমি যে একবারে সম্বন্ধ পাতিয়ে নাতী হয়ে গেলে। হ্যাঁ, যে টাকার কথা বললে, তাতে তোমার মেজাজ বোঝা গেল। কিন্তু বাপু, চাকরীবাকরী কর না, আর করবেও না ঠিক করেছ। বাঁধা আয় নেই, এ অবস্থায় মাস মাস পঞ্চাশ টাকা দেওয়া কি

চাড্ডিখানি কথা। যাক, তুমি ত্রিশ টাকা করেই দিও। কিন্তু দেখ বাপু, যেন কম্বল ভারি কর না, অর্থাৎ কি না, মাস মাস ঠিক মত ঐ ক'টা টাকা দিয়ে দিও। আমি আবার কথার খেলাপ পচ্ছন্দ করিনে।

নরেন তখন আনন্দে উল্লাসে উৎসাহের আতিশয্যে হরপ্রসাদ বাবুর পদধূলি নিয়ে মাথায় দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: আপনি আমার স্থিতির উপলক্ষ হলেন দাদামশাই! আপনি দয়া করে যা দিতে বললেন, ও কিছুই নয়! আমি এর জন্য চিরঋণী হয়ে থাকব, আর ঠিক মত ঐ টাকা দিয়ে যাব।

॥ চৌদ্দ ॥

হরপ্রসাদ ভেবেছিলেন, কর্মশালা হতে অবসর নিয়ে কলকাতায় এসে নূতন বাসস্থানটিকে ধর্মশালা করে তুলবেন। সহধর্মিণী অনুপমা অবসরকাল ধর্মপুস্তক পড়েই অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত, তিনিও পত্নীর আদর্শ গ্রহণ করবেন। কিন্তু সারা জীবনের সংস্কার এখানেও তাঁকে আর্থিক ব্যাপারে নিষ্কৃতি দিল না। বাড়ীর খালি ব্লকটির দিকে নজর পড়লেই মাসিক দেড় শত টাকা আয়ের ঘরের শূন্যটি বৃহত্তর হয়ে তাঁর মনটিকেও যেন শূন্যময় করে দেয়। ধর্মপুস্তক খুললেই মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে জনশূন্য ব্লকটি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আবার এখানকার বাড়ী ভাড়ার আয়ের মোহ অতীতের অপ্রীতিকর একটা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর অন্তরটিকে রীতিমত বিষাক্ত করে তুলছে। দুর্দিন ও দুর্বার শোকের সুযোগ নিয়ে ডাক্তার অধিকারী তাঁর এলাহাবাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ী এবং সেই সংগে অনেকগুলি টাকা হস্তগত করে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন! বোম্বায়ের কর্মক্ষেত্রে নানা ভাবে বিব্রত এবং লিপ্ত থাকায় তিনি যেন এলাহাবাদের দিকে মনঃসংযোগ করবার অবসর পাননি, কিন্তু ডাক্তার অধিকারীর ত' কর্তব্য ছিল মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বা তাঁর কাজের

রিপোর্ট দেওয়া। বালিগঞ্জের বাড়ীর তুলনায় এলাহাবাদের বাড়ী অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েও সেখান হতে এ পর্যন্ত কিছুই উসুল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং নির্দিষ্ট দীর্ঘকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর করবারও কিছুই নেই। যথাস্থানে সংবাদ নিয়ে তিনি জ্ঞাত হয়েছেন যে, ডাক্তার অধিকারী বাড়ীর ট্যাক্স ফেলে রেখে সর্তভঙ্গ করেননি। সুতরাং সর্তানুসারে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বে কোন সূত্রেই এলাহাবাদের সম্পত্তি ডাক্তার অধিকারীর কবলমুক্ত করবার কোন সম্ভবনাই নেই। নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাঁকে প্রতীক্ষা করতেই হবে। এখন সে চিন্তাটিও তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। ডাক্তার অধিকারীকে য়্যাটর্নীর দ্বারা সর্ত সম্বন্ধে অবহিত করার নির্দেশ দিয়ে তিনি কাজ আগিয়ে রেখেছেন,—এখন কয়টা মাস পূর্ণ হলেই হয়।

এর উপর একদা সাধ করে যে কাজল তিনি চোখে লাগিয়েছিলেন, এখন তাহাও যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। আত্মীয়-স্বজনহীন অসহায় নরেন ছেলেটি তাঁর চক্ষুর উপর নিরাশ্রয় হচ্ছে দেখে তিনি নিজেই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাজার হালে সুসজ্জিত ঘরে সে বাস করছে, ষ্টুডিও সাজিয়ে ছবি আঁকছে, দু'বেলার পরিপাটি আহার এবং সুনির্দিষ্ট জলখাবার গৃহস্বামী যুগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এ সুবিধাগুলির বিনিময়ে প্রতি মাসের প্রথমেই যে ত্রিশ টাকা নিয়মিতরূপে তার দাখিল করবার কথা, যা সে নিজেই স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছে—তিনটি মাস ঠিকমত দিয়েই চতুর্থ মাস হতে বাকি ফেলতে আরম্ভ করেছে। মাসের প্রথমে খরচের ঐ টাকা দেওয়া ত' দূরের কথা, মাস শেষ হয়ে গেলেও দেয় টাকাগুলি কোন মাসেই দাখিল করতে পারে না, এবং যাহা দেয় তাও কয়েক দফায়। ফলে গৃহস্বামীর নিকট দেনা তার ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে। তিনি হচ্ছেন কথার মানুষ, জীবনে কখনও কথার নড়-চড় করেননি এবং কেহ করলে সহ্য করতেও পারেন না।

প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনা যায়—যে লোক মুখের কথা রাখতে পারে না, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, মুখের কথাই হচ্ছে

মানুষের প্রকৃতির কষ্টিপাথর, তাতেই তার ভিতরকার সমস্ত খবর ধরা পড়ে যায়। এই জন্যই ঋষিরা বলেছেন—শব্দ ব্রহ্ম। সুতরাং মাস কয়েকের মধ্যেই দেনা-পাওনার ব্যাপারে কথা রাখতে না পারায় বেচারী নরেনকে এক-কথার মানুষ হরপ্রসাদের নিকট হেয় হতে হচ্ছে।

হঠাৎ হরপ্রসাদের ডাক পড়ল সুদূর বোম্বাই সহরে। সেখানে তাঁর ফলাও কারবার। কর্মচারীদের উপর কারবার চালনার ভার ন্যস্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। কর্মচারীরা সহসা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন, বিশেষ প্রয়োজনে মাস কয়েক তাঁদিগকে বোম্বাই বাস করতেই হবে। বালিগঞ্জের বাড়ী ভাড়া দিয়ে, তাঁরা যাতে সত্বর রওনা হয়ে পড়েন, তজ্জন্য কর্মচারীদের পীড়াপীড়ি ও প্রার্থনার অন্ত ছিল না।

বাড়ীতে ভাড়াটিয়া বসিয়ে বাড়ীর কর্তার সস্ত্রীক বোম্বাই রওনা হবার জন্য সাড়া পড়ে গেল। নরেন বুঝল, এখান হতে অন্ন তার উঠেছে, আবার মেসে গিয়ে আস্তানা পাততে হবে, 'পুনর্মূষিকো ভব' অবস্থা এখন তার, কিন্তু এখানকার দেনা সে কি করে শোধ করবে, ইহাই এখন কঠিন সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধান করতে কর্তা নিজেই তার ছোট ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করলেন। নরেন কর্তাকে দেখে হাতের কাজ ফেলে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। কর্তা কোনরূপ ভূমিকা না করেই সোজাসুজি বললেন: আমাদের যাবার দিন ত' এগিয়ে এল নরু! এখন তোমার ব্যবস্থাটা ত' সেরে ফেলা দরকার। কম্বলখানা ভিজিয়ে তুমি কি রকম ভারি করে ফেলেছ, তা ত' দেখতেই পাচ্ছ! এখন কি করতে চাও?

মুখখানি নত করে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে নরেন বলল: দিতে হবে বই কি, দাদামশায়! কিন্তু উপস্থিত ত' কিছুই করে উঠতে পারছি না, হঠাৎ যে আপনারা যাবেন, তাও ভাবিনি, দিন কতক সময় পেলে—

—দশ বছর সময় পেলেও তুমি কিছুই করে উঠতে পারবে না

নরু, আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি; তোমার আয়েরও ঠিক নেই, কথারও ঠিক নেই।

—আপনি এত দিনে রোগ ঠিক ধরেছেন, দাদামশায়। এখন আপনিই বলুন ত' কি করি? কি উপায়ে আপনার দেনা শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়—উপস্থিত অবস্থায়?

—উপায় আমি স্থির করেছি, শোনো। আমি বেশ বুঝেছি, টাকা তুমি দিতে পারবে না; অথচ আমি আমার টাকাগুলো ছাড়তেও পারি না। তুমি যদি এক কাজ কর, তোমার দেনাও শোধ হয়ে যায়, আর এ বাড়ীতে তোমার থাকাও চলে।

নরেন স্তব্ধবিস্ময়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাল।—কি উপায় তিনি দেখাতে চান। তার মুখ দিয়ে কথা আর ফুটে বের হল না।

গৃহস্বামী ঘরখানির চারদিকে তরুণ শিল্পীর হাতের সমাপ্ত অসমাপ্ত বিভিন্ন চিত্রপটগুলির উপর দৃষ্টি সঞ্চারিত করে সহসা প্রশ্ন করলেন: খুব পুরানো ছোট ফটো দেখে তুমি অয়েল পেইন্টিং করতে পার?

সোল্লাসে নরেন উত্তর দিল: নিশ্চয়ই, এই ত' আমার কাজ, দাদামশায়।

—তা হলে তুমি এ কাজই কর। একখানা পুরানো ফটো আমি তোমাকে দেব, তাই দেখে ফুলসাইজ অয়েল পেইন্টিং তোমাকে করে দিতে হবে। পারবে ত'?

সোল্লাসে সম্মতি জানিয়ে নরেন বলল: আজ্ঞে পারব।

হরপ্রসাদ বললেন: ফটোখানার যায়গায় যায়গায় একটু আধটু ফেট হয় ত' হয়ে থাকবে। তা তাতে এমন কি এসে যাবে আর! তোমাদের ত' রঙ গুলে তুলি চালানো কাজ, দেবে ঠিক্‌ঠাক চালিয়ে।

তারপর একটু থেমে বললেন: তোমার মজুরী সম্বন্ধে কি করা যায়? ঘরের ছেলে হচ্ছ তুমি, আর এও ত' তোমার ঘরের কাজই হে! পয়সা-কড়ির কথা এখানে উঠতেই পারে না, তবে কি না—তোমাকে হয় ত' রং কিনতে হবে, কিছু খরচ-পত্তরও হতে পারে, তা ছাড়া, খাটতেও ত' হবে

দিন কতক। তা দেখ, এই বাবদে আমি তোমার দেনাটা বেবাক রেহাই করে দিচ্ছি। ওর দরুণ একটি পয়সাও আর তোমার কাছে চাইব না। তা ছাড়া তুমি যেমন আছ, তেমনই থাকবে, এর জন্যে তোমাকে ভাড়াটাড়াও কিছু দিতে হবে না। একটা ইক্ মিক্ কুকার কিনে নিয়ো, কষ্ট বা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। কিন্তু বাপু, ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, কাজটি আমার শেষ করে ফেলেছ,—টাকার মত যেন না হয়।

নরেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গৃহস্বামীর পদধূলি নিয়ে মাথায় দিয়ে বলল : আজ আমার মাথার ওপর থেকে মস্ত একটা দুশ্চিন্তা নেমে গেল, দাদামশায়। আমাকে আপনি বাঁচালেন।

কিন্তু অবস্থা যার অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ, তার পক্ষে একখানা অয়েল পেইন্টিং বিনা পুঁজিতে দেনার দায়ে সম্পন্ন করে দিয়ে দিন গুজরাণ করা কতটা সম্ভবপর, এ চিন্তাটুকু কারও চিত্তে সংশয় তুলবার অবসর পেল না!

॥ পনের ॥

বিচক্ষণ হরপ্রসাদবাবু বাড়ীখানি এমন কায়দায় তৈরী করেছিলেন যে, মধ্যাংশের বড় অংশটি নিজ ব্যবহারে রেখেও, দু'পাশের অপেক্ষাকৃত দুটি ক্ষুদ্র অংশ স্বতন্ত্রভাবে অনায়াসে ভাড়া দেওয়া যায়। তাঁর অধিকৃত মধ্যাংশের নীচের তলার দালানটার দু' দিকের দুটি দরজা খোলা থাকলে সমস্ত বাড়ীখানাই এক হয়ে যেত, আবার ঐ দুটি দ্বার বন্ধ করে দিলে—বাড়ীর তিনটি অংশই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ত। হয়েছিলও তাই। তাঁর শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের এক আত্মীয় পশ্চাতের অংশ কায়েমীভাবেই ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়ীর কর্তা নবগোপাল রায় এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। তাঁকে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। বাড়ীতে তিনি খুব কম সময়ই থাকতেন। প্রবীণ আত্মীয়—হরপ্রসাদ

ঘোষের বাড়ীতে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েই বাইরে বাইরে ঘুরতেন। বাড়ীতে থাকতেন তাঁর স্ত্রী শান্তমণি ও কন্যা মালতী। স্ত্রী ও কন্যার খরচের জন্যে মাসে মাসে যে পরিমাণ টাকা তিনি দিয়ে যেতেন বা কর্মস্থান থেকে পাঠাতেন, তাতে তাদের কোনও অভাব অসুবিধে হবার কথা নয়,—কিন্তু মা ও মেয়ে উভয়েই সহরের আপাত-মধুর সভ্যতার মোহে পড়ে অবস্থার অতীত ব্যয়বাহুল্যে এরূপ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, মাসিক নির্দিষ্ট টাকায় কিছুতেই তাঁরা ব্যয়সঙ্কুলান করতে পারতেন না। মানুষ যতক্ষণ নিজের অবস্থার উপর নির্ভর করে তুষ্ট থাকে, অভাব ততক্ষণ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারে না,—কিন্তু নিজের অবস্থার উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে, অন্যের আড়ম্বর দেখে যখন সে তার অনুকরণে ব্যগ্র হয়ে উঠে, অভাবও অমনি উপযুক্ত অবসর পেয়ে তাকে ভয়াবহ 'অক্টোপাসে'র মত অসংখ্যপদে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে ফেলে।

নিত্য নিয়মিতরূপে সিনেমায় যাওয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের তড়াগ-তটে বসে হাওয়া খাওয়া, প্রতিবেশীদের সচকিত করে ট্যাক্সি চড়ে ফেরা এবং সোফারের সশ্রদ্ধ সেলামটুকু উপভোগ করবার মোহে ভাড়ার ভগ্নাংশে দৃক্‌পাত না করে পূরো টাকা বা নোট ফেলে দিয়েই সদর্পে চলে যাওয়া—এক শ্রেণীর মেয়েদের ইদানীং ফ্যাসান হয়ে পড়েছে। অথচ তাদের সংসারের রোজনামচার অনুসন্ধান করলে সহজেই জানতে পারা যায় যে, সেখানে অভাবের অন্ত নেই। বাড়ীর কর্তার তরফ থেকে যথাসময়ে নির্ধারিত টাকা আসা সত্ত্বেও, বাড়ীর ঝি সময়মত তার বেতন পায় না; গয়লা, মুদি, কয়লাওয়ালা—পুরা পাওনা নিয়ে কেহই কোন মাসে হাসিমুখে ফেরে না; ধোপা দু'বেলা অথচ নগদ দক্ষিণায় 'ডাইং ক্লিনিং' হতে তিনগুণ মজুরী বেশী দিয়ে ধৌত কাপড় পরতে তাদের বিবেকে কিছুমাত্র আঘাত লাগে না!

শান্তমণি ও মালতীর প্রকৃতি এই উচ্ছৃঙ্খল সভ্যতার আলোক-সম্পাতে পূরাপূরিভাবেই [illegible]। হিসেবী দাদামশায়

এজন্য সদাসর্বদাই খিট্‌-খিট্‌ করতেন, বুঝাবার প্রয়াস পেতেন, কিন্তু মা ও মেয়ে তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। মা বলতেনঃ লজ্জা-সঙ্কোচের যুগ চলে গেছে, এখন মেয়েদেরও পুরুষদের সংগে সমান তালে পা ফেলে চলবার যুগ এসেছে।

মেয়ে মালতীর মত হচ্ছেঃ লজ্জা, সঙ্কোচ, জড়তা এগুলো অত্যাচারের বাহন। ও-সব এখন অচল হয়ে গেছে। 'আপ-টু-ডেট' না হলে আমাদের আর নিস্তার নেই।

নরেন ছেলেটি নির্বাক্ বিস্ময়ে মা ও মেয়ের কথা শুনত। তাদের কুণ্ঠাশূন্য সপ্রতিভ ভাব, যখন তখন তাদের সাজসজ্জার বাহার ও প্রসাধন-পারিপাট্যের অভিনবত্ব তার সাদাসিধা নির্মল অন্তরে বিস্ময়ের হিল্লোল তুলত।

মালতীর বয়স যদিও আঠারো পার হয় নাই, কিন্তু তাকে দেখলে আরও অধিক বয়স্কা বলে ভ্রম হয়। দেহের রংটুকু তার যতখানি ফর্সা, তাতে লাবণ্যের অভাবও ঠিক ততখানি! এ অভাবটুকু সদাসর্বদাই তাকে প্রসাধনের সহায়তায় পূরণ করে নিতে হয়। দেহযষ্টি যে অনুপাতে ঢ্যাঙ্গা, দেহের বাঁধুনিও সে অনুপাতে অনেকখানি যেন আলগা; মুখের ছাঁদটুকু কিন্তু তার চমৎকার। আকৃতিগত চটকের উপর প্রকৃতিগত চাঞ্চল্য ও চটুলতার সমাবেশে মালতীর মুখখানি যেন রূপের আর সব ত্রুটি ঢেকে একাই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, সুতরাং অঙ্গে লাবণ্যের অভাবই থাকুক, আর গঠনগত যত খুঁতই হউক, শুধু এই সপ্রতিভ মুখখানির চটকে মালতীর স্থান সকলের আগে, আদর তার সর্বত্র। রূপমুগ্ধের দল তার দিকেই সর্বাগ্রে ঝুঁকে পড়ে। এর জন্যে মালতীর অন্তর অহঙ্কারে সর্বদাই স্ফীত।

মালতী বেথুনে পড়েছে। বিভিন্ন পার্টিতে মিশে তাদের দোষগুলি অনুকরণ করছে পূর্ণমাত্রায়, গুণগুলি বর্জন করেছে অতি সন্তর্পণে।

বেথুনে পড়ে পাশ করে যারা আদর্শ জায়া ও জননী হয়ে নারী সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, মালতী কোনও দিনই তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় নাই। শিক্ষা ত' তার লক্ষ্য নয়! বই নিয়ে সে কলেজে চলেছে দশজনে দেখবে, দেখে বাহবা দেবে—ইহাই এই কিছু সুযোগ-সুবিধা নেয়া সম্ভব তার পক্ষ হতে তার কোন অসদ্ভাবই হয়নি। চক্ষু তার বরাবরই ভাল, রোগের কোনও চিহ্নই তাতে পড়ে নাই,—কিন্তু তথাপি তার দু' চোখের উপর চশমা উঠেছে এবং এজন্য পিতাকে দক্ষিণা দিতে হয়েছে এক গাদা টাকা। বড়লোকের মেয়েদের সংগে সমান তালে পা ফেলে সে চলে, তাদের অনুরূপ বেশভূষা, সাজসজ্জা তার চাই-ই! কিন্তু সেনেট হলে ঢুকে হোঁচট খেয়ে পড়বার সৌভাগ্যটুকুও তার অদৃষ্টে ঘটে ওঠেনি। অগত্যা বেথুন হতে নাম কাটিয়ে অন্য পথে নাম জাহির করাই এখন তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ কার্যে সহায়ক হয়েছেন তার মাতাঠাকুরাণী শান্তমণি স্বয়ং।

নরেনের সুন্দর চেহারা ও তার বৃত্তি মালতীর মনে প্রথম প্রথম একটু হিল্লোল তুললেও, অর্থ-কৃচ্ছ তাই তাতে অন্তরায় উপস্থিত করে। নরেনের ঘরে ঢুকে মালতী প্রায়ই তার ছবি দেখে, ছবি আঁকা সম্বন্ধে দু' একটি কথাও জিজ্ঞেস করে। নরেন যদিও প্রথম প্রথম একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ত, স্তব্ধ জিহ্বা তার উত্তর যোগাতে পারত না। কিন্তু ক্রমেই তার সে ভাব কেটে যায়,—মালতীর সংগে কথা বলতে তার আর বাধে না। কিন্তু শান্তমণির ইচ্ছা নয় যে তার রূপসী কন্যা যার-তার সংগে মেলামেশা করে, কথাবার্তা কয়। কন্যা বাড়ী গেলে, মা নাসিকা-কুঞ্চিত করে মন্তব্য প্রকাশ করে,—ঐ হতচ্ছাড়াটার ঘরে গিয়ে ওর সংগে কথা কইতে তোর লজ্জা করে না, মালা?

মালতীর নাম সংক্ষিপ্ত করে মা তাকে মালা বলে ডাকে। মায়ের কথা শুনে মেয়ে উত্তর দিত—তোমারই বা ওর ওপর এত রাগ কেন মা? দুটো কথা কয়েছি, তাতে হয়েছে কি? ও দিব্যি ছবি আঁকে, তাই দেখি।

—ছাই আঁকে! তবু যদি পয়সা আনবার মুরদ থাকত! পরের বাড়ীতে পড়ে পড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে ছুটি বেলা কাঁড়ি গিলছে, একটি পয়সাও দেবার নাম নেই, ও আবার মানুষ? দূর্ দূর্!

অমানুষের কথায় মেয়ের মনটিও বিষিয়ে উঠল। অর্থহীনের প্রতি মালতীরও মর্মান্তিক বিরাগ। কিছুদিন সে নরেনের ঘরের দিকে ফিরেও তাকাল না। নরেনের মন উসখুস করতে লাগল। ঘরের বাইরে কোন পরিচিত পদশব্দ শুনবার জন্য তার কাণ ছু'টি পড়ে থাকত। এমনই যখন অবস্থা, তখন দাদামশায়ের বোম্বাই যাত্রার ব্যবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হল।

বোম্বাই যাত্রার দিন প্রত্যূষে দাদামশায় নরেনকে ডেকে বললেন: ও পাশের ব্লকটাও ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি নরু। ওবেলাতেই তারা জিনিষ-পত্তর নিয়ে আসবে। আর আমাদের ব্লকের ঘরগুলোই বা মিছি-মিছি পড়ে থাকে কেন? দোতলাটা ভাড়া দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভাড়াটে আজ পর্যন্ত যোগাড় করতে পারিনি। অগত্যা ছু'খানা ঘরে জিনিষ-পত্তর বন্ধ করে চাবি দিয়ে যাচ্ছি, বাকি ঘরগুলো রইল তোমার জিম্বায়। ঘর পিছু দশটি করে টাকা, আর ছু'মাসের আগাম ভাড়া যদি কেউ দিতে রাজি হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে লিখবে।

অপরাহ্লের দিকে অপর ব্লকের নূতন ভাড়াটে এসে উপস্থিত হল। মটরের হর্ণের সংগে চারদিকে হাঁক-ডাক পড়ে গেল। সাহেবী পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি ছড়ি হস্তে মোটর হতে নামল। বয়স আন্দাজ বত্রিশ, চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়; বেশ ফিটফাট ও হৃষ্টপুষ্ট আকৃতি; বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাইরে নানা স্থানে তার কার্ণিভাল চলছে। যেমন দেদার উপায় করেন, তেমনি ছু' হাতে খরচ করেন।

হরপ্রসাদ নরেনকে নবাগত ভাড়াটের সহিত পরিচয় করিয়ে দিলেন। করমর্দনে নরেনকে আপ্যায়িত করে সরকার সাহেব তার ব্লকে প্রবেশ করল। সংগের লোকজনরা মালপত্র লয়ে পড়ল।

শান্তমণি মন্তব্য প্রকাশ করলেন—দিব্যি মানুষটি, দেখলেই শ্রদ্ধা

হয়। আসতে না আসতেই পাড়া গুলজার, যেন কোথাকার কে রাজা এল! এই ত' চাই।

হরপ্রসাদ হেসে বললেন,—নিশ্চয়ই, সাহেব সেজে এসেছে, হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, সংগে দু' তিনখানা মটর, এত লোকজন,—শ্রদ্ধা ত' হবারই কথা।

নূতন ভাড়াটেকে বাসায় স্থিতি করে—সায়াহ্নে হরপ্রসাদবাবু সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করলেন।

॥ ষোল ॥

সহরের এক খ্যাতনামা অধ্যাপক নরেনকে কিছু কাজ দিয়েছিলেন। গৃহস্বামীকে ট্রেণে তুলে দিয়ে নরেন সেগুলি নিয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। প্রণষ্টপ্রায় ফটোচিত্র হতে কয়েকখানি পরিপূর্ণ চিত্র তাকে নিজের পরিকল্পনায় আদর্শ বজায় রেখে সম্পূর্ণ করতে দিয়েছিলেন। চিত্রগুলি দেখে অধ্যাপক মহাশয় চমৎকৃত! তাঁর মৃত পিতা, মাতা ও ভগিনীর তিনখানি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিত্র এমনভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, তার যথাযথ আলেখ্য পাবার আশা তিনি পরিত্যাগই করেছিলেন। কতিপয় নামজাদা ষ্টুডিও এ কাজ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়নি। এক বন্ধুর অনুরোধে অনিচ্ছা সত্বে তিনি নরেনের হাতে প্রণষ্টপ্রায় ফটো তিনখানি সমর্পণ করেছিলেন। তখন কল্পনাও করেননি যে, এই অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পী এত শীঘ্র এমন নিখুঁতভাবে তাঁর কাজ সম্পন্ন করে দিবে! নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনকে ফিরে পেলে মনে যেরূপ উল্লাস উপস্থিত হয়, অধ্যাপক সেরূপ উল্লাসের সহিত নরেনের সম্বর্দ্ধনা করলেন। প্রশংসা আর তাঁর মুখে ধরে না।

অনেক বড়লোকের কাজ সে করেছে, বড় বড় কলেজের সম্পর্কে

তাকে যেতে হয়েছে; সর্বত্রই সে মনোনিবেশ সহকারে কাজ করে যায়, ইহাই তার চরিত্রের বিশেষত্ব। কিন্তু কাজ পেয়ে এভাবে তার সম্মুখে কেহ কোন দিন এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেনি। এমন উচ্চ সুখ্যাতিও সে কারও মুখে শুনবার অবকাশ কোন দিন পায়নি। আজ সেও চমৎকৃত হয়ে অধ্যাপকের দিকে চেয়ে রইল।

শুধু মুখের প্রশংসাও নয়,—অধ্যাপক মহাশয় যখন দশ টাকার দশখানি নোট তার হাতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে গুঁজে দিলেন, তখন নরেনের বিস্ময় একেবারে যেন ছাপিয়ে উঠল। একশো টাকা! সে যে বিশ টাকার বেশী প্রত্যাশা করে নাই; তাও যে আজই পাবে সে সম্বন্ধেও তার গভীর সংশয় ছিল। অভিভূতের মত সে বলল—এ কি স্যর! দশখানা নোট যে, সবই দশ টাকার!

নরেনের বিস্ময়-মিশ্রিত মুখখানির দিকে চেয়ে অধ্যাপক উত্তর দিলেন—এর বেশী আমার কাছে আজ নেই, থাকলে সবটাই দিতাম। আসছে মাসের ১লা তারিখে এই সময় এস। বাকিটা দেব।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! নরেন গাঢ়স্বরে বলল—আপনি তা হলে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি, স্যর! আমি বলছি, আপনি আমাকে অনেক বেশী দিয়েছেন। আমি ত' এত টাকা পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাজে হাত দিইনি।

বদ্ধদৃষ্টিতে অধ্যাপক নরেনের দিকে চেয়ে বললেন—তার কারণ, তুমি তোমার প্রতিভা ওজন করবার সুযোগ এখনো পাওনি। আমি বুঝতে পেরেছি,—আর্টকে তুমি সাধনা বলেই বরণ করেছ, অর্থ দিয়ে তার যাচাই করতে শেখনি। কিন্তু এ ঠিক নয়! এতে চলার পথে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। আমি তোমাকে একশো টাকা মাত্র দিয়েছি যে কাজের বিনিময়ে,—তুমি বলছ, বেশী দিয়েছি। জান, পাঁচটা বড় বড় ষ্টুডিও এ কাজ নিতে ভরসা করেনি! আর যদি তাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করত, কত বিল করত বলতে পার? সাড়ে চারশোর কম নয়! আমি তোমাকে একশো দিয়েছি, পয়লা তারিখে

মাইনে পেলে আরও একশো দেব। নিজেকে সস্তা কর না, নিজের ওজন বুঝে দর দিয়ো, নইলে বড় হতে পারবে না কোন দিন। হ্যাঁ, ভাল কথা, এক দল সাহেব গ্রাণ্ড হোটেলে পিকচার একজিবিসন খুলছে জান ত?

নরেন বলল,—ও সব বড় ব্যাপার, আমাদের জেনে ত' কোন লাভ নেই, স্যর।

—লাভ নেই কি হে! লাভ হয় ত' এ পথেই। আমি একখানা প্যামপ্লেট ওদের পেয়েছি, তুমি নিয়ে যাও; ওতে সব লেখা আছে। তুমি একখানা ছবি দেবার চেষ্টা কর। আমি তোমার প্রতিভার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার বিশ্বাস, তোমার ছবি একটা 'প্লেস' পাবেই! আমেরিকা থেকে বাছা বাছা দেড়শো ধনকুবের আসছে কলকাতায় টুর করতে। তাদের জন্যই এই একজিবিসন। এ দেশের ভাল ভাল ছবি, নামী হীরে-জহরতের দরে কেনা এদের একটা মস্ত নেশা। আমি জানি, কোনও বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব আছে, এমন কোনও কোনও ছবির দর পঁচিশ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত উঠেছে। কখন কোন্ দিক দিয়ে অদৃষ্ট ফেরে, কে বলতে পারে? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ছবি তৈরী হলে, বরং আমার কাছে এনো, আমি সেখানে পাঠাবার সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেব।

প্যামপ্লেটখানা হাতে করে, সেই মহানুভব অধ্যাপককে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে নরেন বিদায় নিল। কাজ করে কাজের এমন উচ্চ পারিশ্রমিক এ পর্যন্ত সে পায়নি; ইহা তার পক্ষে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আকাঙ্ক্ষার অতীত। পনের দিন কঠোর পরিশ্রম করে সমাপ্ত কাজের জন্য যেখানে সে দশটি টাকা পাবার প্রত্যাশা করেছে, কাজে নানাবিধ ত্রুটি দেখিয়ে কর্মকর্তা সেখানে হয় ত' সাত টাকায় রফা করেছেন, তাও আবার এক দফায় নয়,—অন্ততঃ সাত দিন হেঁটে সাতটি টাকা আদায় নিতে হয়েছে। আবার এমন অনেক হৃদয়বানও আছেন, বার বার হাঁটিয়ে চুক্তির অর্ধেকটা দিয়ে

বাকিটা দেবার আর লক্ষণ প্রকাশ করেন না। কত স্থানে এমন কত টাকাই তার মারা গেছে। কাজ করে টাকার জন্য প্রার্থী হওয়াটাই যেন তার পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়। অথচ তার অভাবের অন্ত নেই। এক সংগে এতগুলি টাকা হাতে পেয়ে, সে ব্যাকুল হয়ে উঠল, কি ভাবে টাকাগুলি খরচ করবে, কি কিনবে, সহরের কোন্ কোন্ বস্তুগুলি তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও একেবারে অপরিহার্য।

দাদামশায়ের দেওয়া ছবিগুলির কাজ আরম্ভ করবার জন্য ধর্মতলা হতে রং ও ক্যাম্বিশ-লাগান ফ্রেম পঁচিশ টাকা খরচ করে প্রথমেই সে কিনে ফেলল। তার পর কলেজ ষ্ট্রীট হতে কুকার কেনা হল। সেই সংগে একটা ষ্টোভও বাদ পড়ল না। এনামেল ও এলুমিনিয়মের কয়েকখানা তৈজসপত্রও সে কিনল। তখনও পকেটে সাতখানি নোট ও খুচরা কয়েকটি টাকা রয়েছে, সুতরাং কলেজ ষ্ট্রীট হতে লেক রোডে ট্যাক্সীযোগে পাড়ি দিয়ে উপার্জিত অর্থের সার্থকতা সম্পাদনে তার পক্ষে কোনও ত্রুটি রইল না।

॥ সতের ॥

দোতলার একখানি ঘরে হরপ্রসাদের দেয়া ছবিখানি নিয়ে নরেন তার প্রসাধনে ব্রতী হয়েছে। সে ছবিখানি পাঁচ ছ' বছরের এক অপূর্ণ বালিকার। যদিও তা মলিন ও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তথাপি ছবির মেয়েটির মুখখানি কি চমৎকার! তাকে যেন পরিপূর্ণরূপে উজ্জ্বল করে রেখেছে তার আকর্ণ-বিস্তৃত অপূর্ব সুন্দর দু'টি চোখ। বালিকার এই অপরূপ আলেখ্যটি তরুণ শিল্পীকে শুধু আকৃষ্ট নয়, অভিভূতও করেছে। অনেক চিত্রের উপর সে তুলিকা চালিয়েছে, বহু আয়তনেত্রের আলেখ্য তার চোখে পড়েছে, কিন্তু এমন অপূর্ব দু'টি চোখ বুঝি সে কোথাও দেখেনি! ছবিখানি তাড়াতাড়ি শেষ করবার

জন্য সে ঠিক সম্মুখেই বিশেষভাবে রেখে দিল, সংগে সংগে ইজেল-এ ক্যানভাস লাগিয়ে ব্যাকগ্রাউঁণ্ডে রং ফলাতে মনোনিবেশ করল।

ঘরের বাইরে দালানটির এক পার্শ্বে নরেন কুকার চড়িয়েছে। তার শিল্পী-জীবনে স্বহস্তে রন্ধন এই প্রথম। রন্ধন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পড়ে সে যথাযথ ভাবে রন্ধনের আয়োজন করেছে। ভাত, ডাল, ডিম ও তরকারী—চারটি বাটি ভরে সিদ্ধ হচ্ছিল।

ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড শেষ করে নরেন মেয়েটির অপূর্ব মুখখানির কিয়দংশ এঁকেছে, এমন সময় দমকা হাওয়ার মত রুদ্ধ দরজাটি সশব্দে ঠেলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল—মালা। নিচের দালানে মালাদের ব্লকের দিকের দরজাটি সম্ভবতঃ সে ইচ্ছা করেই বন্ধ করেনি।

চমকিত নরেনকে কথা বলবার অবসরটুকুও না দিয়ে মালা কলকণ্ঠে বলল : বাঃ! আপনি ত' বেশ লোক মশাই! বুড়ো যেতে না যেতেই তার দোতালার ঘরখানি দখল করে তোড়-জোড় করে বসেছেন!

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে নরেন বলল : না, না, তা কেন? এ-সব তাঁর তোড়-জোড় যে! তিনি অয়েল-পেন্টিংখানির বরাত দিয়ে গেছেন, আপনিও ত' শুনেছেন সে কথা। এই ঘরে বসে এ ছবির কাজ করবার নির্দেশও তিনি দিয়ে গেছেন।

নাসিকা কুঞ্চিত ও সুন্দর মুখখানি বিকৃত করে মালা বলল : আহা—কি বিউটি!

মালার কথায় ব্যথা পেয়ে নরেন বলল : ছবিখানি ফেন্ট হয়ে গেছে, তাই 'বিউটি' বুঝতে পারেননি। কিন্তু যাঁর ছবি, তাঁর ওপর কটাক্ষ করলে অবিচার করা হয়। এমন মুখ, এমন চোখ, এমন আশ্চর্য ভুরু—হাজারের মধ্যে একজনেরও থাকে কি না সন্দেহ।

মুখখানা মচকায়ে মালা বলল : তাহলেও মরা ঘোড়াকে দানা খাইয়ে কি লাভ বলুন ত'?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন মালার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল : কার কথা বলছেন?

মালা শ্লেষের সুরে বলল : যার রূপসজ্জায় উঠে পড়ে লেগেছেন? বুড়োর মেয়ে,—আপনি হয়ত ভাবছেন ছেলেবেলার ছবি, এখন তিনি পূর্ণ যুবতী ; ছবি তুলে বাহবা নেবেন,—কিন্তু সে গুড়ে বালি!

নরেনের কোমল চিত্তটি ব্যথায় ভরে গেল। গাঢ় স্বরে বলল : আমি কিছু-কিছু শুনেছি।

মুখে দুষ্টুমির হাসি টেনে মালা বলল : আমি তাহলে রোগ ঠিকই ধরেছিলুম বলুন?

আর্তস্বরে নরেন বলল : আপনি আমাকে অনর্থক আঘাত দিচ্ছেন, রহস্যেরও বোধ হয় একটা সীমা আছে।

মালা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল : নিশ্চয়ই ; রহস্যের যেমন সীমা আছে, রহস্যের পাত্রও তেমনি বিচার-সাপেক্ষ। আপনি হচ্ছেন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট, আপনার সঙ্গে রহস্য করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু বলুন!

মালতীর কটাক্ষে নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে নরেন বলল : দেখুন, আমি অতি নগণ্য চিত্র-শিল্পী, রং-তুলি নিয়ে আমার কারবার,—কথা-শিল্পী আমি নই যে, গুছিয়ে কথা বলব। আমার কথায় যদি দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।

মালতী তৎক্ষণাৎ ভাব পরিবর্তন করে বলল : ক্ষেপেছেন আপনি! ঠাট্টা বোঝেন না? আমি এ বাড়ীতে এসে অবধি দেখছি, বরাবর আপনার উপর একতরফা ডিক্রী হচ্ছে, আর আপনি পড়ে-পড়ে সহে যাচ্ছেন! তাই ইচ্ছে হল, দেখি আপনাকে খোঁচা দিয়ে রাগিয়ে তোলা সম্ভব কি না!

নরেন প্রশ্ন করল : কি দেখলেন?

মালা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল : একেবারে হোপলেশ। বুঝলুম, একতরফা ডিক্রী-জারীর যোগ্য পাত্রই আপনি ; পড়ে পড়ে শুধু মার খাবেন বলেই দুনিয়াতে আপনি জন্মেছেন।

আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নরেন হাতের তুলিটি প্যালেটের

গর্ভে গুঁজে নূতন একটি তুলি টেনে নিল। মালা বক্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: কি হবে এখন,—যে নেই—তারই রূপসজ্জা?

দৃঢ় স্বরে নরেন বলল: হাঁ, আমার সমস্ত শক্তি ও সাধনা দিয়ে আমি এই মেয়েটির এমন একখানি ছবি আঁকব, যাতে আমার শিক্ষা হবে সার্থক, আর গৃহস্বামী ফিরে এসে এই ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখবেন—তাঁর কন্যাটি যেন জীবন্ত হয়ে প্রতীক্ষা করছেন এখানে।

চাপা নিশ্বাসের সংগে বিষাদের সুরে মালতী বলল: তাহলে দেখছি আমার কোন আশা নেই এ ক্ষেত্রে?

অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু তুলে নরেন মালতীর দিকে তাকাতেই সে অভিনয়-ভঙ্গিতে বলল: আমার কথাটা তাহলে সহজ করেই বলি শুনুন! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, হাতের সব কাজ ফেলে আপনি সর্বাগ্রে আমার একখানি ছবি আঁকেন। এই প্রস্তাব নিয়ে আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। কিন্তু আপনি ত' এখন মৃত অশ্বকে দানা খাওয়াতে ব্যস্ত!

মালতীর কথায় নরেন যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল: হাতের তুলিটি প্যালেটের মধ্যে রেখে বিস্ময় ও কৌতূহল-বিজড়িত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল: ছবি আঁকাতে চান আমাকে দিয়ে? আপনার? নিজের?

—এটা বুঝি খুবই ধৃষ্টতার কথা আমার পক্ষে?

—আপনার পক্ষে নয়! আমার পক্ষে; শুধু ধৃষ্টতা নয়, একান্ত বিস্ময়ের কথা।

—কেন বলুন ত'?

—কোন একটা বিশেষ কারণে কাল রাতে আমার মনে ঠিক এই সঙ্কল্প হয়েছিল।

—বলেন কি! একই চিন্তা দু'জনের মনে একই সময়ে। তাহলে ত' সত্যিই বিস্ময়ের কথা। আচ্ছা বলুন ত, সেই বিশেষ কারণটি কি?

যার জন্যে আমার ছবি নেবার সঙ্কল্প আপনার মনেও শিহরণ তুলেছিল ? বলুন না ?…

—খুব ঘটা করে ছবির একটা একজিবিসান খোলা হচ্ছে ; আমি তাতে একটা ছবি দেব স্থির করেছি। খবরটা কাল পেয়েছি। কেন বলতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হল, আপনাকে আদর্শ করে যদি একখানা ছবি আঁকি, সেটা ব্যর্থ হবে না।

—কি সর্বনাশ ! এত-বড় কলকাতা সহরের মধ্যে অসংখ্য রূপসী মেয়ে থাক্‌তে আমাকে আপনি আদর্শ স্থির করলেন ?

—দেখুন, আপনার কতকগুলো ভঙ্গিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা আর্টের দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত ! আমি সেগুলো বজায় রেখে একটু নতুন ভাবে আপনার ছবি আঁকতুম।

—কিন্তু আপনি নিজে থেকে আমাকে ত' কিছু বলেন নি ?

—সাহস পাইনি ; যদি আপনি অন্য কিছু মনে করেন, এই ভয়ে।

—তাহলে টোপ ফেলবার আগে মাছ আপনাকে ধরা দিয়েছে বলুন ! এখনও ঐ সঙ্কল্প আপনার মনে আছে না কি ?

—যদি আপনি অনুগ্রহ করে কথা দেন, তাহলে আজই আমি কাজ আরম্ভ করি ; কেন না, সময় খুব কম—পনেরো দিনের মধ্যে ছবি সেখানে পাঠাতে হবে।

—এতে কি লাভ বলুন ত' ?

—লাভ-লোকসান হিসেব করে কাজ ত' কোন দিন করিনি আমি !

—তা আমি খুব জানি ; উদয়-অস্ত খেটে মরেন, পয়সার বেলায় ঢু-ঢু ; অথচ এটি হচ্ছে সব চেয়ে বড় বস্তু।

—আপনি ভুল বুঝছেন। কাজ করে তার সফলতায় যে আনন্দ, সেটি আমার কাছে সব চেয়ে বড় বস্তু—পয়সা নয় !

—হতে পারে, পয়সা আপনার কাছে হয় ত' হাতের ময়লা, কিন্তু আমার কাছে ওর সার্থকতা সব চেয়ে বেশী। আপনি লাভ-লোকসান না খতিয়ে কাজে নামতে পারেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে। কাজেই

আপনাকে কথা দেবার আগে আমার জানা দরকার—এ-কাজে আমার লাভের পরিমাণ কতটুকু ?

—সবটুকু আপনার প্রাপ্য, আমি তার কোন অংশ চাই না। ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেলে সব টাকা আপনি বুঝে নেবেন।

—আর যদি বিক্রী না হয়,—ধরুন, যদি কেউ না কেনে ?

—তাহলে ছবিখানা আপনি নেবেন, সেটুকুই আপনার লাভ।

—আর আপনার লভ্যাংশ বুঝি—শুধু যশ ?

—লাভ-লোকসান যদি খতান—তা'হলে হয়ত গভীর অপযশ।

—সে আপনি বুঝবেন। আমরা হচ্ছি সুখের কপোতী, নিন্দা-অপযশের ধার ধারি না।—তা'হলে কি ভাবে আমার ছবি নিতে চান ?

—প্রত্যহ আপনাকে নিয়মিত বসিয়ে সিটিং নেওয়া ত সম্ভবপর হবে না, তাই মনে করেছি, একদিন আপনাকে কষ্ট দিয়ে আমার নিজস্ব পরিকল্পনায় একখানা ফটো তুলে তাকে আমার সাবজেক্ট করব।

—অর্থাৎ দুধের সাধটুকু ঘোলে মেটাতে চান! বেশ সে ছবি তুলবেন কখন ?

—আজ বৈকালে ঠিক চারটেয়।

—এ ঘরে ?

—না,—নিচে—আমার ষ্টুডিওতে।

—অসম্ভব। বেলা ঠিক তিনটেয় যে আমার আবার এন্‌গেজমেণ্ট আছে কালীঘাটে। সেখানে আধ ঘণ্টা থাকতে হবে। দুটো গান গেয়ে তবে ছুটি।

—বেশ ত', ছুটি পেলেই এখানে আসবেন; পনের মিনিটও লাগবে না।

—ট্যাক্সি-ভাড়া ত' লাগবে ?

—নিশ্চয়, তার ভাড়া আমি এখন আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের মধ্যে আনলায় নরেনের সার্টটি ঝুলছিল। পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করে সে নোটখানি মালতীর হাতে দিল।

মুষ্টিবদ্ধ করে মালতী হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রশ্ন করল: ভাল কথা, কি কাপড় পরে আসব?

—আপনার যা খুসী, অবশ্য সিটিং যখন দেবেন, তখন কাপড়-জামা আপনাকে বদলাতে হবে। সে-সব আমিই এনে রাখব।

ও-সবের ব্যবসাও আপনার আছে না কি?

—আমার নেই, তবে যাদের কাজ-কর্ম করি তাদের আছে। সাউথ ষ্টোরের ছবির কাজ আমাকে করতে হয়। কাপড় আমি সেখান থেকেই আনব। রূপ সৃষ্টির মত রূপসজ্জাও শিল্পীর কাজ।

নরেনকে এই মেয়েটি যতটা অপদার্থ ভেবেছিল, তার অদ্যকার কথাবার্তায় সে ভাব অনেকটা গেল। সে বুঝল, মানুষটি একেবারে অবহেলার বস্তু নয়, এর মধ্যে বস্তু কিছু আছে।

কুকারের ভ্যোপার তখন সশব্দে দালানটিকে গুলজার করে তুলেছিল। বাইরে এসেই কলকণ্ঠে মালতী বলল: এখানে আবার এ কি কাণ্ড!

দরজার সামনে এসে নরেন বলল: ইক্-মিক্-কুকার, শিল্পীর জন্য রন্ধন করছে।

—তা ত' দেখতেই পাচ্ছি,—কিন্তু একলাই খাবেন?

—বেশ ত' আপনিও লেগে পড়ুন। আনাড়ী আমি, তাহলে ত বেঁচে যাই।

—রক্ষা করুন মশাই, রন্ধনকার্যে আমি আবার আপনার চেয়েও বেশী আনাড়ী,—রাঁধুনীর ওপর এ ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, আমি এবং আমার 'মাদার', দু'জনেই।

—পুরুষদের পক্ষে এটা খুবই চিন্তার কথা, কেন না—রান্নাটাও মেয়েদের উঁচুদরের কলাবিদ্যা।

—ও। ভালগার!—আপনি দেখছি এখনো সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরীতে পিছিয়ে আছেন, তাই আপনার এমন পচা অর্থোডক্স মনোবৃত্তি, ছি!

যেমন উদ্দাম বায়ুর মত সে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল, তেমনই

ক্ষপ্র ভাবেই দালান থেকে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। নরেন এ প্রগল্‌ভা মেয়েটির সপ্রতিভ চঞ্চল গতির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে—ভোজনের উদ্দেশে কুকার নিয়ে পড়ল।

॥ আঠের ॥

ঠিক এই সময় বাড়ীর দরজার সামনে একখানা ট্যাক্সী এসে থামল। মালতী তুই চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখল, পাশের ব্লকের নতুন ভাড়াটে অবিনাশ সরকার ট্যাক্সী থেকে নামছে। তার হাতে একটি চমৎকার ফুলের তোড়া। প্রবেশ-পথে মালতীর সংগে চোখাচোখি হবামাত্র সরকার সাহেব সাহেবী কায়দায় টুপি খুলে মাথাটি ঈষৎ নত করে শিষ্টতার পরিচয় দিল, মালতীও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুটি তুলে প্রশ্ন করল: আপনিই বুঝি এ-সাইডটা ভাড়া নিয়েছেন?

অভিনেতার ভঙ্গিতে অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে সরকার সাহেব জানাল: আপনাদেরই আশ্রিত হয়ে ধন্য হয়েছি। আপনিই বোধ হয় মিস্ রায়! আপনার গানের খ্যাতি শুনে আসছি অনেক দিন থেকেই; কিন্তু চাক্ষুষ দেখছি এই প্রথম! অবশ্য কাল এসেই জানতে পারি—আপনি এই হাউসেরই আদার সাইডে থাকেন। আপনার মায়ের কাছে শুনেছিলুম। বলতে পারি না—শুনে আপনার হিংসে হবে কি না—এরই মধ্যে তিনি আমারও মা হয়ে গিয়েছেন!

—How interesting! কিন্তু এ-ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!

—সম্ভবতঃ তিনি অবকাশ পাননি আপনাকে শোনাতে। আপনিও তখন প্রেজেন্ট ছিলেন না।

—বিকালের দিকে কোন দিনই আমার বাড়ীতে প্রেজেন্ট থাকবার জো নেই! কাল ছিল তিনটে এনগেজমেণ্ট।. বলেন কেন!

—আপনার মা আমাকে সে-সব বলেছেন। অনেক কথাই হয় তাঁর সংগে আপনার সম্বন্ধে; সে-সব শুনে আপনার ওপর শ্রদ্ধা আমার আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গেছে।

—মা'র কাণ্ডই ঐ রকম। আমাকে বাড়াতে পারলে আর কিছুই চান না।

—তিনি বাড়িয়ে বলেননি কিছু! আপনার কথা আমি এখানে আসবার আগেও শুনেছি।

আমিও শুনেছি, নানা রকমের য়্যামিউজমেন্টিস্ ষ্টক করে রাখা আর সাপ্লাই করা না কি আপনার কারবার—ময়রা যেমন করে খাবার সাজিয়ে রাখে—নয় কি?

যা শুনছেন, মিছে নয়; তবে ময়রার খাবার খেলেই ফুরিয়ে যায়—আমাদের খাবারগুলো প্রাণবন্ত, জীবন্ত—জীবনকে রসিয়ে দেয়, মাতিয়ে তোলে। যাবেন আজ গোটা কতক নমুনা দেখতে...অনেক নামজাদা বড় বড় অফিসার আসবেন আজ দেখতে।

—আপনি যে রকম বর্ণনা করলেন, তাতে দেখবার কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে কি না আজ আবার বিকেলে এনগেজমেণ্ট আছে অনেকগুলো তাই ভাবছি, কি করা যায়।

—সেগুলোকে পিছিয়ে দেওয়া যায় না? মাপ করবেন, আজকে আপনাকে এ-ভাবে 'ইনভাইট' করবার বিশেষ কারণ এই যে, বেলজিয়াম থেকে একজোড়া 'বিউটি' বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়া টুর করতে; বোধ হয় কাগজে পড়ে থাকবেন; তারাই আজ অ্যাপিয়ার হবে ক্যাল-কাটায় এই ফার্ষ্ট—আমার য়্যামিউজমেণ্টস হলে। তাদের নাচ সত্যই দেখবার জিনিস—আপনি 'ডিপলী এন্‌জয়' করতে পারবেন এবং খুসী হবেন। তা ছাড়া আরও অনেক-কিছু আছে।

বেলজিয়ামের 'বিউটি'দের কথায় মালতীর মন নেচে উঠল এবং তার আবর্ত্তে পড়ে কালীঘাটের গানের এনগেজমেণ্ট ও লেকে নরেনকে সিটিং দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সব গেল তলিয়ে।

বেচারী শিল্পীর হাত থেকে এইমাত্র যে পাঁচটি টাকা ট্যাক্সী ভাড়া বাবদ নিয়েছে, সে সম্বন্ধেও কোন অনুভূতিই তার চিত্তে বিক্ষোভ তুলল না।

সলজ্জ মৃদু হেসে মালতী বলল: আপনি যখন এমন করে আমাকে 'রিকোয়েষ্ট' করছেন, তখন অসুবিধা হলেও—আজকের এনগেজমেণ্ট-গুলো 'ক্যানসেল' করা ভিন্ন আর উপায় কি! বেশ, তাই হবে; আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম মিঃ সরকার!

মাথা নত করে সরকার সাহেব সহর্ষে বলল: ধন্যবাদ! আমিও আপ্যায়িত হলাম। তাহলে আপনি প্রস্তুত থাকবেন, ঠিক চারটার সময় আমার 'কার' আসবে—আমরা একসংগেই যাব।

সহাস্য ভঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে মালা সরকার সাহেবের হাতের সুন্দর তোড়াটির দিকে কটাক্ষপাত করে প্রশ্ন করল: ওটি সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে, —নিউ মার্কেট থেকে নিশ্চয়ই?

সরকার সাহেবের বুঝতে বিলম্ব হল না, ফুলের তোড়াটির উপর তার নব-পরিচিতা বান্ধবীর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সে সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল: গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিলাম এক মেজর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি এটি প্রেজেন্ট করেছেন। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হই।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই সরকার সাহেব হাতের সুন্দর তোড়াটি মালার করকমলে সাহেবী কায়দায় সমর্পণ করল এবং মালার আরক্ত মুখখানি হতে মৃদু স্বর নির্গত হল: থ্যাঙ্কস্!

॥ উনিশ ॥

নিচের তলার ষ্টুডিওটি আজ পরিপাটীরূপে সাজিয়ে নরেন মালার প্রতীক্ষা করছিল।

মেঝেয় বিছানো গ্রীণ রঙ্গের পুরু সতরঞ্চির উপর বেতের একখানি সুশ্রী টেবিল পড়েছে, তার দুদিকে সামনাসামনি দুখানি অনুরূপ চেয়ার। নিকটে কালো রঙ্গের ঘেরাটোপ পড়ে দামী ক্যামেরাটি অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের উপর ইজেল ও চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সাজানো। পাশের ঘরখানির দরজার উপর পরদা ফেলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার আজকার 'মডেল' শ্রীমতী মালতী বেশ-পরিবর্তন ও প্রসাধন-পর্ব সেরে নেবে। সেখানেও বেতের একটি ক্ষুদ্র টিপয় স্থান পেয়েছে। তাতে সাজানো আছে ছোট একখানি আয়না, চিরুনী ব্রাস এবং কয়েকটি সেফটিপিন্। নিকটের এক পরিচিত প্রসাধনাগার থেকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য এগুলি ভাড়া করে আনা হয়েছে। দোকানের লোকই দ্রব্যগুলি এনে নরেনের নির্দেশ মত সাজিয়ে দিয়ে গেছে, সন্ধ্যার পর পুনরায় এসে তুলে নিয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের চিন্তা এই তরুণ শিল্পীর স্নায়ুপুঞ্জে কোন দিন জট পাকাবার ফুরসদ পায়নি সত্য, কিন্তু আজ বুঝি তার ব্যতিক্রম ঘটেছে! ছবি তোলা হয়ে গেলে ঘণ্টাখানেক এ স্থানে বসে মালতীর সংগে ভালো করে আলাপ করবার পরিকল্পনা একটা স্থির করেই সে দোকানের ভৃত্যকে সন্ধ্যার পর সরঞ্জামগুলি নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল।

নরেনের ধারণা—দরিদ্র বলে মালা তাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু আজ সে এই প্রগতিশীলা মেয়েটিকে দেখিয়ে দেবে যে, দরিদ্র

হলেও রুচির সহিত তার শিল্পী-মনের কিরূপ নিবিড়তম পরিচয় রয়েছে। মালতীর প্রকৃতি বুঝেই সে এখানে এতটা আড়ম্বর করে ফেলেছিল। নতুবা কোন মডেলের ছবি আঁকতে কিম্বা ফটো তুলতে এত সাজ-সরঞ্জামের কোন প্রয়োজনই হয়নি এবং এ গুলির অভাবে তাদের কোন অসুবিধাও ঘটে নি।

ক্যামেরাটি যথাস্থানে রেখে বেতের কেদারা-খানিতে বসে মালতীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে নরেন। সম্মুখে টেবিলের উপর আধুনিক ডিজাইনের একখানি মেঘবর্ণ রেশমী শাড়ী ও অনুরূপ ব্লাউজ ভাঁজ-খোলা অবস্থায় রয়েচে; মালতী এসেই সেই শাড়ী ও ব্লাউজ নিয়ে স্ক্রীনের ভিতর ঢুকবে। বেশ পরিবর্তন করে মালতী বাইরে এলে, যে খুঁতটুকু থাকবে নরেন্দ্র তা ঠিক করে দেবে। এমন কি, মালার আসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সে ব্লকের দরজা পর্যন্ত খুলে রেখেছে।

কিন্তু যার ছবি নেওয়ার এবং সেই সূত্রে শিল্পী-মনের রুচিবিলাস দেখাবার এত আয়োজন ও আকুল প্রতীক্ষা, চারটা বেজে পাঁচিশ মিনিট হয়ে গেল, তথাপি তার দেখা নেই। নরেনের দু' চক্ষু হাতের ঘড়ি এবং কান দু'টি বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তাটির ওপর পর্যায়ক্রমে ফিরছিল। মোটরের হর্ণ শুনবামাত্র সে সচকিত হয়ে উঠে, কিন্তু যখন বুঝতে পারে যে, মোটরের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে পূর্ণগতিতেই চলে গেল—তখন প্রতীক্ষাশীল শিল্পীর উৎসাহ যেন শিথিল হয়ে পড়ে।

এভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটল,—হাতঘড়ির কাঁটাটি নিষ্ঠুরের মত সাড়ে চারের এলাকাও পার হয়ে গেল। এখন নরেনের ধৈর্য্যের বাঁধন এলিয়ে পড়ল, বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার সুরে আপন মনেই সে বলে উঠল: এল না সে,—হোপলেশ্‌!

সংগে সংগে তার সর্বাঙ্গ যেন অবসন্ন হয়ে পড়ল। মাথাটি টেবিলের দিকে ঝুঁকে এল। নানাস্থানে ছুটোছুটি করে ছবি তুলবার এই উদ্যোগ-পর্বটি শেষ করতে বেচারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তার উপর আশাভঙ্গ-জনিত এই অবাঞ্ছিত মনস্তাপ। টেবিলের ওপর ডানহাতখানা পেতে,

তার উপর অবনত মুখখানি নামিয়ে মুদ্রিত নেত্রে মনে মনে সে প্রশ্ন করল—এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলল—দোকানদারের লোক লটবহরগুলো নিতে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

তার চোখ দুটি বুঝি অবসাদে একটু জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সামনের চেয়ারখানা হঠাৎ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে আর্তনাদ করে ওঠায় তন্দ্রাটুকু ভেঙ্গে এবং সবেগে সোজা হয়ে বসতেই সামনের দৃশ্যটি তাকে একেবারে অবাক্ করে দিল।

দু' চোখ বিস্ফারিত করে সে দেখল, টেবিলের অপর পাশে ঠিক তার সম্মুখে যে চেয়ারখানি মালার জন্য পাতা আছে, তা দখল করে বসেছে এক পাগড়ীওয়ালা তরুণ পরদেশী! বিচিত্র তার পরিচ্ছদ; খাঁকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা ময়লা রঙীন জামা, তার ছাঁটকাটও অদ্ভুত, গলাবন্ধের আকারে নীল রঙের একখণ্ড রেশমী বস্ত্র পিন্‌বদ্ধ হয়ে কণ্ঠ হতে কটিদেশ পর্যন্ত আস্তৃত। মাথায় গেরুয়া রঙের এক অতিকায় পাগড়ী—তার প্রাচুর্যে আগন্তুকের মুখেরও কিয়দংশ ঢাকা পড়েছে। এরূপ বিসদৃশ পরিচ্ছদের ভিতর দিয়ে এই অজাতশ্মশ্রু তরুণ আগন্তুকের স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দেহটির এমন এক অপূর্ব লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যার বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য, রূপনিষ্ঠ শিল্পীকে ক্ষণকালের জন্য তন্ময় করে ফেলল।

সে ভাব কাটতেই নরেন রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল; তুম্ কোঁন্ হ্যায়?

অসঙ্কোচ কণ্ঠে আগন্তুক উত্তর দিল: ম্যয় ইন্সান হুঁ।

মনে মনে হিন্দী তরজমা করতে করতে নরেনের বিরক্তির ঝাঁঝ কমে এল। পুনরায় প্রশ্ন করল: তুম হামরা হিয়া কেঁও আয়া?

আগন্তুক কিছুমাত্র অপ্রতিভ হল না, বরং এই বাঙ্গালী ছেলেটির মুখে এই ভাবে হিন্দী শুনে মুখের হাসি চেপে সেও সমান সুরে প্রশ্ন করল: আপ যঁহা পূর্জা ওগৈরা লেকর কেঁও আয়ে?

তরুণ পরদেশীর এই স্পর্দ্ধিত আচরণ এবং দৃঢ় স্বরে এরূপ প্রশ্ন

আপত্তিকর বুঝেও তার বলবার ভঙ্গী নরেনকে এরূপ মুগ্ধ করল যে, সে তার উত্তর না দিয়ে পারল না; বলল: হাম হিঁয়া ফটো উতারনে আয়া।

—ক্যা, আপ ফোটু উতার্‌তে হেঁ,—তো হমারী এক উতার দীজীয়ে ন?

দু' দফা হিন্দী বলে বেচারী হাঁপিয়ে উঠল; এবার কি উত্তর দিবে ভাবছে, এমন সময় টেবিলের ওপর রক্ষিত শাড়ী-ব্লাউসের উপর আগন্তুকের দৃষ্টি পড়ল, অমনি সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল: আরে, ইয়ে শাড়ী কিস্‌কী হেঁ? শাড়ীওয়ালী কিধর গয়ী?

পরক্ষণেই সে টেবিলের উপর ঝুঁকে একান্ত আগ্রহ সহকারে শাড়ীর উপরে হাতখানি রাখতেই নরেন ফশ করে শাড়ীখানা টেনে নিয়ে বলল: নেই—নেই, ইস্‌মে হাত দেও মৎ। ই শাড়ী এক লেড়কী কো ওয়াস্তে হিঁয়া হ্যায়, হাম উসিকে ফোটো হিয়া লেগা, যব সে হিঁয়া আ-কর এই শাড়ী পিনেগা।

চিল যেমন অতর্কিত ভাবে অসতর্কের হাত হতে ভক্ষ্য-বস্তু ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়, সেই ভাবে সহসা শাড়ীখানা বিস্ময়াভিভূত নরেনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আগন্তুক তার বৃহৎ পাগড়ী সমেত মাথা নেড়ে বলল: হাম পহনে তো কেয়া হরজ?

শিল্পীর এবার ধৈর্যচ্যুতি হল, দু' চোখ পাকিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল: তোমার ত' ভারী আস্পর্দ্ধা হ্যায়—জবরদস্তি করণে আয়া তোম? ছোড় দেও হামারা চীজ, আভি ছোড়ো—

আগন্তুকও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। নরেনের কথায় ত্রস্ত না হয়ে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সে বলল: আজী, পহন্‌নে তো দো, হাম ওহী লেড়কী হো জাতী হৈ।—পরক্ষণেই পরদাঘেরা স্থানটি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতেই সে দিব্যি মেয়েলী সুরে পরিষ্কার বাঙলায় বলল: ওমা, গ্রীণরুমের ব্যবস্থাও আছে দেখছি; তবে আর ভাবনা কি! বেশটা তাহলে ঐখানেই বদলানো যাক।

শিল্পী অবাক্। এত বড় পাগড়ীধারী জবরদস্ত উর্দ্দু পরদেশীর মুখে এমন সুন্দর বাঙলা? কথাগুলিও কি চমৎকার, কেমন মধুর! তার মুখের রাগ মুখেই মিলিয়ে গেল, কৌতুহলের সুরে জিজ্ঞেস করল: তুমি বাঙলা জান?

—বাঙলা না জানলে বাঙলা বলতে পারি?

—তুমি খোট্টা, না বাঙালী?

—এতদিন খোঁট্টাই ছিলুম, কিন্তু বাঙলা দেশে বাঙলা মায়ের কোলে এসে আজ আবার বাঙালী হতে সাধ হয়েছে।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপনার বোধশক্তি খুব উঁচুদরের নয় বলেই আমি আপনাকে এত শীঘ্র বিশ্বাস করতে পেরেছি, আর এই জন্য নির্ভয়ে আপনার কাছেই আজ এই প্রথম ধরা দিচ্ছি। আমি এই বয়সে অনেক মানুষ দেখেছি, এক নজরেই মানুষ চেনার যে-শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন তাতেই আমার ধারণা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে আমার কোনও ক্ষতি হবার ভয় ত' নেই-ই, বরং উপকার প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

কথাগুলি এমন মিষ্ট ও সহজ করে সে বলল যে, নরেন বিমূঢ় না হয়ে পারল না। অনুরূপ স্বরে নরেনও বলল: সে ভরসা যদি তোমার থাকে, তাহলে আমাকে সন্দেহের মধ্যে না রেখে তোমার যা বলবার, স্বচ্ছন্দে জানাতে পার।

আগন্তুক বলল: বুঝেছি, এই বিশ্রী পোষাকটি আপনার চোখে পীড়া দিচ্ছে। আর, আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠছি এটা ছাড়বার জন্যে। কেন জানেন—এটা হচ্ছে আমার ছদ্মবেশ।

—ছদ্মবেশ!

—হ্যাঁ, আমি একটা 'গ্যাঙে'র সংস্রবে ছিলুম। দলের সবাই ধরা পড়েছে, আমি একাই য়্যাবস্কনডেট্ টু হাইড! সরে পড়েছি তাদের চোখে ধূলো দিয়ে, বুঝতে পারছেন ত' আমার অবস্থা! আমি শুধু সখের ছদ্মবেশী নই, পলাতক ছদ্মবেশী।

কি সর্বনাশ! কেঁচো খুড়তে খুঁড়তে একেবারে বিষধর সাপ! একে ছদ্মবেশী, তার উপর কি না পলাতক—ফেরারী আসামী! কথার মধ্যে আবার ইংরেজী বুকনী ছাড়ে! কি কুক্ষণেই মালার সহিত আজ সে এন্‌গেজমেণ্ট করেছিল, তার জন্যেই ত' এই দুর্ভোগ! কিন্তু ইতিমধ্যেই ছেলেটির সুন্দর আকৃতি, কথা বলবার ভঙ্গি, সারল্য এবং সাহস নরেনের শিল্পীমনটিকে এরূপ অভিভূত করেছে যে, তার মুখে শেষের সাংঘাতিক কথাগুলি শুনেও সে কঠিন হতে পারল না, বরং মুখখানা তুলে প্রশ্ন করল: যারা তোমাকে ধরতে আসছে তারা কে—পুলিশ না কি?

দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে উৎসাহের সুরে ছদ্মবেশী বলল: যারা য়্যাদ্দিন ধরে রেখেছিল তারা—তাদের সঙ্গে পুলিশ ত' আছেই, যে-সে পুলিশ নয়—জঙ্গী পুলিশ!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ছদ্মবেশীর আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে নরেন বলল: অথচ তোমাকে দেখছি বিলক্ষণ নিশ্চিন্ত, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

ছদ্মবেশী এবার সহাস্যে উত্তর করল: এ-সব ব্যাপারে ঘাবড়ালেই মুস্কিল, মাথা খেলিয়ে পা ফেলতে হয়। পালাবার সময় কিন্তু ঠিক এই পোশাক আমার ছিল না। তখন পরেছিলুম অন্য রকম পোশাক।

—কিন্তু ওরা যদি ফলো করে এখানেই এসে পড়ে?

—আসাটা আশ্চর্য নয় মোটেই,—কিন্তু তার আগেই এ ভোলও আমাকে বদলাতে হবে। আসন্ন বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রয়েছে এখানেই আপনার হাতে। আপনি যে তা বুঝতে পারেন নি, এমন বোধ হয় না!

—তোমার মতলবটি বুঝতে পেরেছি! এখানে এসেই এই সব তোড়জোড় নিয়ে আমাকে দেখেই নিজের মুক্তির পথ স্থির করে ফেলেছ—ওদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। এখন বাইরের দরজাটি…

—আপনি খুলে রাখলেও আমি ঢুকেই বন্ধ করে দিয়েছি। এখন

শুনুন,—আমাকে তাড়া করেছে, আর আমি তাদের লক্ষ্য থেকে নিজেকে লুকাতে ব্যগ্র, এই সংবাদটুকুর ওপর নির্ভর করে এখানেই আপনি আমার বিচার করতে ব্যস্ত হবেন না যেন! কেন আমি এই অবস্থায় এসে পড়েছি—আমার পিছনে কেনই বা ওরা ছুটছে, তার পিছনের বৃত্তান্তটুকু জানবার সমস্ত কৌতুহল যদি আপনি দমন করতে পারেন, তা হলেই আমাকে আশ্রয় দিন। অন্যথায় আমাকে নিষ্কৃতির অন্য উপায় দেখতে হবে।

—দেখ, কৌতুহলকে আমি বড় একটা প্রশ্রয় দিই না। আর, দুঃসাহসী বলে আমার সুখ্যাতি না থাকলেও দুঃখ বা বিপদকে খুব ভীতির চক্ষে দেখি—এমন অপবাদ আমার শত্রুরাও দেবে না। তোমার সম্বন্ধে নিজের মনেই আমি স্থির করেছি যে, তোমাকে সাহায্য করা উচিত এবং তার জন্য ভগবান আমাকেই উপলক্ষ করেছেন।—বেশ, ঐ পরদাটি তুলে ভিতরে যাও, কাপড়-জামা ত' আগেই গুছিয়ে নিয়েছ, তাড়াতাড়ি এখন ড্রেসটা বদলে এসো, আমি ক্যামেরা ঠিক করছি। আমার পক্ষ থেকে তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই, এবং কোন প্রশ্নই আমার তরফ থেকে তোমার সম্বন্ধে উঠবে না, জেনো।

—ধন্যবাদ!

পরদাটি তুলে সে ভিতরে অদৃশ্য হল। নরেনের মনে অনেক চিন্তা উঠে সংশয়ের দোলা দিতে লাগল। এ কি অদ্ভুত ছেলে, এতটুকু ভয়-ডর ওর মনে নেই! একেবারে বেপরোয়া! কি দুষ্কর্ম করেছে কে জানে! ভাল কথা—এনার্কিষ্ট নয় ত'? আজকাল এই বয়সের ছেলেরাও রিভলবার নিয়ে···নরেনের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, মাথা ঘুরে গেল। তার মনে হল, গৃহটি যেন বহু জনে ভরে গেছে, লাল পাগড়ীধারী একদল পুলিশ প্রহরী তাকে ঘিরে ফেলেছে এবং এই পল্লীর সমস্ত লোক বাড়ীতে এসে তার নিগ্রহ দেখছে।

—আমি ত' রেডী, কিন্তু আপনি দেখছি ঠায় ঠিক তেমনি বসে!

চিন্তার জাল সহসা ছিন্ন হতেই সচকিতে সোজা হয়ে বসে নরেন

যা দেখল, তাতে সমস্ত দুশ্চিন্তা সেই মুহূর্তেই লুপ্ত হয়ে গেল। একি অপূর্ব মনোমোহিনী মূর্তি তার সম্মুখে! কে বলবে কয়েক মিনিট পূর্বে এই মূর্তিই প্যান্ট-পাগড়ীর আবরণে তাকে সমস্যায় ফেলেছিল! ক্ষণকালের মধ্যে এ কি আশ্চর্য পরিবর্তন! অগ্নিশিখার মত তার প্রখর রূপ যেন জ্বলছে, আর ফুটন্ত গোলাপের মত অপরূপ মুখখানি যেন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। অতিশয় সুশ্রী ভুরু দু'টি যেন কোন দক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় গাঢ় কালির রেখা ফুটে উঠেছে। দীর্ঘায়ত দুই চক্ষুর প্রভাও অতুলনীয়। পরিধেয় বস্ত্রখানির অঞ্চলটি পিঠের উপর দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে,—অমার্জ্জিত রুক্ষ কুন্তলগুলি মুখের দু' পাশে ও পৃষ্ঠদেশ জুড়ে আলুতুভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। হাতে গাছকয়েক সুশ্রী চুড়ি দেখা যাচ্ছে, গলায় একগাছা সরু হার দুলছে। অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। এই সাধারণ সজ্জায় কি চমৎকার তাকে মানিয়েছে,—দাঁড়াবার ভঙ্গিটুকুও কি সুন্দর!

শিল্প-বিদ্যালয়ের বার্ষিকোৎসবে ছাত্রসমাজ নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হলে নরেন স্বহস্তে নারী-ভূমিকার অভিনেতৃ-ছাত্রগণকে এমন নিপুণভাবে সাজিয়ে দিত যে, অপরূপ রূপসজ্জার উৎকর্ষে তাদের নারী বলে ভ্রম হত। কিন্তু আজ এই ছদ্মবেশী বালকটিকে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের চেষ্টায় এমন নিখুঁতভাকে আধুনিকা তরুণী সেজে বেড়িয়ে আসতে দেখে সে চমৎকৃত হল।

অপর কেউ হলে নির্নিমেষ নেত্রে দীর্ঘকাল হয়ত এই অপূর্ব রূপের দিকে চেয়ে থাকত,—কিন্তু নরেন সত্যিকারের শিল্পী, তার 'মডেল'টির অতুলনীয় রূপভঙ্গির আদর্শ গ্রহণের এই অপ্রত্যাশিত ক্ষণটি সে পরিহার করতে পারল না, হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গের মত সঁচকিত হয়ে হাতের কাজ করতে করতে সে বলল: ঠিক অমনি দাঁড়িয়ে থাক—যেমন আছ।

নরেনের দু' চোখ ক্রমশঃ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—ইণ্টারন্যাশানাল পিক্‌চার একজিবিসানের চিত্র-প্রতিযোগিতার উন্মাদনাময় বিজ্ঞপ্তির স্মৃতি তাকে উত্তেজিত করে দিল—এই আশ্চর্য ছদ্মবেশীর

রূপাতিশয্য, চমৎকার রূপসজ্জা এবং দাঁড়াবার অপূর্ব ভঙ্গি। এই অপরূপ আদর্শ তুলবার জন্য সে বুঝি সর্বসত্তা নিয়োগ করল।

হাতের কাজটুকু সারা হতেই কতকটা আশ্বস্ত হয়ে নরেন বলল: আমার কাজ হয়ে গেছে। আশ্চর্য, সেই ভাবেই তুমি এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছ? এখন তুমি বসতে পার।

ছদ্মবেশী মৃদু স্বরে মুখে হাসির একটু রেখা ফুটিয়ে বলল: প্রয়োজন হলে এখন থেকে সারা রাত আমি এই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

নরেন সবিস্ময়ে বলল: তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। যতখানি সময় তুমি এভাবে দাঁড়িয়েছিলে, এটাও বড় কম কথা নয়। এর জন্যেই আমার আঁকার কাজ আজ সার্থক হয়েছে। অথচ, এই কাজের জন্যে একজনের আশায় কি দুশ্চিন্তায় না পড়েছিলাম।

আঁচলটি মাথার উপর তুলে দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে ছদ্মবেশী এখন তার নির্দিষ্ট বেতের চেয়ারটির উপর আস্তে আস্তে বসল।

এই অপূর্ব নারীমূর্তির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে নরেন বলল: আমি কিন্তু হলফ করে বলতে পারি—সে ডাকু ছোকরাকে পুলিশরা কস্মিন্ কালেও খুঁজে পাবে না। ওদিক দিয়ে এখন আর কোন ভয় নেই।

নরেনের কথায় ছদ্মবেশী মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে বলল: আমার মনে কিন্তু বড় রকমের একটা আশঙ্কার কথা উঠছে।

অবাক হয়ে নরেন জিজ্ঞেস করল: সেটা কি?

—যে মেয়েটির ফটো তুলবেন বলে এত ঘটা করে সাজসরঞ্জাম—মায় সাড়ী-ব্লাউজ পর্যন্ত সাজিয়ে রেখেছিলেন—তিনি যদি এসে পড়েন, আর এই নূতন চীজটিকে দেখে কৈফিয়ৎ চান।—কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করেই সে শিল্পীর মুখের উপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

তার এই স্বর নরেনকে যেন সহসা সঙ্কুচিত করে দিল। সে বুঝল, ছেলেটি সব দিক দিয়েই অসাধারণ। সংলাপের মধ্যে এক সময় অসতর্ক মুহূর্তে এখানকার উদ্যোগ-পর্বের পূর্বাভাসটুকু অতি

সংক্ষেপেই তাকে ব্যক্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ছেলেটি যে সংগে সংগে সেটি মনের মধ্যে টুকে নিয়েছে, এটা নরেন ভাবে নি। তার এই আশঙ্কাটিও যে অমূলক নয়, এবং ইতিমধ্যে মালতী এখানে এসে পড়লে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির যে উদ্ভব হত, নরেনের চিত্ত তাতে সায় না দিয়ে পারল না। কিন্তু সে সম্ভাবনা আর নেই —মালতীর আসবার সময় অনেক আগেই অতিবাহিত হয়েছে, এই ধারণাই দৃঢ় হয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করল। নরেন দৃঢ়স্বরে ছদ্মবেশীকে জানিয়ে দিল : না, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত নই। সে এলেও ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

মুখ টিপে হেসে ছদ্মবেশী প্রশ্ন করল : পারতেন তাঁকে ফেরাতে? বলুন না—সত্যিই পারতেন? এখনও যদি আসেন—ফিরিয়ে দিতে পারবেন আপনি?

নরেনের মনের প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ এবার উগ্রভাবে ফুটে উঠল। কঠিন কণ্ঠে এবার তাকে বলতে হল—কেন পারব না? তার সংগে আমার চুক্তি হয়েছিল, ঠিক চারটের সময় এখানে এসে সিটিং দেবে। তাড়াতাড়ি আসবার জন্য আমি টাকা পর্যন্ত আগাম দিয়েছি। সে যদি তার কথা খেলাপ করে, আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না কেন?

মৃদু হেসে ছদ্মবেশী উত্তর করল : এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনার মনের যে পরিচয়টুকু পেয়েছি, তাতে জোর করে বলতে পারি, আপনি অত রূঢ় হতে পারেন না। যাক্ গে, এ আশঙ্কা যখন আপনার মনে আমল পেল না, আপনার আশঙ্কাকেও আমি আমল দেব না।

রহস্য ভরে নরেন বলল : আমার আশঙ্কাকে আমল না দেওয়ার সোজা মানে হচ্ছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া ; অর্থাৎ, জিনিসগুলোর মালিক আসবার আগেই তাদের শাড়ী-ব্লাউস পরা অবস্থাতেই সরে পড়া— এই ত?

মুখের হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে ছদ্মবেশী উত্তর দিল : নিষ্কৃতির পক্ষে

এটা খুব সহজ উপায়ই ছিল, কিন্তু এত বড় বেইমানীর কাজ ত' আমার ধাতে পোষাবে না।

এই সময় একটা দমকা বাতাসে ছদ্মবেশীর মাথার কতকগুলি চূর্ণ-কুন্তল মুখমণ্ডলে পড়ে তার মুখের কথা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুডৌল হাতখানি তুলে ছদ্মবেশীর চুলগুলি সরাবার কৌশলটুকু শিল্পীর দৃষ্টিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে দিল, যেটা কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংগে সংগে সে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠল : এ কি হল!—ও-রকম চুল তোমার মাথায় কি করে এল?

হাসিমুখেই ছদ্মবেশী বলল : চুলে হাত পড়তেই বুঝি চুলগুলি এতক্ষণে নজরে পড়ল? কিন্তু চুল ত আমার সংগেই ছিল।

কণ্ঠে জোর দিয়ে নরেন বলল : কিন্তু ও-চুল ত' পরচুল নয়—দিব্যি মাথা থেকে গজিয়েছে দেখছি।

—ঠিকই দেখছেন। কিন্তু পরচুলের কথা তুললেন কেন বলুন ত'?

—তুমিই ত বললে সংগে ছিল।

—তাতে কি বুঝালো যে চুলগুলো আমি পুঁটুলি বেঁধে সংগে করে এনেছিলুম! সংগে ছিল মানে—যথাস্থানে অর্থাৎ মাথায় ছিল—পাগড়ীর ভিতরে।

—পুরুষ মানুষের এত লম্বা চুল হয়?

—কেন হবে না? প্রথম সাক্ষী ত' আমি—সামনেই রয়েছি। আরও দু'-চারটে নমুনা দেখাতে পারি। তা-ছাড়া খবরের কাগজে 'চুল-বনাম-চোরে'র খবর পড়েন নি?

—চুল-বনাম-চোর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ভারী মজার খবর। এক ভদ্রলোক সখ করে মাথায় মেয়েদের মতন চুল রেখেছিলেন বলে স্ত্রী প্রায়ই খোঁটা দিতেন। একদিন হয়েছে কি, রাত্তিরে স্বামি-স্ত্রী খাটে শুয়ে পাশাপাশি ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় সিঁদ কেটে ঘরে চোর ঢুকে স্ত্রীর গলা থেকে সোনার দামী হার-ছড়াটি খুলে নেবার জন্যে চুপিচুপি মাথার কাছে এসে বসে।

ভদ্রলোক মাথার চুল এলিয়ে শুতেন। চোর সেই চুল স্ত্রীলোকের চুল মনে করে তারই ওপর হাত চালিয়ে গলার হার খুঁজতেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর চীৎকারে চোরও ধরা পড়ে। আদালতে বেচারা চোর স্পষ্টই বলে—কে জানত, পুরুষ মানুষ অমন লম্বা চুল রাখে, চুলের জন্যেই আমি ধরা পড়ে গেলুম।—এর পরও কি আপনি বলবেন, লম্বা চুল শুধু মেয়েদেরই একচেটে ?

এই সরস প্রসঙ্গ শুনে শিল্পীর মুখেও হাসির রেখা ফুটল। মৃদু হেসে সে জিজ্ঞেস করল: আর গহনা—এগুলো কোথা থেকে এল ?

ছদ্মবেশী অসঙ্কোচেই কথাটির উত্তর দিল: এগুলো অবশ্য অঙ্গ থেকে গজায় নি, সঙ্গেই ছিল। অর্থাৎ শাড়ী যখন মাথায় ওঠে পাগড়ী হয়ে, ঝুটো গয়নাগুলো তখন প্যাণ্টের পকেটেই সেঁধিয়েছিল। সন্দেহ আপনার কাটল, না আরও কিছু জিজ্ঞেস করবেন ?

গম্ভীর মুখে নরেন বলল: আমি এখন হাঁপিয়ে উঠেছি, আর কিছু জানতে চাই না, ইচ্ছাও নেই। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বল ?

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ছদ্মবেশী বলল: আমার কি ইচ্ছা সেটা বলবার আগে আপনার কাছ থেকে এই কথাটি শুধু জানতে চাই—আমার অতীত সম্বন্ধে কোন কৌতূহল কি আপনার মনে উঠছে না ?

দৃঢ় স্বরে নরেন উত্তর দিল: না। তোমার অতীতকে চাপা দিয়ে বর্তমানকে নিষ্কণ্টক করাই আমার অভিপ্রায়। অর্থাৎ আজকের সঙ্কট-মুহূর্তে রক্ষকের যে দায়িত্ব বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছে আমাকে, শেষ পর্যন্ত তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করতে আমার পক্ষ থেকে কিছুমাত্র দ্বিধা উঠবে না। অবশ্য তোমাকেও পিছনের চিহ্নগুলো সব মুছে ফেলতে হবে।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ছদ্মবেশী উঠে দাঁড়াল, তার পর বেতের টেবিলখানার পাশ থেকে একেবারে নরেনের পাশে এসে স্বরে জোর দিয়ে বলল: তাহলে ত' আর অন্ধকারে থাকা যায় না বিশ্বাস মশাই। বেশ, এখন একবার শিল্পীর দৃষ্টিতে ভাল করে আমাকে দেখুন ত',

দেখে কি মনে হয় সেটাও বলুন। অতীতটা আপনার কাছে চেপে রাখলেও বর্ত্তমানের সম্বন্ধে এ-ভাবে আপনাকে আড়ালে রাখতে আমার প্রাণও সত্যি হাঁপিয়ে উঠছে।

কথাগুলো বলতে বলতে এমন অপরূপ ভঙ্গীতে গ্রীবাটি তুলে এবং সর্বাঙ্গসুন্দর কমনীয় দেহটি লীলায়িত করে অর্দ্ধনিমীলিত সস্মিতাননে সে দাঁড়াল যে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি দক্ষ ভাস্কর-শিল্পীর নির্মিত এক অপূর্ব মর্মরমূর্তি। মন্ত্রমুগ্ধবৎ নরেন সম্মুখের সেই অপরূপ মূর্ত্তির পানে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হঠাৎ শিউরে উঠল। যে সন্দেহের শিহরণ তার রুদ্ধ অন্তরদ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়েছিল, তাই কি নির্ঘাত বাস্তব হয়ে তাকে হতবুদ্ধি করে দিল! আশ্চর্য, নিজের শিল্পীসুলভ দৃষ্টির আবেদনকে এতক্ষণ সে কোন্ যুক্তিতে ঠেকিয়ে রেখেছিল? মনের দুর্ব্বলতা এখন লজ্জার রূপ ধরে তাকে পীড়া দিচ্ছে। এই অবস্থাটিকে লুকিয়ে রাখবার স্থান কি কোথাও সে খুঁজে পাবে?

সুপ্তোত্থিতের মত সোজা হয়ে বসে অত্যন্ত মৃদু স্বরে নরেন বলল: মনের সন্দেহ যদি আগেই জোর করে প্রকাশ করতুম, তাহলে আপনি এ-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে আমাকে লজ্জা দিতে পারতেন না। বসুন আপনি।

লীলায়িত ভঙ্গীতেই ছদ্মবেশী তার চেয়ারখানিতে বসল এবং পরক্ষণেই মুখখানি তুলে বলল: আপনার এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, আমার সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টিতে যে সন্দেহ ফুটে উঠেছিল, সেটা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু বলুন ত, সম্বোধনটাকে হঠাৎ উত্তম পুরুষে তুললেন কেন? পরিবর্ত্তন যে-দিক দিয়েই হোক, বয়সের দিক দিয়ে ত' কিছু বদলায়নি! তবে?

নরেন ঘেমে উঠছিল, পকেট থেকে রুমালখানি বের করে মুখের ঘাম মুছে উত্তর দিল: আপনি ত' অনেক কিছুই জানেন, তাহলে এ কথাও স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই—সতেরো-আঠারো বছরের কোন ছেলেকে আমরা যে চোখে দেখতে অভ্যস্ত, সেই বয়সের কোন

মহিলা আমাদের সংস্রবে এলে অনেকখানি সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে আমাদের শিক্ষিত মন যেন বাধ্য এবং দেখেও থাকি। সুতরাং লজ্জা পাওয়াটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

—সে যাই হোক, আমার সম্বন্ধে কিন্তু স্বভাবের এই অভ্যাসটি আপনাকে বদলাতে হবে বিশ্বাস মশাই, নৈলে আমারও লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। এতক্ষণ যেমন 'তুমি' বলে আলাপ করছিলেন, দয়া করে সেটাই বরাবর বজায় রাখতে হবে।—বলেই সে অনুরোধপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেনের মুখের পানে চেয়ে রইল।

অনুরোধের ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেও নরেনের মনে হল, প্রতি কথাটার মাত্রায় আদেশের সুরটুকু সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটি যেন অগ্নিরেখার মত তার মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। প্রথম দর্শনেই তার প্রাঞ্জল কণ্ঠস্বর, বলিষ্ঠ আকৃতি, সুমিষ্ট অথচ সাহসী ভঙ্গি এবং তেজোদৃপ্ত ব্যবহারটি নরেনকে মুগ্ধ করেছিল। বাঙলার ছেলেদের পরনির্ভরতা ও মেয়েলিপনা দেখে দেখে তার চোখে অরুচি জন্মেছিল; সহসা নির্ভীকভাবে এসে সে যেন তার চোখের পরদাখানি পালটে দেয়। একটু পরেই যখন প্রয়োজনের তাগিদে সে বেশ পরিবর্তন করে এল, তখনও যেন তার কানে কানে কে এই বলে গুঞ্জন তুলছিল—স্বাস্থ্যহীন যে সব মেয়ে শুধু প্রসাধনের চটকে রূপগর্ব্বে আমাদের চোখের সামনে বেহায়ার মত ঘুরে বেড়ায়, এ চেহারা তাদের তুলনায় একেবারে আলাদা। কিন্তু মনের মধ্যে তার এই যে একটুখানি দৌর্বল্য মোহের মত জন্মেছিল, যখনই সে ভাবল, এ ত' সত্যই মেয়ে নয়—মেয়ের ছদ্মবেশ পরেছে, তখনই সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে মনের মোহটি সম্পূর্ণ ভাবে তখনও কাটেনি—এমন কি, চুলের প্রসঙ্গে তার মুখ চেপে রাখবার জন্য বানানো চুরির গল্পটি শুনেও মনের মধ্যে যখন সন্দেহের এই দ্বন্দ্ব চলেছে, তখন সে নিজের হাতেই মুখোসখানা খুলে শুধু যে ধরা দিয়েছে তা নয়—একান্ত অন্তরঙ্গের মত সহজ সরল আচরণের দাবী করছে এবং নরেনও তখন

মনে মনে বেশ অনুভব করতে বাধ্য হল যে, স্বল্পক্ষণের পরিচয়ে এই রহস্যময়ী অপরিচিতা তার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে —তাকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই তার মন সরছে না।

মনের এই অবস্থায় মেয়েটির কথার উত্তরে দিব্য স্নিগ্ধ স্বরে নরেনকে বলতে হল : বেশ, তাই হবে। নিজেকে আর সব দিক দিয়ে গোপন রেখে সম্ভাষণের ওই শব্দটিকে যে প্রাধান্য দিচ্ছ তুমি—তাকেই উপলক্ষ করে শিল্পী তার সাধনা সুরু করবে।

প্রখর দৃষ্টিতে শিল্পীর সঙ্কল্প-দৃঢ় মুখখানির পানে চেয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল : শিল্পীর এতে লাভ ?

দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল নরেন : লুকানো হারানো গোপন-করা কিম্বা চাপা-পড়া বস্তুকে সাধনার আলোকে ফুটিয়ে তোলার চেয়ে শিল্পী-জীবনে বড় লাভ আর কি থাকতে পারে ?

নরেনের মুখের এই দৃঢ় ভঙ্গী এবং ততোধিক দৃঢ় কণ্ঠস্বর এই দুঃসাহসিকা মেয়েটিকে শুধু যে বিস্ময়ে অবাক্ করে দিল তা নয়—তার অন্তর্নিহিত রুদ্ধ মর্মদ্বারেও যেন সশব্দে আঘাত হেনে আঘাতজনিত বেদনার দুঃসহ জ্বালার চিহ্ন তার চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলল। এতক্ষণের মধ্যে তার বিহসিত মুখখানি এই প্রথম ভারাক্রান্ত হতে দেখা গেল এবং সেই সঙ্গে তার সমস্ত দেহ মথিত করে চাপা কণ্ঠের আর্তস্বর বের হল : আমার মনের সন্ধান কি করে আপনি পেলেন, কে আপনাকে দিল ? আপনি কি অন্তর্যামী ?

শান্তকণ্ঠে শিল্পী উত্তর করল : আমি শিল্পী, মানুষের মনের রূপ মুখে ফুটিয়ে তোলাই আমার সাধনা।

অশ্রুভারাক্রান্ত দীর্ঘায়ত দুটো চোখ মেলে শিল্পীর পানে চেয়ে মেয়েটি বলল : কিন্তু আমি যে অপরিচিতা।

শিল্পীর মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু আত্মপ্রত্যয়ের আলোর মত ফুটে উঠল। স্নিগ্ধদৃষ্টি সম্মুখবর্তিনী অপরিচিতার মুখে নিবদ্ধ করে সংযত স্বরে ধীরে ধীরে বলল : অপরিচিতাকে পরিচিতা করেই শিল্পীর আনন্দ।

গাঢ়স্বরে তরুণী বলে উঠল : তাহলে, তার যোগ্য উপাদান যোগান দিয়ে শিল্পীর আনন্দকে সার্থক করাই হচ্ছে অপরিচিতার কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি আমার জীবনের যতখানি জানি, সবই আপনাকে বলছি। আপনাকে আমার সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখতে চাইনা।

অপরিচিতা তরুণী অতঃপর শিল্পীকে তার অতীত জীবনের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল…।

॥ কুড়ি ॥

ওদিকে শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রমেও বর্ষের পর বর্ষ পরিক্রমার তালে তালে স্বামীজীর প্রিয়তমা শিষ্যাটির তনুলতা পরিবর্তনের সংগে সংগে পারিপার্শ্বিক বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগেই বলা হয়েছে, কি ভেবে কে জানে, স্বামীজী রেণুর নূতন নামকরণ করেন—দেবী। সিদ্ধাশ্রমের সকলেই এতে প্রীত হয়েছে—লালা লছমনজী পর্যন্ত। দেবী ত'—দেবীই ; এমন আশ্চর্য বলিষ্ঠ রূপ এর আগে আশ্রমবাসী কেউ নাকি কখনও দেখেনি! দেবীর বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে তার সর্বাঙ্গে যৌবনের কমনীয় রেখাগুলি যতই পরিস্ফুট হয়ে উঠে, স্বামীজীর রূপসজ্জাও সেই অনুপাতে চক্ষু-চমৎকারী হতে থাকায় আশ্রমবাসীদের আলোচনার বস্তু করে তোলে। এই প্রসঙ্গে একদা মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাসূত্রে লালা স্বামীজীকে বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করেন—বছর বারো আগে প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় যে লোক আপনাকে প্রথম দেখেছিল, আজ যদি তাকে সামনে এনে হাজীর করা যায়, সে এখনকার চেহারা দেখে বিশ্বাসই করবে না যে—সেই লোক আপনি!

লালার কথা শুনে স্বামীজী সেদিন চমকে উঠে বলেছিলেন—তুমি দেখছি আমার চেয়েও বড় সয়তান!…তার পরই কিছুটা পরিতুষ্টির সুরে বলে ওঠেন—'তাহলে তোমাকে না বলে পারছিনা লালা, শোন

তবে—প্রথম যৌবনে আমার যে মানসী প্রিয়ার স্মৃতি মনের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল, সে চাপাটি এখন খুলে দিয়েছে নিজের হাতে এই মেয়েটি—বারো বছর আগে তুমি যার হাতখানি ধরে আমার সামনে এনে হাজির করেছিলে! এখন ওর পরিপূর্ণ আকৃতি, মুখ চোখ ও কথার ভঙ্গী, অদ্ভুত রূপলাবণ্য আমার মনে এই ধরণের একটা চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে—'প্রথম যৌবনের সেই মানসী প্রিয়তমাই কি দেবীর মূর্তি ধরে ফিরে এসেছে?'

স্বামীজী হয় ত' কথার পীঠে আরও কিছু বলতেন! কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে লালা গম্ভীর মুখে বলল: তার মানে, নিজের সৃষ্টি দেখেই আপনি মোহিত হয়েছেন। আর এ-কথাও ঠিক, বারো বছর আগে আপনার হাতে যখন এই মেয়েটিকে তুলে দিই, তখন ভাবতেও পারিনি যে, আপনার হাতে পড়ে আর এলেমের জোরে সেদিনের সেই মেয়েটি এমন অসাধারণ হয়ে উঠবে।

স্বামীজী এই কথার উত্তরে সহাস্যে বললেন: সেদিন তুমিই ত' বাঁটোয়ারা করেছিলে ভাই! এক পাল মেয়ে তোমরা নিয়ে আমার ভাগ ব'লে এই একটি মেয়েই সেদিন দিয়েছিলে—আমিও এতে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

লালাও জবাব দিল: তাহলে চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোকটা আওড়াতে হয় দাদাজী—'একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি ন চ তারা সহস্রশঃ!' এও তাই। আপনিই জিতে গেছেন দাদাজী!

স্বামীজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণকাল লালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে দৃষ্টি কোমল করে বললেন: জানো, আমার সারা জীবনের সঞ্চিত বিভূতি সব উজোড় করে একে তৈরী করেছি। কিন্তু এই মেয়েটি যদি তোমার ভাগে পড়ত, পাঁটীর দলে মিশিয়ে দিতে। তার বদলে আমি একে সব দিক দিয়ে চৌখস আর অসাধারণ করেই এমন ভাবে গড়ে তুলেছি। এখন একে অনায়াসে দেবীর মত মহীয়সী বলা যায়।

লালাজী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললেন: কিন্তু দাদাজী—আমিও

একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা দিক লক্ষ্য করে আমার ভাগের মেয়েগুলিকে পুষেছি—

কথাটায় বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে স্বামীজী বললেন: হ্যাঁ, কশাই যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছাগল পোষে—এ কথা আমি আগেই বলেছি লালাভাই।

লালাজীও এ-কথায় না দমে মুখখানা আরও কঠিন করে জবাব দিলেন: সেটা হচ্ছে কশায়ের বৃত্তি বা পেশা—তাকে দোষ দেওয়া যায় না। মানলাম, আমার ভাগের মেয়েগুলিকে আমার বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিমত শিখিয়ে পড়িয়ে সংসার বাঁধতে লাগিয়ে দিয়েছি, আর এতদিন ধরে দেখা-শোনার ও লায়েক করে তোলবার মজুরী চড়াদরেই উসুল করে নিয়েছি। সেই আয় থেকেই এত বড় আশ্রম চলেছে—আপনিও আপনার মানসীকে নিয়ে রাজর্ষির মত বাহাল তবিয়তে দিন গুজরাণ করছেন। এখন আপনিই বলুন ত দাদাজী—যে প্রবৃত্তি নিয়ে দেবীকে আপনি অসাধারণ করে তুলেছেন, আপনার সেই প্রবৃত্তিটা কি কশায়ের প্রবৃত্তির চেয়ে কম বিশ্রী?

তৎক্ষণাৎ সবেগে সোজা হয়ে বসে স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে হুমকি দিলেন: লালা—

লালা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন: পুরাণের একটা গল্প শুনেছিলাম, এখানে সে গল্পটা বলতে বাধ্য হচ্ছি দাদাজী। একবার বিধাতাজীর মনে সাধ হলো, এমন এক রূপসী সৃষ্টি করবেন, যার তুলনা ত্রিভুবনে কোথাও থাকবে না। তৈরী করলেন তেমন মেয়ে; কিন্তু তার রূপ দেখে নিজেই লালসায় হলেন অস্থির। তারপর অবিশ্যি, ভুল তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল। আপনিও দাদাজী, আমার এই গল্প থেকেই নিজের অবস্থাটি বুঝে নিন। এই ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে তর্ক করতেও আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। যদি আমার অনুমান মিথ্যা হয়ে থাকে, যে শাস্তি আমাকে দেবেন—আমি তা মাথা পেতে নেব। আর, যদি সত্যি হয়—আপনিই ভাববেন…এর পর আপনার কি করা উচিত।

কথাগুলি শেষ করে সে কক্ষে স্বামীজীর সামনে আর লালা বসে রইলেন না, ঝাঁ করে উঠে ছায়ার মত সরে গেলেন।

দুই বুদ্ধিমানের কথোপকথনের প্রাক্কালে দেবী পাশের ঘরে আসে এবং লালার কণ্ঠে সহসা তার নাম শুনে কৌতূহলের সঙ্গে গবাক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনে ফেলে, এটা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। সাধারণতঃ দেবী এই সময় পাকশালায় রন্ধনকার্যে লিপ্ত থাকে; কিন্তু তারই ফাঁকে একটা প্রয়োজনে তাকে এই কক্ষে আসতে হয়েছিল। কিছুকাল হতে সাধুজীর আচরণ সম্পর্কে দেবীর অন্তরে যে প্রশ্ন কুহেলিকাচ্ছন্ন এক বিচিত্র মায়াজাল রচনা করেছিল, এদিনের এই সংলাপ ঠিক নবারুণের কিরণ সম্পাতের মতই তাকে ছিন্নভিন্ন করে সত্যের সন্ধান দিল।

ওদিকে লালাজীর ঝটিতি প্রস্থানের পর আনন্দস্বামীর পরিপক্ক স্নায়ু-পুঞ্জ আলোড়িত হয়ে উঠল তাঁর মনের মণিকোঠার প্রচ্ছন্ন গূঢ় অভিসন্ধির আবরণটি এভাবে হঠাৎ লালাজীর কথার আঘাতে উদঘাটিত হয়ে পড়ায়। অস্থায়ী এক একটি বুদ্‌বুদের আকারে কত গুপ্ত তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে এবং ছবির মত ক্ষণিক চাঞ্চল্য জাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমেই মানস-পটে ফুটে উঠে—তরুণ যৌবনের মানসী প্রিয়াটির ছবি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান তিনি, মাথায় মস্ত এক টিকি—সিদ্ধ কুলের নিদর্শন। সিদ্ধ বংশজাত বন্ধুর শিক্ষিত পুত্র জেনে এবং মাথায় সেই টিকি দেখে বয়স্থা কন্যার শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন বিচারপতি গৃহস্বামী বিশ্বাস করে। কিন্তু সে প্রথম দর্শনেই ছাত্রীর অনুপম রূপ দেখে চিত্ত হারিয়ে ফেলে—তার বংশ ও জাতিগত পার্থক্যের কথা না ভেবেই ভালবাসতে থাকে। পড়াতে বসে কত সব অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ তুলে ছাত্রীকে চমৎকৃত করে দেন। নীট্‌সের নীতি কোট করে প্রচলিত মতবাদের উপর তাঁর সে কি তীব্র ব্যঙ্গোক্তি!... পুরানো ঈশ্বররা সব মরে গেছে, এখন নতুন ঈশ্বর তৈরী করা চাই। ছাত্রী এ-কথা শুনে প্রশ্ন করত—কেমন করে সেটা সম্ভব হবে

পণ্ডিত মশাই ?···শিক্ষকও অসঙ্কোচে উত্তর দিতেন—ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে মাটির পানে তাকাও, পৃথিবীকে ভালবাস, মানুষকে বিশ্বাস কর ; যারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করেছে—তাদের টুঁটি চেপে আগে সরিয়ে দাও ; তখন দেখবে, ঈশ্বর বেরুচ্ছেন তোমার ভিতর দিয়ে—যারা প্রেমিক, যারা ভালবাসতে জানে—তাদের মধ্যেই ঈশ্বর লুকিয়ে থাকেন।···ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের মুখে এই ধরণের কথা শুনে পরদিন শিক্ষক পড়াতে এলেই ছাত্রী একখানি কাঁচি হাতে করে এসে বলল—পড়াতে বসবার আগেই আজ আপনাকে মাথা থেকে টিকিটা কেটে ফেলতে হবে পণ্ডিত মশাই !···ফ্যাল ফ্যাল করে ছাত্রীর মুখের পানে চেয়ে থাকেন শিক্ষক, তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। ছাত্রী তখন মুখ টিপে হেসে বলেন—টিকির সংগে ঐ সব কথা খাপ খায়না কিনা, তাই ওটা কাটতে চেয়েছি, বুঝেছেন পণ্ডিত মশাই ?···শিক্ষক তখন গম্ভীর হয়ে বলেন—বিদ্যাসাগরও এমনি অনেক নতুন কথা বলেছেন, কিন্তু কেউ ত টিকি কাটবার জন্য তাঁর হাতে কাঁচি তুলে দিতে যায় নি !···

ছাত্রী তৎক্ষণাৎ মুখখানি গম্ভীর করে জবাব দেন—কিন্তু বিদ্যাসাগর যে কোন বিধবা ছাত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্যেই বিধবা-বিবাহ প্রচার করেছিলেন—এমন কথাও ত শোনা যায় নি, পণ্ডিত মশাই !···

সেই দিন হতে শিক্ষক মশায়ের মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায়, মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি ছাত্রী তার মনোভাব ধরে ফেলেছেন ? কায়স্থ কন্যা সে—তার প্রতি ব্রাহ্মণ শিক্ষকের লোভটি উপলব্ধি করেই কি সে টিকিটি নিশ্চিহ্ন করতে কাঁচি দেখিয়েছিল ?···

আশ্চর্য্য ! চল্লিশ বৎসর পরে আজও তাঁকে সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রবীণ বয়সে বছরের পর বছর ধরে যে বালিকাটিকে তিনি নিজের কাছে রেখে শিক্ষায়-দীক্ষায়—শক্তি সামর্থ ও বিবিধ বিদ্যায় পটীয়সী করে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর হন····তার

বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁরও চোখের পরদা যেন একটু একটু করে পালটাতে থাকে। বর্তমানের এই অষ্টাদশী তরুণী ছাত্রীটির সংগে তাঁর সে দিনের—চল্লিশ বছর আগেকার সেই জজ-দুহিতা প্রিয়তমা ছাত্রীটির কোন পার্থক্যই নেই! তন্ময় হয়েই স্বামীজী শুধু দেখেন—সারা অন্তর দিয়ে পূর্বতন প্রিয় ছাত্রীটির সংগে মিলিয়ে মিলিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকেন···দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়েন। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই মর্ম্মস্পর্শী ভংগি, সেই অপরূপ তনুলতা···একদিন যার পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মনে মনে কামনা করেছিলেন—সুকোমল দুটি কমনীয় করপল্লব তাঁর দেহ-পাদপটি পরিবেষ্টন করে তাঁকে ধন্য করবে। সে দিনের সে আশা ও উদ্যম ব্যর্থ হয়েছিল; কিন্তু আজ?···কই, সেই তীব্র আকাঙ্খা ত বয়োবৃদ্ধির সংগে শুখিয়ে নিরস হয়ে যায় নি···কিশলয়ের মত পুনরায় যে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে! নিজের উগ্র প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে তিনি কি তার পথ খুলে দেন নি? তারই সাক্ষ্য ত নিজের বর্তমান চেহারা। সেফ্‌টি ক্ষুরে নিত্য দাড়ী না চাঁচলে এখন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেন, স্নো-পাউডারের প্রলেপ না দিলে মন যেন খুঁৎ খুঁৎ করে!

লালাকে অবিশ্যি বুঝাতে হয়েছে যে, দীর্ঘ দাড়ী ও জটা দেখে মেয়েটা ভয় পায় বলেই ও পাট তুলে দিতে হয়েছিল; কিন্তু সত্যই কি তাই? সেবারের প্রিয়াটি টিকি কাটবার জন্য কাঁচি দেখিয়েছিল, কিন্তু এবারের মেয়েটির জন্য তাঁকে স্বহস্তে চুল দাড়ি মুড়াতে হয়েছে। ফলে, যে জীবন মরচে ধরে অচল হয়ে পড়েছিল, এই মেয়েটির সংস্পর্শে ও মোহে তাঁর শ্রীছাঁদ পালটে গেছে। স্বামীজীর ধারণা ছিল, মনকে তিনি চোখ ঠারিয়ে অন্ততঃ লোকের চোখে ধূলা দিতে পেরেছেন—তাঁর মনের পাপ অন্যের চোখে ধরা পড়ে নি; কিন্তু এখন লালাজীর কথায় সে ভুল তাঁর ভেংগে যায়। তাই অতীতের চিন্তার সংগে বর্তমানের চিন্তার, এই যোগ-সাজছ ঘটেছে, ভাবতে ভাবতে তিনি বিহ্বল হয়ে ডাকতে থাকেন: দেবী, দেবী!

দেবীর অন্তর মধ্যেও এতক্ষণ দুশ্চিন্তার সপ্ত সমুদ্র যেন সবেগে উথলিয়ে উঠছিল ; তারও স্নায়ুপুঞ্জ আলোড়িত হচ্ছিল সাধুজীর সংলাপ-সম্পর্কে এদিনের বিস্ময়কর প্রসঙ্গটির প্রচণ্ড আঘাতে। সেই সংগে জোর করেই বুঝি এই সাধু নামধেয় মানুষটির সহিত তার সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী সে স্মরণ করতে চাচ্ছিল।...সাধুজীর নিজস্ব ঘরখানির পাশেই দেবীর ঘর ; সেখানে অধ্যয়ন ও শক্তি-চর্চ্চার যাবতীয় উপাদানগুলি তাকেই পর পর সাজিয়ে রাখতে হয়েছে...স্বামীজী প্রত্যহ সেখানে গিয়ে সেগুলি পরিদর্শন করে থাকেন। এই ঘরের পরেই ক্ষুদ্র একটি অঙ্গন, তার পরই স্বামীজীর জন্য স্বতন্ত্র পাকশালা—প্রাপ্তবয়স্কা হবার পর দেবীর উপরেই এটির ভার পড়ে। আশ্রমস্থ পাকশালায় প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণে সাধুজী অভ্যস্ত থাকলেও, প্রায় পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলল, সে ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পাকশালা হতে সাধুজীর আহার্য্য প্রস্তুত হয়ে থাকে—দেবীকেই স্বহস্তে পাক ও পরিবেষণ করতে হয়। রন্ধন-বিদ্যাও সাধুজী কৈশোরকাল হতে হাতে ধরে দেবীকে শিখিয়েছেন।

আশ্রমের ভাণ্ডার হতে দু বেলা সিধা আসে—নানাবিধ পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত প্রচুর পরিমাণ দুধ ঘি'র ব্যবস্থা থাকে। আমিষও আশ্রমে নিষিদ্ধ নয়—ভিন্ন প্রদেশের রীতি ও রুচি অনুযায়ী মাংস রান্নার প্রণালী দেবীকে সযত্নে শিক্ষা করতে হয়েছে সাধুজীর কাছে। এখন তাঁর মুখে দেবীর হাতের রান্নার সুখ্যাতি ধরে না। শুধু কি ইহাই......ইদানীং দেবীও লক্ষ্য করেছে—তার অজ্ঞাতে রান্নাঘরের বাইরে বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে সংগোপনে সাধুজী চেয়ে চেয়ে তার রন্ধনপরায়ণা মূর্ত্তিটি দেখছেন...মারাঠা মেয়েদের মত আঁটসাঁট করে দীর্ঘ শাড়ীটি সে পরেছে, আঁচলখানি কটিদেশে জড়িয়ে বেঁধেছে, কালো চুলের রাশি সমস্ত পীঠে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আগুনের আভায় তার সুগৌর মুখখানি আরক্ত...আর তার

অজ্ঞাতে অন্তরাল হতে লুব্ধ দৃষ্টিতে এই রূপ-চিহ্নগুলি দেখছেন আর কেউ নয়—তার গুরুস্থানীয় পূজ্য সাধুজী ! এ-অবস্থায় হঠাৎ যদি চোখা-চোখি হয়, তাহলে মৃদু হেসে সরে যান তিনি। দেবী ভাবত, আড়াল হতে সাধুজী দেখছেন, তার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না। কিন্তু আজ সে বুঝি লজ্জাকে লুকিয়ে রাখবার স্থান খুঁজে পাচ্ছে না। ছি, ছি, ছি! সাধুজীর প্রকৃতিও……আবার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায়—পড়াবার সময় ইংরাজী সংস্কৃত ও বাঙলা কাব্য নাটক থেকে বেছে বেছে আদি রসাত্মক অংশগুলি খোলাখুলি ভাবে বুঝাবার জন্য তাঁর কি প্রয়াস! লজ্জায় দেবীর আনন আরক্ত হলেও, সাধুজীর উৎসাহ যেন আরও উগ্র হতে থাকে। তৎকালে সাধুজীর চোখের ভাষা দেবী বুঝেনি, বুঝতে চেষ্টাও করে নি; কিন্তু এখন সেই দৃষ্টির কথা মনে পড়তেই সে শিউরে ওঠে—তার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে।……মনে পড়ে—দেবী খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে সাধুজীকে…আপন মনেই দেবী পড়ে যাচ্ছে; হঠাৎ কি একটা প্রশ্ন করবার জন্য কাগজ হতে মুখ তুলেই সাধুজীর দিকে চাইতেই দেখে—সাধুজীর চোখ-মুখ-মন সব নিবদ্ধ রয়েছে দেবীর মুখের দিকে। অমনি কি ভেবে সে উঠে পড়ে, প্রশ্ন মনেই থেকে যায়। সাধুজীও তখন দেবীর পড়ার তারিফ করে পরিস্থিতির মোড়টা ঘুরিয়ে দেন। কিন্তু তখন কি দেবী বুঝেছিল—সে দৃষ্টির কি অর্থ! কিন্তু আজ? এখন?…এমনই কতদিনের কত কথাই দেবীর মনে পড়ে, আর ঘৃণায় লজ্জায় তার সমস্ত দেহটি রী রী করতে থাকে।

এই সময় পাশের ঘর হতে সাধুজীর আহ্বান আসে। সে যে পাকের ঘর হতে এই ঘরে এসে সংগোপনে সব কথা শুনেছে এবং এখানেই রয়েছে, এটা গোপন করবার উদ্দেশ্যে কোনও সাড়া না দিয়েই চুপি চুপি বেরিয়ে আসে।

একটু বিলম্ব করেই দেবী স্বামীজীর গৃহে প্রবেশ করে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: আমাকে ডাকছিলেন সাধুজী?

দেবীর মুখের দিকে সাধুজী চাইলে চোখাচোখি হবে এই আশঙ্কায় কক্ষে প্রবেশ করেই দেবী চোখের দৃষ্টি নত করল। দেবীর মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সাধুজী বললেন : মুখখানা ভার ভার দেখছি যে ? কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

তেমনি দৃষ্টি নত করে দেবী জবাব দিল : না তো। হ্যাঁ, তবে একটা স্বপ্নের কথা ভাবছিলাম, কাল রাতে ভারি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেবীকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বললেন : সে কি গো ? এত লেখাপড়া শিখে শেষে স্বপ্ন দেখে ভাবতে বসলে ? স্বপ্ন কখনো সত্য হয় ?

দেবী অসঙ্কোচে বলল : স্বপ্নের কথা নিয়ে বিশ্বপণ্ডিতরা ত চর্চাও অনেক করেছেন সাধুজী। অবচেতন মনের ক্রিয়া বলেও অনেকে উল্লেখ করেছেন। ভালো করে ভাবলে বলতে হয়, স্বপ্নের অনেক ব্যাপার যেমন সত্য হয় না, তেমনি সবই মিথ্যা বলে উপেক্ষা করাও চলে না।

—কি স্বপ্ন তুমি দেখেছ দেবী,বল ত শুনি ?

—খুব খারাপ, অথচ আমরা যে অবস্থায় আছি, তার সঙ্গে যে খাপ খায় না, একথাও বলা যায় না।

—বেশ ত, বলই না শুনি, কি দেখেছ স্বপ্নে ?

—শুনবেন ?—এখানকার মেয়েরা বড় হলেই যেমন চলে যায়, কিম্বা এখান থেকে তাদের বিদায় করে দেওয়া হয়, তেমনি আমাকেও যেন বিদায় করে দিয়েছেন।

হো হো করে হেসে স্বামীজী বললেন : তোমাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে , এই স্বপ্ন দেখেছ তুমি ?

হ্যাঁ। আমাকে যেন অনেক দূরে নিয়ে গেছে কারা। সে দেশ কখনো দেখিনি চোখে। তারপর সেখানে হলো কি, একটা বুড়ো মানুষ, অনেক বয়স হয়েছে তার, গলায় ফুলের মালা দিয়ে বিয়ের

সাজে সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়াল ; তারপর আমার হাতে এক ছড়া মালা দিয়ে বলল সে—আমার গলায় পরিয়ে দাও, আমিও ঐ মালা তোমার গলায় পরিয়ে দেব।

শুষ্ক কণ্ঠে স্বামীজী বললেন : এই স্বপ্ন দেখেছ তুমি ? বিয়ে হচ্ছে তোমার—একটা বুড়োর সঙ্গে ?

দেবী দৃঢ়স্বরে বলল : সেই বুড়ো চাইছিল আমাকে বিয়ে করতে। কিন্তু আমি তার হাত থেকে মালা ছড়াটি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে কুঁচোকুঁচি করে বললাম—এই জন্যেই তুমি আমাকে এখানে এনেছিলে ? সে কথার উত্তরে বুড়ো বলল—হ্যাঁ, তবে আমি তোমাকে বিয়ে করব বলে আনিনি ; এনেছিলুম—মেয়ের মত তোমাকে পালন করব বলে ; কিন্তু এখন তোমার রূপ দেখে আমার মনে লোভ হয়েছে। আমি তোমাকে চাই—বিয়ে করতে চাই। ঐ এক ছড়া মালা ছিঁড়ে ফেললে কি হবে, এখনি হাজার ছড়া মালা এসে পড়বে।...আমিও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি ; বুড়োকে বললাম—ফের যদি তুমি ও চেষ্টা কর, তাহলে তোমার জীবনটাকেও আমি ঐ মালার মত করে ছিঁড়ে ফেলব জেনো! যেই এ কথা বলা, অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল। সেই থেকে আমার সারা মন যেন বিষিয়ে উঠেছে সাধুজী!

এই পর্য্যন্ত বলেই দেবী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে তাকাতেই স্পষ্ট লক্ষ্য করল যে, তাঁর মুখখানা যেন ম্লান হয়ে গেছে, সারা মুখের উপর কালো একটা ছায়া পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলে নিয়ে স্বামীজী স্নিগ্ধ স্বরে বললেন : ছি! এই নিয়ে তুমি মন খারাপ করবেনা দেবী! তোমার কোন ভয় নেই। কার সাধ্য তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। আজ বিকেলে তোমাকে চণ্ডীদাস পড়ে শোনাব, মন শান্ত হবে।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে দেবী বলল : না, সাধুজী—না। আমি আর পড়ব না, কোন কাব্য চর্চ্চা করব না, ওতে মনের ভাব কোমল হয়। আমি মনকে পাথর করতে চাই—আজ থেকে আমি আবার ছোরা-ছুরি

নিয়ে কসরৎ করব; তারপর—যেমন করে পারি, আমার এই রূপকে কেটে চেঁচে খুঁচিয়ে এমন কদর্য্য করে তুলব যে, দেখলেই লোকে মুখ ফিরিয়ে নেবে—কেউ আর লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাবে না।

স্বামীজীর বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে ওঠে···আজই বা হঠাৎ দেবীর মুখে এই সব কথা শোনা যায় কেন? তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত এবং সেই সূত্রে মনের এই বিক্ষোভ কি নিরর্থক? তিনি ত' ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছেন—দেবী যেন আজ আর তাঁর দৃষ্টি সহ্য করতে পারছে না। তবে কি অন্তরাল হতে দেবী লালাজীর সহিত তাঁর সংলাপ সব শুনেছে? কিন্তু তাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মানেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া। কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বামীজী বললেন: তুমি দেখছি আজ বড় উত্তেজিত হয়েছ দেবী! সাধারণভাবে একটা স্বপ্ন দেখে এভাবে অধৈর্য্য হয়ে ওঠা ঠিক নয়। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আর একদিন কথা হবে। এখন হাত মুখ ধুয়ে আহারের উদ্যোগ কর, আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

এ কথার পর আর কোন কথা না বলে দেবী তাড়াতাড়ি পাকশালায় চলে গেল। স্বামীজী তাঁর অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি অনুমানের সুতায় সাজাতে বসলেন।

॥ একুশ ॥

সে-দিন অপরাহ্নের দিকে লালা লছমন দাস আনন্দ স্বামীর কক্ষে এসে বিনা ভূমিকায় বললেন: করাচীর সর্ব্বনেশে খবর শুনেছেন দাদাজী, দেশময় হুলস্থূল পড়ে গেছে!

স্বামীজী তখন অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে একখানি ইংরাজী কেতাব পড়ছিলেন; লালাকে দেখে ও তাঁর মুখে এই প্রশ্ন শুনে বইখানি মুড়তে মুড়তে বললেন: আজকের কাগজে ওখানকার হুর ডাকাতদের

ব্যাপার, আর তাদের সঙ্গে পীর পাগোরার [illegible] খবর খুব ফলাও করে বেরিয়েছে বটে। পীর সাহেবের সঙ্গে তোমার কারবার আছে নাকি লালা?

লালা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: কেন, আপনিও কি তা জানেন না দাদাজী—আমাদের আশ্রমের সেরা খদ্দের হচ্ছেন করাচীর পীরপাগোরা, তাঁর টাকাতেই আমাদের যত সব নপর চপর। খবরের কাগজে ত' আপনি মোটামুটি খবর পড়েছেন, এখন আসল খবর চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছে ওখানকার দালাল বিঠলদাসজী।...বলতে বলতে লালাজী ফতুয়ার পকেট হ'তে ডাকঘরের ছাপ দেওয়া পুরু একখানা লেফাফা বের করে স্বামীজীর হাতের কাছে রাখলেন। খামের মুখ খোলা, চিঠিখানা লালা আগেই পড়েছিলেন। স্বামীজী বললেন: চিঠি পরে পড়া যাবে, তার আগে তোমার মুখেই খবরটি শুনি—বিঠলদাস কি লিখেছে; সংক্ষেপেই আমাকে বল।

লালাজী বললেন: খবর খুব সাংঘাতিক। পীর সাহেবের রঙমহলে এখান থেকে যে-সব-মেয়ে চালান দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ওখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পুলিসের কাছে আমাদের কথা সব বলে দিয়েছে। বিঠলদাসজী তাই লিখেছেন,-এ চিঠি টেলিগ্রাম মনে করে আমরা যেন হুঁসিয়ার হই; মেয়েগুলোকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলি—কেননা, তাঁর ধারণা—পুলিস ঐ চিঠির ব্যাপারে এখানেও তদন্ত করতে পারে।

স্বামীজী বললেন: এ ত ভারি তাজ্জব ব্যাপার হে লালা! করাচীর পীর পাগোরা শুনেছি সিন্ধুদেশে বাদশার মত প্রভাবশালী; তাঁর তাঁবেয় রীতিমত পলটন আছে; ধনৈশ্বর্য্যেরও সীমা নেই। অথচ, সেখান থেকে একটা মেয়ে পালিয়ে এসে পুলিসের কাছে একরার করল? তার ঘাড়ে কি দুটো মাথা ছিল? আর, তুমিও ত হামেসাই বলে আসছ—তোমার আশ্রম থেকে যে সব মেয়েকে বাইরে পাচার করা হয়, তাদের এমন করে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে রেখেছ যে—কোন বেফাঁস কথা তাদের মুখ থেকে কখনো বেরুবে না। তাহলে এ হলো কি?

লালা বললেন : চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লেই সব আপনি বুঝতে পারবেন। কে এক নতুন গোয়েন্দা ওদেশ থেকে এলেমদার হয়ে এদেশে আসে, আর সরকার তাকেই পীর পাগোরার হদিস নেবার জন্যে তার পিছনে লাগায়। সেই লোকই ভিতরকার খবর সব টেনে বার করে সরকারকে জানায়; সরকারের ফৌজ পীরের আস্তানা ঘিরে ফেলে। তারপর ভিতরে সেঁধিয়ে বিস্তর লুঠের মাল আর কতকগুলি মেয়েকে উদ্ধার করে; তাদের মধ্যে আমাদের আশ্রমের অনেক মেয়ে ছিল— কেবল যে মেয়েটা আগেই পালিয়েছিল, সেই গোয়েন্দার চালাকীতে ঘাবড়ে গিয়ে এখানকার কথা সব বলেছে!

স্বামীজী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন : তাহলে বল যে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কালসাপ বেরিয়ে পড়েছে। ভালো, চিঠিখানা পড়েই দেখা যাক্।

চিঠিখানা পড়ে ও পূর্ব্ববৎ খামের মধ্যে ভরতে ভরতে স্বামীজী বললেন : পীর পাগোরার মত নামজাদা জবরদস্ত আলেমের আস্তানায় সেঁধিয়ে পুলিস যখন খানাতল্লাসী করতে পেরেছে, তখন আর কোন সুরাহা দেখি না। তারপর এখানকার মেয়েটা যখন একরার করেছে— এই আশ্রম থেকেই তাকে ওরা নিয়ে গেছে, তখন আর সব মেয়েদের কাছ থেকেও পুলিস কথা বার করে নিয়ে তবে ছাড়বে। ভাল কথা, এখান থেকে কতগুলো মেয়েকে পীর পাগোরার আড্ডায় পাঠানো হয়েছে শুনি?

লালাজী একটু ভেবে বললেন : তা প্রায় জন বারো হবে, দাদাজী!

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে স্বামীজী বললেন : তাহলেই বোঝ এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। পুলিস যদি জানতে পারে, এখানকার একটা বিশিষ্ট আশ্রম থেকে পীর পাগোরার মত কুখ্যাত ব্যক্তির আস্তানায় এইভাবে এতগুলো মেয়ে পাচার করা হয়েছে, তখন ত' ওদের মনে এই আশ্রমের ওপর রীতিমত একটা সন্দেহ জাগবেই। আর, তার ফল কি হবে বুঝতেই পারছ? একেই বড় বড় মেলা থেকে মেয়ে

চুরির হিড়িক সারা দেশে একটা আতঙ্ক ও বিক্ষোভ জাগিয়ে রেখেছে। পুলিস এর কোন কিনারা করতে না পারায় লেখালিখিও হয়েছে; এখন এক সঙ্গে একটা জায়গা থেকে একই আশ্রমের এতগুলো মেয়ে ধরা পড়লে, পুলিস কেন—সারা দেশের নজর পড়বে এই আশ্রমের ওপর। তার কি ফল হবে জানো—বাইরের ছদ্ম আবরণ কিছুতেই এ আশ্রমকে আর রক্ষা করতে পারবে না। পাপ এমনি করেই সব পয়মাল করে দেয় লালা।

ম্লান মুখে লালা জিজ্ঞাসা করল: এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য তাই বলুন দাদাজী?

স্বামীজী এ প্রশ্নের উত্তরে মুখখানি কঠিন করে বললেন: এখন হয়েছে কি জানো লালা, কাণা হরিণের মত তোমরা একটা দিকেই কড়া নজর রেখে আগুন নিয়ে বরাবর খেলা করে এসেছ; একবারও ভাবনি যে, একটু অসামাল হলেই সর্ব্বনাশ হবে। যাই হোক, আমি এখনি কিছু বলতে পারছিনে—এর পর কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে। আজ আমাকে ভাবতে দাও। কাল বিকেলে এ সম্বন্ধে কথা হবে।

পরদিন খবরের কাগজে করাচীর পীর পাগোরার ব্যাপারটি আরও বিস্তারিতভাবে বাহির হল: "করাচীর পুলিস পীর সাহেবের সুবিস্তীর্ণ আস্তানা খানাতল্লাস করে বহু বন্দীকে উদ্ধার করেছে; তাদের মধ্যে কতক পীর সাহেবের বিরাগভাজন হয়ে কয়েদীর জীবন যাপন করছিল, কতক তাঁর মিত্রপক্ষের দুষমন বলে ওখানে গুম করে রাখা হয়েছিল। নানা দেশ ও জাতির শতাধিক রূপসী নারীকে পুলিস উদ্ধার করেছে। এদের নিকট হতে পুলিস যে-সব গোপন তথ্য জ্ঞাত হয়েছে, তাতে প্রকাশ পায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও অবাধে নারী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় চলেছে এবং সমাজের অভিশাপস্বরূপ অর্থলোলুপ একশ্রেণীর পাষণ্ড মঠ আশ্রম আখড়া প্রভৃতি নামের সাইন-বোর্ডের অন্তরালে এই ঘৃণিত ব্যবসায় দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে আসছে। ফলে, এরা দেশের গৌরবস্বরূপ কল্যাণধর্মী বিশিষ্ট

মঠ ও আশ্রমাদির বিভীষিকাস্বরূপ হয়েছে। মধ্যে মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কা সুন্দরী বালিকাদের নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, কর্তৃপক্ষের ধারণা, এই সূত্রে তার রহস্য আবিষ্কৃত হবে। সম্প্রতি ওদেশের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও ওয়াসিংটন ডিটেকটিভ ইয়ার্ড থেকে আধুনিক প্রণালীর গোয়েন্দাগিরীতে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিচক্ষণ কর্মী মিষ্টার লাল বিহারী সিংহের উপর সরকার দীর্ঘকাল ধরে এদেশের বালিকাচুরীর রহস্যময় ব্যাপারটির তদন্তভার দিয়েছিলেন। তিনি অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্য্যারম্ভ করে এই সূত্রে দুর্নীতির এমন এক বিরাট কেন্দ্রস্থান অবিষ্কার করে ফেলেছেন যাকে আরব্যোপন্যাসের মত বিস্ময়াবহ বলা যায়। অপহৃতা নারীদের সহিত যে সমস্ত ধন-দৌলত পাওয়া গেছে, তার পরিমাণ এক কোটী টাকারও অধিক। কুখ্যাত দুর দস্যুগণ কর্তৃক এই বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছিল। বহু দস্যুও এই সংগে ধরা পড়েছে। পলটনের সাহায্য নিয়ে মিষ্টার সিংহ এই দুষ্কর কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর এই অভিনব আবিষ্কার বহু ছদ্ম প্রতিষ্ঠানের অদৃশ্য অভ্যন্তরে আলোকপাত করবে।”

বৈকালে সংবাদপত্রের এই বিবরণী লালাই স্বামীজীকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। স্বামীজী বললেন: কাল তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, এ অবস্থায় তোমাদের কি কর্ত্তব্য? এখন সেই কথাই বলছি—আর একটা দিনও নয়, রাতটুকুর মধ্যেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে না নিলে আবার জেলে গিয়ে দিন কাটাতে হবে।

স্বামীজীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে লালা বলল: আপনি কি নিজের দিকে চেয়েও একথা বলছেন দাদাজী?

—হ্যাঁ। তবে আমার কথাটা আরও একটু খোলশা করে বলা উচিত মনে করছি। দেবীর সম্বন্ধে তুমিই আমার মনের গলদ ধরিয়ে দিয়ে চোখের পরদা সরিয়ে দিয়েছিলে। ঠিকই করেছিলে। আমি যথার্থ ই দেবীর ওপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি—যৌবনে

যে রূপ আমাকে বিহ্বল করেছিল, বার্ধক্যে সেই রূপ আমার মনে বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি জাগাতে পারে নি।

লালাজী জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে এ অবস্থায় আপনি এখন কি করবেন ?

দাদাজী বললেন : প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া এ অবস্থায় আমার করবার আর কিছুই নেই। আজই বেরিয়ে পড়বো লোটা আর কম্বল মাত্র সম্বল করে।

—দেবীকেও ছেড়ে যাবেন ?

—হ্যাঁ ; দেবীকে তোমার হাতে দিয়ে যাবো এই সর্ত্তে—তুমি যেখান থেকে ওকে ভুলিয়ে এনেছিলে, সেই খানেই আবার নিয়ে গিয়ে ওর বাপের হাতে সঁপে দেবে। তাতে তুমি মোটা রকমের বখশিসও পাবে।

লালা মুখখানা মচকে বললেন : সে গুড়ে বালি দাদাজী ! দেবীকে ওর বাপের কাছে নিয়ে যাওয়া মানেই জেলখানায় যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে দেওয়া।

স্বামীজী বললেন : না—বরং দেবীই তোমাকে নিষ্কৃতির পথে নিয়ে যাবে ; তার পরের কথা, তোমার শেষ জীবনটা সুখে ও আরামে কাটাবার উপলক্ষও হবে। আমি সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে এমন ভাবে একখানা পত্র লিখে দেব—সেখানাই হবে তোমার ছাড়-পত্র। দেবীর মা বেঁচে থাকেন ভালই, নতুবা ওর বাবাও সে পত্র পড়লে কখনই তোমার বিরুদ্ধে যাবেন না। তুমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাওগে—আমি ঐ চিঠিখানা লিখে ফেলি।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী দেবীকে ডেকে স্নেহের সুরে বললেন : কাছে বস ত দিদি !

দেবী অবাক। এমন স্নেহের সুরে আহ্বান সাধুজীর মুখে ত ইদানীং শুনে নাই সে। বিদ্রোহী মনকে সামলে নিয়ে দেবী সাধুজীর কাছে বসল। তার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সহাস্যে ও তেমনি স্নেহের সুরে তিনি বললেন : হাতখানি দেখি দিদি !

চোখের দৃষ্টির রূপ আর মুখের কথার সুর ধরে মানুষকে চিনবার শক্তি দেবী অর্জ্জন করেছিল। আশ্চর্য, সাধুজীর চোখে নির্মল ভঙ্গি, তাঁর কথায় স্নেহের এমন মাধুর্য ত এর আগে দেখে নাই দেবী! আর এই সম্বোধনও যে একেবারে নূতন। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সাধুজীর দিকে একটিবার নীরবে চেয়েই বাম হাতখানি সে আগে বাড়াইয়া দিল। দেবীর করতলের রেখাগুলি নিবিষ্টচিত্তে কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর স্বামীজী বললেন: তোমার হাতে নতুন একটি রেখা উঠেছে দেখছি।

সহজভাবেই দেবী বলল: তাই নাকি? কিন্তু ও রেখা উঠলে কি হয় সাধুজী?

স্বামীজী বললেন: এ রেখা উঠলে সত্যকার আপনার জনের সন্ধান পাওয়া যায়। রেখার সংস্থান দেখে মনে হচ্ছে দিদি—খুব শীঘ্রই হয়ত তোমার বাপ মা'র সঙ্গে মিলন হবে।

বিচিত্র এক পুলকে দেবীর আপাদ মস্তক রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় তড়িদ্বেগে শোণিত সঞ্চালনের গতিভঙ্গি সে অনুভব করে। এ কি অদ্ভুত কথা আজ সহসা সাধুজীর মুখ হতে বের হয়ে পড়ল—যা সে কোনদিন কল্পনাও করে নাই। তার পক্ষে যে-ব্যাপারটি একেবারে অপ্রত্যাশিত, সাধুজীর মুখেই সে প্রসঙ্গটি এই মাত্র সে শুনল! তার সত্যকার আপনার জন···পিতা মাতা···তাঁদের সঙ্গে মিলন···একি শুনেছে সে? সত্যই কি এই সিদ্ধাশ্রম ছাড়া আর একটা দুনিয়া আছে—যেখানে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে····সেখানে কি সত্যই তার কোন আপনার জন···।

দেবী আর ভাবতে পারে না, যেন কিসের একটা আবেগে তার সমস্ত চিত্ত ভরে ওঠে, মুখের কথা পর্যন্ত বন্ধ হয় যায়, বিহ্বলভাবে সে সাধুজীর মুখের দিকেই চেয়ে থাকে।

স্বামীজী তার মনোভাব বুঝতে পারেন, তাঁরও সমস্ত চিত্ত দুলে ওঠে, কিন্তু এ অবস্থায় তাকে কি বলবেন···তাছাড়া, বলা

উচিতও নয়; তাই তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে পূর্ববৎ স্নেহের সুরেই বললেন: হাতের রেখা দেখেই আমি ঐ সম্ভাবনার কথা বলছি। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তুমি শীঘ্রই সব জানতে পারবে। এখন কিন্তু এই নিয়ে মনে মনে যেন আকাশ কুসুম রচনা ক'র না দিদি। বরং তাড়াতাড়ি রাতের খাবারটা তৈরী করে ফেল। খাওয়ার পাট সেরে আমাকে সারা রাত ধরে তোমার হাতের এই রেখা-বিচার করতে হবে। কাল সকালে হয়ত আরও কিছু জানতে পারবে।

এর পর দেবীকে পাকশালায় প্রবেশ করতে হল। স্বামীজীও তার কাগজপত্র নিয়ে পড়ার ঘরে বসলেন।

দেবী যখন পাকশালায় রন্ধনে ব্যস্ত, সেই সময় স্বামীজী লালাকে ডেকে তার হাতে শীলমোহর করা একখানি পত্র দিলেন। উপরে লেখা নামটি পড়ে লালা বলল: আমি ভেবেছিলাম, দেবীর মায়ের নামেই চিঠিখানা লিখেছেন; কিন্তু এ যে দেখছি, দেবীর নামে চিঠি!

স্বামীজী বললেন: ভেবে দেখলাম, এইটিই উচিত। আর, এতেই কাজ হবে। অনুরোধ আমি দেবীকেই করতে পারি, আর, দেবী কখনই তা ঠেলতে পারবে না। পরে তুমিও বুঝবে এ চিঠির সার্থকতা। এর মধ্যেই সব আছে। তোমার ভয় নেই লালা, আমি শপথ করে বলছি—তোমাকে কোন রকম অসুবিধায় যাতে পড়তে না হয়, উপরন্তু শেষ জীবনটা সুখে ও আরামে কাটে এবং ওঁরা যাতে সর্বতোভাবে তোমার সহায় হন, সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি এই চিঠি লিখেছি। আমি আবার বলছি, তুমি কোন বিপদে পড়বে না, কোন দুঃখ কষ্ট এর পর তোমার থাকবে না। এ ছাড়াও দেবীকে আমি এই মর্মে এক আলাদা পত্রে নির্দেশনামা লিখে দিয়ে যাব যে, তোমাকে সন্তুষ্ট রেখে তোমার সুপরামর্শ মত চললে, সে তার বাপ-মা'র দেখা পাবে; তার কারণ—তুমি ছাড়া আর কেউ তাঁদের সন্ধান জানে না। কিন্তু এই সঙ্গে তোমাকেও এ কথা বলছি লালা, তুমি

যদি কোন রকমে এ-বিশ্বাস ভঙ্গ করে দেবীকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে স্বয়ং সয়তানও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

লালাজী একথা শুনবামাত্র শিউরে উঠে এবং দন্তে জিহ্বা কেটে আর্দ্রস্বরে বলল: রাম, রাম, রাম! এমন কথা বলবেন না দাদাজী—শুনেই আমার বুকখানা কেঁপে উঠছে। আমি আপনার ওপর, দেবীর ওপর বেইমানী করব! আর সে কি সম্ভব দাদাজী? আমি আপনার তু' পা ছুঁয়ে বলছি, বেইমানি আমি করব না—হাজারো সয়তান আমার কানে রাতদিন সলা দিয়েও আমাকে বেইমান বানাতে পারবে না।

অতঃপর আর সবার অলক্ষ্যে সেই কক্ষেই তুই কর্মী পরস্পরের নিকট বিদায় নিলেন—নীরবে আর্ত্ত চারিটি চক্ষুর সংযোগে এক দারুণ বেদনাকর পর্বের সমাপ্তি হল।

পরদিন সকালে উঠে অভ্যাসমত সাধুজীকে দর্শন করতে গিয়ে দেবী দেখল, সাধুজীর সিদ্ধাসনটির কোন চিহ্নই নেই—পুরু কম্বল, গৈরিক বর্ণের আস্তরণ, মহার্ঘ মৃগচর্ম, কমণ্ডলু, কাষ্ঠ-পাতুকা, দণ্ড ও গৈরিক বর্ণের দীর্ঘ ঝুলি—এগুলিও অদৃশ্য হয়েছে। পড়ে রয়েছে কতকগুলি গ্রন্থ, পুঁথী, বস্ত্র ও ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্যাদি। দেবীর বিস্ময়ের অন্ত নেই—অতীতের যবনিকা তুললে, যতদূর তার স্মরণ হয়, এই কক্ষে একইভাবে সে দেখে আসছে—মধ্য স্থলে আস্তৃত সাধুজীর বিস্তীর্ণ সিদ্ধাসন, তার উপর অধিষ্ঠিত এক সিদ্ধ পুরুষ…যিনি এখানে সর্ব্বজন-বরেণ্য। আজই প্রথম দেখছে—সেই চিরপরিচিত সিদ্ধাসনে সহিত সিদ্ধ পুরুষটিও অদৃশ্য হয়েছেন!

সহসা শ্বেতপাথরের আধারটির উপর দেবীর দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেল—হাতল দেওয়া একটা বড় ক্লিপের মধ্যে একখানা খামে মোড়া চিঠি রয়েছে। ক্ষিপ্রহস্তে খামখানি ক্লিপ হতে মুক্ত করে তার উপরে সাধুজীর হাতে লেখা নিজ নামটি দেখে দেবী শিউরে উঠল। পরক্ষণে খাম থেকে চিঠিখানি বের করে পড়তে লাগল। সাধুজী লিখেছেন—

দিদি। তোমার মনে শিক্ষার যে আলো পড়েছে, তাতে তুমি তোমার শিক্ষাদাতা, প্রতিপালক ও দীর্ঘকালের অভিভাবক এই সাধু-বেশধারী ভণ্ডটির মনোবিকার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ; আর—নিজের মনের বিচারশক্তি দিয়ে কিছু কিছু বুঝতেও পেরেছ। কিন্তু এই বিকারের মূলে ছিল আর একটি মেয়ে—যার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, কথা, ভঙ্গি সবই তোমার মত। তরুণ যৌবনে সে ছিল আমার ছাত্রী। কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণেতর জাতির সেই মেয়েটির রূপগুণে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ভাবি, মেয়েটিও আমাকে প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেবে। কিন্তু আমার অভিপ্রায় সে জানতে পেরে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে আঘাত দিয়ে সমস্ত আশা ভেঙে দেয়।

এ হলো আমার প্রথম যৌবনের কথা—তার অনেক দিন পরে তুমি হয় ত পৃথিবীর আলো দেখেছ। কিন্তু শৈশবে তুমি যখন আমার সংস্রবে এলে, তোমাকে সেই বয়সে দেখেই চমকে উঠেছিলাম; তার কারণ, সেই মেয়েটির মুখ ও চোখের আদল যেন তোমার মুখমণ্ডলে দেখতে পেলাম। তার পর শুক্লপক্ষের শশিকলার মত যতই তুমি বাড়তে থাক, তোমার আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে আমি যেন বহুবছর আগে ছেড়ে আসা সেই মেয়েটির রূপরেখা ফুটে উঠতে দেখি। প্রথমে সেই মেয়েটির নামের সঙ্গে ছন্দের মিল রেখে তোমার নাম রাখি তনু; এরপর সেটা বদল করে নাম রাখলাম দেবী। আশ্রমশুদ্ধ সবাই এ নাম শুনে খুসি হয়।

এর পর কখন যে তুমি কৈশোরের সীমারেখা পার হয় যৌবনের সেই চিহ্নিত স্থানটি দখলকরে বসেছ, আমি সেটা ধরতেই পারি নি। আমার মনে হয়—প্রথম যৌবনের সেই ছাত্রীটির পরিচিত ও বাঞ্ছিত মূর্ত্তি ধরে আমার কাছে এসেছে, হয়ত আমার অবচেতন মনের সাধনার প্রভাবেই তোমার রূপের এই পরিবর্তন ঘটেছে। আমার মন এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, সময়ের ব্যবধান নিয়েও কোন বিতর্ক ওঠেনি, বা আমি কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাতে দিই নাই। মনের এই বিকৃতি আমার প্রকৃতিকে পর্যন্ত আড়ষ্ট করে দিয়েছিল; তারই প্রভাবে আমি ইদানীং দুর্নিবার

এক কামনার দৃষ্টিতে তোমাকে লক্ষ্য করতে থাকি—যে দৃষ্টি দিয়ে বহু বছর আগে সেই মেয়েটিকে দেখতাম। ক্রমশঃই আমার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছিল। সাধক বিল্বমঙ্গলের মনেও একদিন এই বিকার এসেছিল, কিন্তু তিনি সেই বিকারকে নষ্ট করবার জন্যে অসীম মনোবল দিয়ে নিজের দুই চোখ নষ্ট করেছিলেন; আমার সে সাহস নেই বলে, চোখ দুটোর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম—এরা আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে, আমার গতি বা গন্তব্য স্থান সেইখানেই। এই হচ্ছে আমার প্রায়শ্চিত্ত দিদি!

নিজের কথা এইখানে শেষ করে এখন তোমার কথাই বলছি। যে রেখা তোমার হাতে উঠছে, তা মিথ্যা বা কাল্পনিক নয়—তোমার পিতা মাতা এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং আছেন। এক মাত্র লালাজীই তাঁদের সন্ধান দিতে পারেন। সেই জন্যেই আমি লালাজীর অভি-ভাবকত্বে তোমাকে রেখে যাচ্ছি দিদি! সে যেমন করেই হোক তোমার পিতা মাতার সন্ধান তোমাকে দেবে। কিন্তু যদি সে দিন সত্যই আসে দিদি, লালাজীকেও তোমায় রক্ষা করতে হবে—ধনে মানে প্রাণে। সে আমার কাছে শপথ করেছে, তোমার নারীত্বের অমর্য্যাদা বা অবমাননা-সূচক কোন কাজই সে কখনো করবে না। সুতরাং লালাজীকে অভিভাবক ভেবে তারই নির্দেশমত তোমাকে চলতে হবে। তবে যদি দেখ, লালাজী বিশ্বাস ভঙ্গ করছে, তখন আমার বিশ্বাস, যে শিক্ষা তুমি আমার কাছে পেয়েছ, তারই আলোকে মুক্তির পথ দেখতে পাবে—মহাশক্তিই তখন তোমাকে শক্তি যোগাবেন।—'যা দেবী সর্ব-ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।' আমিও আশীর্বাদ করে যাচ্ছি—দেবীশক্তি তোমার সহায় হোক।

আশীর্বাদক—তোমার সাধুজী।

চিঠিখানি পড়ে মুখ তুলতেই দেবী দেখল যে, লালাজী নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখোচোখী হতেই তিনি বললেন: শুনেছ বোধ হয়—দাদাজী আশ্রম থেকে চলে গেছেন?

হাতের চিঠিখানি তাঁকে দেখিয়ে গাঢ়স্বরে দেবী বলল : তাঁর এই চিঠি পড়ে এই মাত্র জানতে পেরেছি।

লালাজী জিজ্ঞাসা করলেন : চিঠিতে তিনি কি লিখেছেন, আমাকে বলবে ?

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানি লালাজীর সামনে এগিয়ে দিয়ে দেবী বলল : সে অনেক কথা ; বলার চেয়ে আপনি পড়েই দেখুন কাকাজী।

চিঠি পড়তে পড়তে লালাজীর মনে প্রশ্ন উঠল, দেবী এ চিঠি তাকে পড়তে দিল কেন ? যে সকল কথা দাদাজী তাকে লিখেছেন, দেবীর মত মেয়ের পক্ষে তা অপরকে জানতে দেওয়া ত সঙ্গত নয় ! তবে কি, স্বামীজীর প্রস্থানে দেবী ভেঙ্গে পড়ে তার উপরেই একান্ত নির্ভর করছে ? হঠাৎ চিঠি থেকে চোখ দুটি তুলে বক্রদৃষ্টিতে দেবীর মুখভাব তিনি দেখে নিলেন। কিন্তু সে মুখ আজ অত্যন্ত গম্ভীর, কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

দাদাজীর চিঠি পড়া হলে লালাজী পুনরায় দেবীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন : তাহলে তোমার এখন কি মতলব জানতে পারি ?

তখনই শান্ত ও সহজকণ্ঠে দেবী উত্তর করল : আমি ত আশ্রমের ব্যাপার মোটামুটি জানি। সাধুজীর অবর্তমানে আমি এখন আপনারই সম্পত্তি, যেহেতু আপনিই এখন আশ্রমের সর্বময় কর্তা, তাছাড়া সাধুজীও আমাকে আপনার নির্দেশ মত চলবার জন্য এই চিঠিতে জানিয়েছেন। এখন আমাকে আপনার মন যুগিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আপনিও জানেন যে, সাধুজীর কাছে আমি যতটুকু শিক্ষা সহবৎ পেয়েছি, তাতে আমার মনের গতি বা প্রকৃতি আশ্রমের আর সব মেয়েদের মতন নয়। সুতরাং আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি কাকাজী—আপনি আমাকে কখনই পণ্যের সামিল করবেন না।

লালাজীও দেবীর কথার সংগে সংগে দন্তে জিহ্বা চেপে রাম

নাম স্মরণ করে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন: রাম কহ—রাম কহ। ছো-ছো-ছো! আমি কি তোমার হাল চাল রীতি ঠিক মত জানিনা দেবীমায়ী! স্বামীজী কাল রাতে আমাকেও শপথ করে নিয়েছেন—যাতে তোমার বাপ্-মা'র সন্ধান করে আমি তোমাকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিই।

দেবী এখন লালাজীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশ্ন করল: আপনি কি সত্যই আমার অতীত সম্বন্ধে সব জানেন? কার মেয়ে আমি, কোথায় বাড়ী, কেমন করে আমাকে এখানে চুরি করে আনা হয়েছিল—

দেবীর কথায় এখানে বাধা দিয়া লালাজী অপ্রসন্নমুখেই বলল: ও কথা বল' না দেবী, এখানে কাউকে চুরি করে আনা হয় না, তুমিও ত ভালো করেই জানো—হারানো মেয়েদের সংগ্রহ করে এনেই এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাদের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা দিয়ে তারপর বড় হলে—তারা যাতে সংসার-ধর্ম করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অবশ্য এর জন্য অর্থও যে আমরা উসুল করি না, তা নয়; কিন্তু আমাদের দায়িত্বের তুলনায় সেটা বেশী নয়! এখনো সমাজের অনেক জায়গাতেই আছে, পাত্রপক্ষকে টাকা পণ দিয়ে মেয়ে নিতে হয়।

দেবী বলল: দেখুন, আমি এখানকার হাড়হদ্দ সব জানি—আমাকে ভুল বোঝাবেন না। হারানো মেয়েদের নিয়েই আপনাদের এই আশ্রম; আর এখানে তাদের তৈরী করে বিয়ের বয়স হলে চড়া দামে বিক্রী করাই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু কখনো শুনিনি—কোন হারানো মেয়েকে তার অভিভাবকের সন্ধান করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দেবীর এইরূপ মন্তব্যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েই প্রতিবাদের সুরে লালাজী বলল: তার কারণ হচ্ছে—এমন অবস্থায় হারানো মেয়েরা আমাদের আশ্রমে এসে পড়ে, অভিভাবকদের সন্ধান করা নানা

কারণে সম্ভব হয় না। হারানো মেয়েরা প্রায়ই কয়েক হাত ফিরতি হয়ে তারপর আমাদের হাতে আসে। এর আগেই তারা বাপ মা, দেশভূমির নাম সব ভুলে যায়, অথবা চেষ্টা করে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েরাই যদি কোন পাত্তা দিতে না পারে, আমাদের চেপে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি বল? এই তোমার কথাই বলি—যখন এখানে তোমাকে আনা হয়, বয়স কতই বা হবে, পাঁচ কি বড় জোর ছয় বছর—কিন্তু তোমার মনে কিছু পড়ে? তোমার মত শক্ত ধাতের মেয়ের যদি এ অবস্থা হয়, আর সকলের কথা ত ধর্তব্যই নয়!

এ কথায় দেবীর মুখখানা যেন সহসা বিবর্ণ হয়ে গেল। ক্ষণকাল স্থির ভাবে নিস্তব্ধ থেকে তারপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলে উঠল: দেখুন, আমিও এখন প্রায়ই সেই কথা ভাবি—আগেকার কথা আমার মনে পড়ে না কেন? আপনাদের এখানে হারানো মেয়েরা এলে—তাদের শেখানো পড়ানো আমি দেখেছি; কিন্তু তার আগে প্রথম তু' তিন মাস আপনারা তাদের সংস্রবে কাউকে যেতে দেন না—সেই সময়টা কি যে করেন, আপনারাই জানেন; তবে আমার মনে হয়—মেসমেরাইজ করে তাদের অতীত ভুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা চলে খুব গোপনে। আর এ ব্যাপারে সাধুজী ছিলেন ওস্তাদ মানুষ। কাউকে ঘুম পাড়িয়ে যেমন সাময়িক ভাবে তার মানসিক বা দৈহিক কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়া যায়, যোগনিদ্রা বলে একটা প্রক্রিয়া আছে, তার সাহায্যে মানুষের মন থেকে অতীত স্মৃতি লোপ করে দেওয়া কঠিন নয়! আমি শপথ করে বলতে পারি—আমাকে একান্ত ভাবে আপনার করে নেবার লোভে সাধুজী আমার মত মেয়ের মনের ওপর সেই বিদ্যা প্রয়োগ করেছিলেন। যখনই আমি আমার অতীত সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করেছি, সাধুজী তখনই তাতে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছেন। তবে একথাও আমি বলছি কাকাজী, তাঁর প্রভাবের বাহিরে যখন এসেছি, আমার

ছেলেবেলার যে স্মৃতিকে তিনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, একদিন সে ঘুম তার ভাঙবেই; আর, এখন থেকে সেই স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলাই হবে আমার মনের সাধনা।

এই পর্য্যন্ত বলেই দেবী সহসা থেমে লালাজীর মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। লালাজীও যেন এই রহস্যময়ী মেয়েটিকে আজ আবার নূতন করে জানবার জন্য তার এই ধরণের কথাগুলির ভিতর থেকে কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করছিলেন—তাঁর অবিচলিত দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তির সহায়তায়। এই অবস্থায় দেবী তাঁকে জিজ্ঞাস-ভঙ্গিতে বলল: আমি যে কথা জানতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে, তাতে আপনি বাধা দিলেন বলেই এত কথা আমাকে বলতে হলো। যাক্, এখন আমি আবার সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি কাকাজী—আমার জন্মস্থান, বাপ মা'র কথা, কি ভাবে আমাকে এখানে আনা হয়, এ সব যদি সত্যিই আপনার জানা থাকে—

লালাজী পুনরায় এখানে বাধা দিয়ে বললেন: জানা আমার নেই, তবে জানবার জন্যে দাদাজী আমাকে বিশেষ করে বলেন; তিনিও কিছু কিছু সূত্র আমাকে দিয়ে গেছেন—যেগুলির সাহায্যে তোমার বাপ মা'র সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমি এখনি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে পারব না, আর তুমি আমাকে সে অনুরোধও ক'র না। তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা—তোমার বাপ মা'র সন্ধান আমি করবই, দাদাজীর মত আমিও কথায় জোর দিয়ে বলছি—তোমার বাপ-মা সত্যিই আছেন, আর সন্ধান করে তাঁদের বা'র করবার মত মাল মসলা আমার কাছেই আছে।

দেবী বুঝল, লালাজী এখন তাকে হাতে রেখে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবেন। তার পিতা মাতার বিষয় জানা থাকলেও এখনই জানিয়ে তাকে এত শীঘ্র মুক্তি দেবার পাত্রই তিনি নন। তাই সহজভাবেই তাঁকে জিজ্ঞেস করল: সাধুজীর অবর্তমানে এখন আমার কি কাজ বলুন কাকাজী—আমাকে কি করতে হবে?

লালাজী বললেন : উপস্থিত তুমি তোমার রুটিন মতন কাজই করে যাবে। নিজের জন্য রান্না-বান্না, পড়া-শোনা, ব্যায়াম—সবই চলবে। তবে দাদাজী যখন নেই—সে দিকটা ফাঁকই থাকবে। দু'এক দিন এ ভাবেই ত চলুক, এরপর যদি কিছু বদলানো দরকার হয়, তোমাকে জানানো যাবে। এখন তুমি তোমার কাজ কর, আমার মাথাতেও এখন অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি তাহলে চলি।

তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলেই লালা চলে গেলেন। দেবীও মুখখানা গম্ভীর করে লালাজীর আগের কথাগুলো থেকে তাদের নির্গলিতার্থ বাহির করতে সচেষ্ট হল।

॥ তেইশ ॥

অফিস-ঘরে গিয়েই লালাজী বিঠলদাসের আর একখানি চিঠি পেলেন। তিনি লিখেছেন—ব্যাপার খুব সাংঘাতিক, চিঠি পাওয়া মাত্র উপস্থিত আশ্রমের দরজা বন্ধ করে মজুত মালপত্র নিয়ে দূর দেশে না সরে পড়লে হাতেনাতে ধরা পড়তে হবে। করাচীর কাজের ভার পুলিসের ওপর দিয়ে সিংহ সাহেব আশ্রমের সেই মেয়েটাকে এপ্রুভার খাড়া করে আগ্রায় যাচ্ছেন শীগ্‌গীর। তাঁর আগ্রায় যাওয়া মানেই বৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রম সার্চ করা। তার আগেই সরে পড়বার ব্যবস্থা করা চাই।

চিঠি পড়ে লালাজী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বুঝলেন, সত্যই আর বিলম্ব করলে চলবে না; অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর এই নিষিদ্ধ ব্যাপারের জীবন্ত পণ্যগুলিকে পাচার করতে হবে। কিন্তু এ তো বড় সাধারণ কাজ নয়! ইদানীং পণ্য আমদানীর পথ এক প্রকার বন্ধ হলেও, সঞ্চিত পণ্যগুলি রীতিমত বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে এবং দেশব্যাপী অশান্তি, বিপ্লব ও অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভীতিপ্রদ আবর্ত এই

ব্যাপারে দারুণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এখনই তাড়াতাড়ি আশ্রমের ষোল সতেরটি যুবতী কন্যাকে নিয়ে কোথায় যাবেন, কেমন করে লুকিয়ে রাখবেন? সিন্ধুর পীর পাগোরা ছিলেন এই ব্যাপারের এক দিলদরিয়া গ্রাহক; তুলোট করে তিনি মাল কিনতেন। পাল্লার এক দিকে বসত একটি যুবতী কন্যা, অপর দিকে সোনা রূপার ইট, ভারি ভারি জেবর বা গহনা। সেই মহাজন মাত হয়ে গেলেন সরকারী গোয়েন্দার সন্ধানী চোখের জলুসে! তাঁর তুলনায় তিনি ত নগণ্য প্রাণী! এখন উপায়?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চিন্তার প্রবাহ চলল, কিন্তু উপায় কিছুই স্থির হল না। এমনই সময় স্থানীয় ডাক পিয়ন কলিকাতা ডাক অফিসের ছাপ মারা একখানা লম্বা লেফাফা ডেলিভারি দিয়ে গেল। খামের উপরে বড় বড় ইংরাজী হরফে প্রতিষ্ঠানের নাম ছাপা—অল ইণ্ডিয়া এনটারটেনমেণ্টস বুরো। খাম থেকে চিঠি খুলে লালাজী সর্বাগ্রে প্রেরকের নামটি পড়লেন—অবিনাশ সরকার। অমনি আনন্দে তাঁর ম্লান মুখমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল—'আরে, সরকার সাহেব…এ ব্যাপারের আর এক দিলদার কাপ্তেন…বড় দরের ব্যাপারী…য়্যাদ্দিন পরে হঠাৎ তিনি…য়্যাঁ!'…সংগে সংগে রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়ে ফেললেন। সত্যই শ্রীরামচন্দ্রজী তাঁর প্রতি সদয় হয়ে হাতে হাতে বাঁচবার উপায় বাতলে দিয়েছেন! সরকার সাহেবের চিঠির মর্ম্ম হচ্ছে: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গড়িয়ে বাঙলা দেশের কলিকাতায় এসেছে। তাই এইখানে বসেছে মহাযুদ্ধের মস্ত ঘাঁটি। পূর্বে সরকার সাহেব নানাস্থানে কার্ণিভ্যাল খুলে আমোদ-প্রমোদের কারবার করতেন, এখন লাখো লাখো নানা-দেশী পল্টনের চিত্তবিনোদনের জন্য আমোদ-প্রমোদ প্রদর্শনের ভার নসীবের জোরে তিনিই পেয়েছেন।

উপরওয়ালাদের সঙ্গে চুক্তি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে চাহিদা হচ্ছে—নাচ জানা, সুদর্শনা, হাসি খুসি মেয়ের ঝাঁক। তাই

সরকার সাহেবের লোকেরা সেকেলে আড়কাটির মত তামাম হিন্দুস্থানে আমুদে মেয়েদের সন্ধানে ঘুরছে; একটি দুটি নয়—এক শত, দুই শত, সহস্র—যত পাওয়া যায়! টাকার কথা এখানে তুচ্ছ। সুতরাং লালাজীর বৃন্দাবনের আড়তে বারো তেরো বছরের উপরে যতগুলি মাল আছে গাড়ী-বন্দী করে দিলেও আপত্তি নেই। সরকার সাহেবের এখন নিশ্বাস ফেলবারও সময়ের অভাব—নতুবা তিনি নিজেই মাল গস্ত করতে আসতেন। এ অবস্থায় মিঃ সরকার পুরাতন বন্ধু লালাজীর উপর ভার দিচ্ছেন—এই পত্র টেলিগ্রাম স্বরূপ মনে করে অবিলম্বে একটি চালান পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি মালের সঙ্গে স্বয়ং এলে লেন-দেন পাকা হয়ে যাবে ইত্যাদি।

এ হেন প্রস্তাব অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ায় লালাজীর সকল দুশ্চিন্তা ও দারুণ একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তিনি জানতেন, সরকার সাহেব সরকার-ঘেঁসা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কার্ণিভ্যাল চালাবার সময় অনেকগুলি মেয়ে তিনি আশ্রম থেকে সওদা করে নিয়ে যান, এবং দরের সম্বন্ধেও তিনি খুব দিলদরিয়া। এখন তিনি সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত পলটনের ঘাঁটি আছে, সেখানকার জঙ্গীদের মনের খোরাক যোগাবার সরবরাহকার! স্পষ্টই ত লিখেছেন —দুটি একটি নয়, দু'শো পাঁচশো হাজারো সওদার চাহিদা সেখানে।

সেইদিনই আশ্রমের মধ্যে ঘোষণা জারি হল যে, লালাজী সকলকে নিয়ে দেশ পর্যটনে বেরুবেন। সিদ্ধাশ্রমের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রত্যেককে গৈরিকবসন ব্যবহার করতে হবে—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদর্শে সর্বত্র হরিনাম সঙ্কীর্তন করবেন আশ্রমের মেয়েরা। ফলে আশ্রমে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

ওদিকে বড় বড় ট্রাঙ্কের মধ্যে লালাজীর অস্থাবর সম্পদ সমূহ ভরে তালা বন্ধ করা হল। ট্রাঙ্কের উপর মোটা মোটা হরফে লেখা হল—শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তন সম্প্রদায়। বহনযোগ্য যাবতীয় দ্রব্য এবং দীর্ঘকালের সঞ্চিত খাতাপত্র বাক্সবন্দী হয়ে ষ্টেশনে প্রেরিত হল।

লালাজী জানতেন, কৈফিয়ৎ দেবার মত একজনমাত্র এই আশ্রমে আছে—কিছুই যার লক্ষ্য এড়ায় না; সে হচ্ছে দেবী। অষ্টাদশী এই মেয়েটির সংগে বুদ্ধির সংগ্রামে কিম্বা বিতর্কে লালাজীর মত চৌখস ব্যক্তিকেও হিমসিম খেতে হত। তাই দেবীর নিকট হতে প্রশ্ন আসবার পূর্বেই তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দেবীর জন্যই তাঁহাকে বাংলা দেশে সফর করতে যেতে হচ্ছে। যেহেতু, দেবী বাংলা দেশের মেয়ে। কিন্তু তাঁরা যে বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতায় যাচ্ছে, একথা দেবী ভিন্ন এখনো অন্য কেউই জানেনা এবং দেবীকেও শেষে চুপি চুপি বলেছেন যেন কথাটা চেপে রাখে।

দেবী তার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুধু লালাজীর পানে চেয়ে কথাগুলি শুনছিল, কিন্তু কোন কথা বলে নি। বাংলা দেশের মেয়ে সে, কলিকাতায় চলেছে, এটা ত তার পক্ষে আনন্দের কথা। কিন্তু দেবী লালাজীকে ভাল করেই চেনে; লালাজীর ঘোষণা সত্য, তিনি আশ্রমের তরুণীদের নিয়ে দেশ পর্য্যটনে চলেছেন। কিন্তু এই পর্যটনের আসল উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে দেবীর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—সেইজন্যই লালাজীর মুখের উপর বদ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে সত্যের সন্ধান করতে হয়। সে যাই হোক, দেবী কোন প্রতিবাদ না করায়, তার নীরব ভংগিই সম্মতির লক্ষণ বুঝে লালাজী জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কিছু বলবার আছে দেবী?

অবিচলিত কণ্ঠে দেবী বলল—সাধুজীর চিঠি ত আপনি পড়েছেন। চিঠিতে জানাবার আগেই আমি তাঁর মনের পাপ ধরে ফেলেছিলাম। নিজেই তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়ে পড়েছেন জেনে আমি যে কত শাস্তি পেয়েছি, আর আমার দায়িত্ব যে কত কমে গেছে, আমি তা মুখে জানাতে পারব না কাকাজী! পাপ করলেও যাঁদের চিত্তে প্রায়শ্চিত্ত-পিপাসা জাগে, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। তাই আমি সাধুজীর প্রত্যেক কথাটি আদেশ মনে করে মেনে চলব। আপনি ত জানেন, পত্রের শেষের দিকে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এখন

থেকে আপনাকে অভিভাবক মনে করে আমাকে চলতে হবে —আপনার প্রত্যেক নির্দেশ মেনে। এর পর আমার আর বলবার কি থাকতে পারে বলুন কাকাজী? এখন আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার কথা মত চলা ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই। হ্যাঁ, তবে আপনি যদি সে বিশ্বাস ভংগ করেন, তাহলে তখন আমার কি কর্তব্য—সে কথাও ত সাধুজী আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এ কথার পর লালাজী গম্ভীর মুখে বললেন : আমি এই কথাই জানতে চেয়েছিলাম—তোমার কথা শুনে সন্তুষ্ট হলাম। তোমার দিক দিয়ে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।

॥ চব্বিশ ॥

তাড়াতাড়ি উদ্যোগ পর্ব শেষ করে তৃতীয় দিনে লালাজী সদলবলে রওনা হলেন। বৃন্দাবন ষ্টেশনে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করে কয়েক মাইল দূরবর্তী মেন লাইনের আগ্রা ষ্টেশনে লরি যোগে ভারি ভারি বাক্সগুলি পাঠিয়ে লগেজ করানো হল। সম্প্রদায় সঙ্গে নিয়ে লালাজীও ঐ ভাবে গভীর রাত্রিতে আগ্রায় রওনা হলেন। পূর্ব হতেই তুফান মেলের একখানি কামরা সম্প্রদায়ের জন্য রিজার্ভ করা ছিল।

ওদিকে সরকার সাহেবকেও টেলিগ্রাম করা হল—নির্দিষ্ট ট্রেণ হাবড়ায় পৌঁছবার সময় তিনি যেন স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। আশ্রমের ফটকে তালা লাগিয়ে এমন সতর্কতার সঙ্গে লালাজী এত বড় একটা সম্প্রদায় নিয়ে সরে পড়েন যে, বাইরের কেউ কিছু জানবারও সুযোগ পেল না।

কিন্তু পরদিন প্রত্যূষেই রীতিমত তোড়জোড় করে বহুসংখ্যক পুলিস প্রহরীর আবির্ভাবে শ্রীবৃন্দাবনের বাসীন্দারা ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তখন প্রকাশ পেল যে, সিদ্ধাশ্রম পুলিস বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়েছে

কিন্তু আশ্রমের ফটকে বড় বড় তালা ঝুলছে। এ অবস্থায় সকলেই বুঝলেন যে, পুলিস খানাতল্লাস করতে আসছে কোন প্রকারে এ খবর পেয়ে আশ্রমের অধ্যক্ষ লালাজী রাতারাতি সকলকে নিয়ে ফটকে তালা লাগিয়ে সরে পড়েছেন।

ভারত সরকারের গুপ্ত তদন্ত বিভাগের অফিসার সিংহ সাহেবের পরিচালনাধীনে আগ্রা পুলিস সিদ্ধাশ্রম খানাতল্লাস ও সীজ করতে আসেন। তাঁর ধারণা যে, একান্ত তৎপরতার সংগেই তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু তৎপূর্বেই যে পাখীর ঝাঁক উড়ে যাবে, এটা সত্যই অদ্ভুত ব্যাপার! যাই হোক, তিনি স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিদের সমক্ষে ফটকের তালা ভেঙ্গে সকলকে সংগে নিয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করলেন খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সমস্ত আশ্রম তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাস করা সত্বেও এমন কোন নিদর্শনই পেলেন না মিষ্টার সিংহ যেটি একজিবিট স্বরূপ কোন অপরাধমূলক অভিযোগ প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এত বড় একটা বিস্তীর্ণ আশ্রম মধ্যে পুরুষ বাসীন্দাদের বসবাসের নানা নিদর্শন পাওয়া গেলেও, তাদের হাতে লেখা এক টুকরা এমন কোন কাগজ মিলল না, যা থেকে কারও নাম বা কোন খবর পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য এই যে, নারী বেসাতি-সম্পর্কে কোন হদিস পাওয়া ত বড় কথা, তাদের বসতি সংক্রান্ত কোন আভাসই পুলিস পেল না। এমন কি, সাড়ী সায়া সেমিজ ব্লাউজ প্রভৃতির এমন কোন অংশ, চুল বাঁধবার দু'-এক টুকরা ফিতা, কিম্বা দু' একটা মাথার কাঁটা পর্য্যন্ত কোথাও পড়ে নেই। আনন্দ স্বামী যে দিকে থাকতেন, সেই অংশে আশ্রমের পাঠাগার। তার রুদ্ধ দ্বারেও তালা ঝুলছিল। তালা ভেঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করে সিংহ সাহেব দেখলেন—সারি সারি অনেকগুলি আলমারী, প্রত্যেকটি বিবিধ গ্রন্থে পূর্ণ। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় লিখিত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত সংক্রান্ত বহু দুষ্প্রাপ্য

গ্রন্থের সমাবেশ। একটি আলমারীর মধ্যে যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। আর একটির ভিতর হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্র। কিন্তু এখানেও কোন পুস্তকের মধ্যে কোন ব্যবহৃত কাগজ পত্র মিলল না, পুস্তকের মলাটে 'সিদ্ধাশ্রম—শ্রীবৃন্দাবন' ভিন্ন আর কিছু লেখা নেই।

আশ্রমের প্রান্ত দেশে গুহার মত একটি স্থানে সিংহ সাহেবের দৃষ্টি পড়ল। প্রথম দর্শনে মনে হয় না যে, এদিকে কোন গৃহ আছে। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিতে এই গুহাপথেই যে ঘরখানি প্রকাশ পেল, সেইটিই লালা লছমনজীর নিভৃত কক্ষ। এখানে একখানি তক্তপোষের উপর একটি ডেক্স দেখা গেল। তক্তপোষখানির উপর থেকে আচ্ছাদনী বস্ত্রখানি তুলে নেবার নিদর্শন রয়েছে; দেওয়াল থেকে ছবি এবং ঘরের দ্রব্যাদি চলে গেছে; কিন্তু শিশু কাঠের পালিশ করা সুশ্রী ডেক্সটির গায়ে চাবির রিঙটি ঝুলছে। সম্ভবতঃ তাড়াতাড়িতে চাবিটি ডেক্স থেকে খুলে নেওয়া হয় নি। লালবিহারী সিংহের দুই চক্ষু এতক্ষণে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডেক্সের ডালাটি তুলতেই সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন—পোষ্ট অফিসের ছাপ-মারা কয়েকখানি খামে ভরা চিঠি একটি লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা অবস্থায় রয়েছে! এ অবস্থায় বুঝতে তাঁর বিলম্ব হল না যে, অতিবড় সতর্ক আশ্রম-চালকের যত কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এই ডেক্সেই থাকত। আর সব কাগজ পত্র সংগ্রহ করে চিঠি কয়খানি ফিতায় বেঁধেছিলেন—কিন্তু সে বাধনটি আর ডেক্স থেকে তুলে ডেক্সের চাবিবন্ধ করা হয় নি। সামান্য একটু ভুলে অত্যন্ত হিসেবী মানুষদেরও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে থাকে!

চিঠির এই তাড়াটির মধ্যে করাচী থেকে দালাল বিঠলদাসের সাবধানী চিঠিগুলির সঙ্গে কলিকাতা থেকে লেখা অবিনাশ সরকারের পত্রখানিও ছিল।

এতক্ষণ পরে সিংহ সাহেবের মুখ উৎফুল্ল হল—এইখানেই খানাতল্লাসী শেষ করে তিনি সদলবলে আগ্রা রওনা হলেন।

সিদ্ধাশ্রম স্থানীয় পুলিসের হেফাজাতে রইল।

॥ পঁচিশ ॥

কলিকাতায় এখন যুদ্ধের ঘাঁটি বসেছে। চৌরঙ্গী অঞ্চল নানা দেশের সৈনিকে ভরে গিয়েছে। পরদেশী যোদ্ধাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষকে মুক্ত হস্তে অর্থ ঢালতে হয়েছে। মিঃ সরকার এসব ব্যাপারে করিৎকর্মা লোক—সামরিক বিভাগের কর্তাদের সহিত এই সর্তে চুক্তি করেছেন যে, আমোদ প্রমোদ দেখাবার যা কিছু ব্যবস্থা তিনিই করবেন। ঐ জন্যে নানা দেশের ও সমাজের রূপসী তরুণীদের সংগ্রহ করতে হ'য়েছে তাঁকে। নাচ গান হাসি কৌতুক ম্যাজিক প্রভৃতির মহলা ব্যাপারে মেয়েগুলিকে তালিম দিয়ে তৈরী করে নেওয়া হয়। মিঃ সরকার খুব জাঁক-জমকে থাকতে অভ্যস্ত। মোটর ছাড়া পথ চলেন না, তাঁর ফ্লাটে চাকর চাপরাশি দারোয়ান বাবুর্চ্চি আয়া প্রভৃতি গিস্ গিস্ করছে।

মালতীর মা ইন্দিরা দেবীর মুখে মিঃ সরকারের সুখ্যাতি ধরে না। বলেন—হ্যাঁ, একেই বলে মানুষ—আসতে না আসতেই পাড়া গুলজার; যেন কোথাকার কোন্ রাজা এল—দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।

হরপ্রসাদ সে কথা শুনে বলেছিলেন—বটেই ত! সাহেব সেজে এসেছে, হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, মোটর, লোকজন—শ্রদ্ধা ত হবারই কথা!

হরপ্রসাদ নিজেই উদ্যোগী হয়ে নরেনকেও তাঁর এই নতুন ভাড়াটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মিঃ সরকার নরেনের পরিচয় পেয়ে বলেন—আর্টিষ্ট নিয়েই ত আমার বিজনেস; কত আর্টিষ্টকে যে পুষছি তার ঠিক ঠিকানা নেই! যাবেন একদিন আমার চৌরঙ্গীর চেম্বারে, দেবেন একটা পিটিসন—আপনার নামটাও এনলিষ্ট করে রাখব।

নরেন সবিনয়ে বলেছিল—আপনার অনুগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু চাকরী আমার ধাতে পোষাবে না।

ইন্দিরা দেবী কিন্তু ওপর-পড়া হয়ে মিঃ সরকারের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেন, মালতীর কথা তুলে তার বিদ্যা ও নাচ-গানের খ্যাতি শুনিয়ে সাহেবকে সচকিত করে তুলেন। সাহেব বলেন—একদিন এসে আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে যাবো!

সে আলাপ—সেদিন নরেনের কক্ষ হতে ফিরবার সময় যে ভাবে হয়ে যায় সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

লালাজী তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তন সম্প্রদায় সহ হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে নামবার পূর্বেই গাড়ীর গবাক্ষ থেকে দেখলেন—সরকার সাহেব লোকজন নিয়ে তাঁদের প্রতীক্ষা করছেন। লালাজী বাবাজী সেজে কলিকাতায় আসলেও, সরকার সাহেবের চোখে ধাঁধা লাগাতে পারেন নাই। গাড়ী হতে নামতে নামতে দুই সাঙাতে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। পরক্ষণে লালাজীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে সরকার সাহেব খুব সংক্ষেপে তাঁদের এই ব্যাপারের যে আভাসটুকু দিলেন, তাতে লালাজী বুঝলেন যে, গোবিন্দজী তাঁকে সময় বুঝে ঠিক জায়গাতেই এনে ফেলেছেন। সরকার সাহেব হচ্ছেন তাঁর পুরাতন বন্ধু, তার উপর শাঁসালো খরিদদার—এখন আবার সরকারের ঠিকাদার হয়েছেন মজলিসী ব্যাপারে। তাঁর হাতে আছে মস্ত এক বাড়ী, তার গায়ে প্রকাণ্ড বাগান, তাঁবে আছে অনেক লোকজন। সুতরাং এখানে লালাজী তাঁর দলবল নিয়ে সচ্ছন্দে থাকতে পারবেন, আর যে সব মাল এনেছেন, সরকার সাহেব এক নজরে দেখেই বলেছেন যে, বিস্তর টাকা মিলবে। এসব ছাড়াও, তিনি আশ্রম হতে যে বিপুল ধনসম্পদ এনেছেন, সেগুলি নিরাপদে রক্ষা করাই এখন মস্ত কথা।

সরকার সাহেবের আশ্রয়ে থাকলে ছুই দিকই বজায় থাকবে এবং সেখানকার পুলিসের পক্ষে এখানে এসে সন্ধান করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং লালাজী খুসী মনেই সরকার সাহেবের আতিথ্য স্বীকারে সম্মত হলেন। তাঁকে অতঃপর আর কিছুই দেখতে হল না— সরকার সাহেবের লোকজন মালপত্র থেকে আরম্ভ করে দলের সকলকেই একখানি প্রকাণ্ড বাসে তুলে বালিগঞ্জের প্রমোদ-নিকেতনে নিয়ে গেলেন। লালাজী সরকার সাহেবের মোটরে উঠে আলাপ করতে করতে চললেন।

বালিগঞ্জ অঞ্চলের একাংশে প্রকাণ্ড একখানা বাগানবাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। যুদ্ধের হিড়িকে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ হতে এই বাড়ী লীজ নিয়ে আগাগোড়া সংস্কার করে সুচারুরূপে সাজিয়ে মানিয়ে এখন তাকে বিভিন্ন শ্রেণীর মিলিটারী অফিসারদের প্রমোদ-শালায় পরিণত করা হয়েছে। যুদ্ধের পুর্বে সরকার সাহেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কার্ণিভ্যাল খুলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। কিন্তু ইংরেজসরকার আইন করে কার্ণিভ্যাল বন্ধ করে দেবার পর মিঃ সরকার মাথা খেলিয়ে যুদ্ধের মরশুমে যোদ্ধাদের অবসর কালে মনের রসদ সরবরাহের ঠিকাদারী যোগাড় করে মস্ত এক আড়ৎ খুলে বসেছেন। মিলিটারী ঘাঁটিগুলিতে শুধু রেসন বা খাদ্য সরবরাহ করেই কর্তৃপক্ষের কর্তব্যের সমাপ্তি নেই; অবসরকালে তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা করতে হয়—এটা হচ্ছে তাদের মনের খোরাক। এই খোরাক সরবরাহ করবার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মিঃ সরকার। কার্ণিভ্যালের কারবারে ভাড়া করা রূপ-জীবিনীদের সাহায্যে নিম্ন শ্রেণীর বিবিধ আমোদ-প্রমোদ দেখিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাতেই তাঁর প্রচেষ্টা অনেকটা সার্থক হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে বিভিন্ন জাতির নওজোয়ানগণ এই মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন; কলিকাতা হয়েছে যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি। বিভিন্ন দেশ ও জাতির যোদ্ধৃবর্গ মহানগরী কলকাতায় সমবেত

হয়েছেন। তাদের তুষ্টি-সম্পর্কে কোন্ শ্রেণীর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা বিশেষভাবে লোভনীয়, সরকার সাহেব ভালভাবেই তাদের তালিকার সঙ্গে পরিচিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর আবির্ভাব আমাদের দেশের সততা সত্যনিষ্ঠা সাধুতা সহৃদয়তা প্রভৃতি মানবীয় কোমল বৃত্তিগুলি উৎখাত করে বেপরোয়াভাবে যে সকল দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠা দেয়, তাদের মধ্যে ভদ্রসমাজে অবাঞ্ছিত কদর্য্য আমোদ-প্রমোদও একটি রুচিহানিকর ব্যাপার। শঠতা, নৃশংসতা, অতি লোভ, সর্ব্বগ্রাসী স্পৃহা, অনাচার, কালোবাজারী মুনফা প্রভৃতির মত এই উদ্দাম প্রমোদ-ব্যাপারটিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্নীতিমূলক আমদানি। এই প্রমোদ-স্পৃহা মানুষের প্রবৃত্তিকে নরকে নামিয়ে দেয় এবং সভ্য মানব-মনের লজ্জা ও শালীনতাকে পঙ্গু করে ফেলে। বিদেশী এজেন্টরা এই সব দুর্নীতির প্রবর্তক হলেও, এদেশের মুনাফালোভী দালালরা এর মধ্যে ভাগ্যোদয়ের সুযোগ-সন্ধান পেয়ে নেচে ওঠে এবং চোখের চামড়া তুলে ফেলে কোমর বেঁধে তাদের দালালী করতে লেগে যায়। এরাই পণ্যমূল্যে নারীর লজ্জাকে ক্রয় করে বুঝিয়ে দেয় যে, যুদ্ধের দৌলতে যে সুযোগ এসেছে, আর তা আসবে না। লজ্জাবতী লতা সেজে ঘরের কোণে বসে থাকলে এক মুঠি ভাতও জুটবে না, যে রূপ-যৌবন বিধাতা দরাজ-হাতে দিয়েছেন—সে-সব অনাহারে শুখিয়ে ঝরে পড়বে। কিন্তু বিধিদত্ত এই রূপ-যৌবনের বাহার দেখিয়ে আঁচলা ভরা টাকা আনতে দোষ কি?

বনে হাতী ধরবার সময় ফাঁদ পেতে শিকারীরা পোষা হাতী ছেড়ে দেয়, তারাই হস্তীযুথকে ভুলিয়ে গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলে। এখানেও সরকার সাহেবের মত প্রমোদ-ব্যাপারীরা রূপসী বাক্‌পটীয়সী নারী-[illegible] সহায়তায় ভদ্রঘরের নারীদের লজ্জার আবরণ মোচন করে স্বার্থসিদ্ধি করে। পায়ের স্যাণ্ডেল থেকে, মাথার চুলের ফিতা কাঁটাটি পর্যন্ত বাড়ীতে বয়ে নিয়ে গিয়ে সযত্নে

সাজিয়ে দেয়; তার পর বেড়াবার অছিলায় একটিবার মঞ্চে এনে বসালেই সেদিনের মত ছুটি, ফেরবার সময় অঞ্চলেও কিছু না কিছু বেঁধে দেওয়া হয়, সাজসজ্জাগুলি উপরিলাভ—তবে সর্ত থাকে যে, দিনান্তে অপরাহ্ণের দিকে প্রমোদ-মঞ্জিলে একবার বেড়িয়ে যাওয়া চাই-ই!

বলা বাহুল্য, বেড়াতে এসেও লাভ কি কম? মঞ্চে গিয়ে দর্শকমহলকে একবার দর্শন দান করবার পর জলযোগের হল-ঘরে না এলেই নয়—চা, কাফি, কোকো, কেক, চপ, কাটলেট—প্রভৃতি রুচিকর খাদ্যসম্ভার···সরকার সাহেব স্বয়ং হাসিমুখে প্লেট এনে সামনে ধরেন। তাঁর মত লোকের অনুরোধ রাখতেই হয়···লজ্জার বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। সুখাদ্য চর্বণের সংগে সরকার সাহেবের কথাগুলি যেন কর্ণে সুধাবর্ষণ করে···দেখুন, এই যুদ্ধ এসেছে এক শ্রেণীর লোককে পিষে ফেলতে, আর এক শ্রেণীর লোক এই যুদ্ধের দৌলতে গভর্ণমেণ্টের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ সংস্থান করে নিচ্ছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, কলকাতায় যুদ্ধের ঘাঁটি বসেছে। বড় বড় জাঁদরেল অফিসার সব এখানে জমেছে। আমার ওপর ভার পড়েছে তাদের সামনে আমাদের দেশের আমোদ-আহ্লাদ সব দেখানো। এর জন্যে কর্তারা দেদার টাকা ঢেলেছেন। এখন আমার ইচ্ছা কি জানেন, যাঁদের অবস্থা সচ্ছল নয়, ইচ্ছা থাকলেও ভাল কাপড় জামা পরতে পারেন না, কোথাও বড় একটা বেরুনো হয়ে ওঠে না—তাঁদের কিছু না কিছু উপায় করে দিই! ভাল ভাল জামা কাপড়, অল্প-সল্প কিছু কিছু বা গহনাপত্র পাঠালুম, সেজেগুজে তাঁরা এলেন, মঞ্চে গিয়ে একটু বেড়ালেন, যাঁর গান জানা আছে—একখানা গানই বা গাইলেন—বাস্, তাহলেই হলো। ওঁরাও খুসী হন, আপনারাও কিছু না কিছু দক্ষিণা আঁচলে বেঁধে নিয়ে বাড়ী যান। দু'চার দিন এমনি আসা যাওয়া করতে করতে সাহস বেড়ে যাবে, তখন দেখবেন—যিনি গান জানেন না,

শিখে নেবেন; নাচবার জন্যে অনেকের পা তখন চুলবুল করবে। তার মানে—এ সবের জন্যে আলাদা দক্ষিণার বরাদ্দ আছে।

এই ভাবে অভাবগ্রস্ত ভদ্রঘরের নারীদের প্রলুব্ধ করে এই শ্রেণীর দালালরা বিষের বীজ ছড়াতে থাকে। যে সব মেয়ের মনের জোর থাকে, দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখবার মত সামর্থ্য রাখেন, তাঁরা এসব প্রলোভন কাটিয়ে সরে যান; অনেক স্থলে অভিভাবিকাদের দৃঢ়তায় দালালদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়—প্রেরিত উপহার-সামগ্রী পদদলিত অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে এরা স্থান-কাল পাত্র-পাত্রী বুঝে এমন কৌশলে প্রলোভন-জাল পেতে বসে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানুষের সৃষ্ট অভাব-অনটন তাদের ধৈর্য ও সংযমের আবরণ শতচ্ছিন্ন করে দেয়···ক্রমে ক্রমে এরাই প্রমোদ-ব্যাপারের পণ্যে পরিণত হয়।

প্রমোদ-মঞ্জিলের একটি নিভৃত মহল্লা লালাজীকে ছেড়ে দিয়েছেন সরকার সাহেব। পাঁচখানা বড় বড় ঘর, গোসলখানা, পাকশালা, প্রাঙ্গণ, প্রচুর স্থান। ঘরে ঘরে বিজলির আলো, পাখা। প্রত্যেক ঘর সুসজ্জিত। লালাজী ও সম্প্রদায়ভুক্ত আর সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল; দেবী একাই বিষণ্ণ। অবশ্য লালাজীর সংস্রবে এলেই মুখের উপর উল্লাসের একটা কৃত্রিম আবরণ তাকে টেনে দিতে হয়। কেননা, কথা বাড়াতে সে একেবারেই নারাজ। তবে ম্রিয়মান দেখলেই লালাজী হয়ত প্রশ্ন করে বসবেন—সবাই উৎফুল্ল, একা দেবীর মনে বিষাদ কেন? আসল কথা, ষ্টেশনে অবিনাশ সরকারকে দেখে অবধি দেবী খুসী হতে পারে নি। চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভিতরটা দেবী পুস্তকের মত পড়তে অভ্যস্ত হয়েছে। বছর কয়েক পূর্বে সিদ্ধাশ্রমে অন্তরাল থেকে এই লোকটিকে দেবী দেখেছিল। সেই সময় আশ্রমের তিনটি মেয়েকে সরকার সাহেব সঙ্গে করে নিয়ে যান দেবী সেদিন সাধুজীকে বলে—জানেন সাধুজী, তিনটে মেয়ে আজ এখান থেকে খসে গেল—এদের বরাতে কি আছে, কে জানে!

স্বামাজী পরিহাসের সুরে বলেন—ওদের বরাতে বিয়ের ফুল ফুটেছে বোধ হয়! তাই নিয়ে গেল।

দেবী এ কথার উত্তরে বলল—ও কি মানুষ, যে বিয়ে করবে! ওটা হচ্ছে খোক্কোস—তিনটে মেয়ের রক্ত চুষে খাবে। কি বলব, কাকাজী রাগ করবেন, নৈলে আমি ওকে দাণ্ডা পিটে টিট করে দিতাম।

যারাই সিদ্ধাশ্রমে এসে মেয়ে নিয়ে যেত, তাদের উপর দেবীর ক্রোধের অন্ত থাকত না; সেদিনের সেই লোকটিকে ষ্টেশনে দেখে এবং সেই লোকের আশ্রয়ে এরা চলেছে শুনে, দেবী তার মনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ওদিকে ষ্টেশনে একবার মাত্র বিদ্যুৎ ঝলকের মত দেবীকে দেখেই সরকার সাহেব চমৎকৃত হলেন। কি আশ্চর্য শত সহস্র নারী নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলে আসছেন, কিন্তু এই প্রথম এমন একখানি মুখ তিনি দেখলেন, কারও সংঙ্গে যার তুলনা হয় না।

গাড়ীতে উঠেই সরকার লালাজীকে জিজ্ঞেস করেন: সেবার আশ্রমে গিয়ে আপনার এই দেবী মেয়েটিকে ত' দেখিনি! নতুন আমদানি নাকি?

লালাজী বললেন: নতুন নয়, সে সময় স্বামীজী ওকে নিজের কুঠীতে আগলে রাখতেন—বাইরের লোক ওখানে গেলে মিশতে দিতেন না। স্বামীজী ওকে গল্পের দেবী চৌধুরাণী করতে চেয়েছিলেন! মেয়েটি সত্যই অসাধারণ।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সরকার বলেন: তাই নাকি! তাহলে এখনই বলে রাখছি—সবদিক দিয়ে চৌখস্ এমনি একটি অসাধারণ মেয়েই আমার দরকার, মোটা রকমের একটা দাঁও মিলবে।

ম্লান মুখে লালাজী উত্তর করেন: কিন্তু ওটি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিষিদ্ধ ফল। দেবার উপায় নাই, স্বামীজীর গচ্ছিত মাল কিনা! তাহলে ওর ব্যাপারটা বলি শুনুন—

লালাজী তখন দেবীর কাহিনীটি ঢেকে রেখে—যতটুকু যেভাবে বলা উচিত, সংক্ষেপে অবিনাশ সরকারকে শুনিয়ে দিয়ে, এই বলে প্রসঙ্গটির উপসংহার করলেন যে, স্বামীজী যাবার সময়ও আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন—যেমন করেই হোক ওর বাপের সন্ধান করে ফিরিয়ে দিতে হবে।

সরকার সাহেব সহাস্যে বললেন : বেশ ত', বাপকে ত' মেয়ে চেনে না ; বাপ একটা খাড়া করতে কতক্ষণ ! সে ভার আমিই নিলাম লালাজী, আপনি নিশ্চন্ত থাকুন।

সম্প্রদায় বালিগঞ্জের বাগান বাড়ীতে এলে সরকার সাহেব নিজেই হামরাই হয়ে স্বতন্ত্র মহলের, বিশেষ করে, লালাজী ও দেবীর জন্য আলাদা আলাদা দু'খানি সুসজ্জিত ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়ে দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন : স্বামীজীর মত সসম্মানে তুমি আশ্রমে আলাদা ঘরে থাকতে, তাই তোমার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছি। ঘরখানা পছন্দ হয়েছে ত' ?

দেবী জিজ্ঞেস করল : আপনি কি করে জানলেন যে আমি ওখানে সসম্মানে আলাদা ঘরে থাকতাম ?

লালাজী এই সময় সরকার সাহেবের পরিচয় দিয়ে দেবীকে বললেন : মিঃ সরকার অনেকদিন থেকেই আমাদের আশ্রমের সংস্রবে আছেন। আপদে-বিপদে অনেক উপকার করেন। ভারি লায়েক আদমী, আর দেখছ ত'—এখানে ওঁর কি রকম বোল বোলাও। সরকার সাহেবকে তুমি যেন পর মনে কর না দেবী !

সরকার সাহেবও লালাজীর কথার পীঠে বললেন : তোমার যখন যা দরকার হবে, তখনি আমাকে বলবে। এ বেলা একটু জিরিয়ে নাও, বিকেলে তোমাকে কলকাতা সহরটা ঘুরিয়ে আনব।

দেবী বলল : আমার দরকার কিছুই হবে না। নিজের হাতে আমি রেঁধে খাই। আমার সংগে সে সবই এসেছে ! ফুরালে বলব বইকি ! আর সহর দেখবার কথা বলছেন—যখন এসেছি, দেখা

হবেই। আমরা সবাই একদিন এক সংগে কালীঘাটে গিয়ে মা মহামায়ীকে দর্শন করব, তাহলেই সব দেখা হবে।

দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য ও আকৃতি শুধু নয়, তার কথা বলবার বাঁধুনি, কথার সুর ও ভঙ্গির স্বাভাবিকতায় সরকার সাহেব এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, নারীর সংস্রবযুক্ত তাঁর কর্মময় জীবনে কখনও এমন কাণ্ড ঘটেনি। তিনি ভেবে স্থির করতে পারেন না, এ মাদকতা মেয়েটির রূপে, স্বাস্থ্যে, কিম্বা তাহার কণ্ঠের অবিচলিত সুরে ও স্বরে ?

দেবী কিন্তু দেবী-দর্শনের কথা বলেই তৎক্ষণাৎ সে স্থান থেকে উঠে চলে গিয়েছিল কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই। অবিনাশ সরকারের আশা ও আকাঙ্ক্ষা তখনও চরিতার্থ হয় নি—আর একবার দেবীকে দেখতে এবং তার মুখের তীক্ষ্ণ মধুর কথা শোনবার আশায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।

কিন্তু দেবীর দর্শন মিললনা। দলের একপাল মেয়ে তখন তাদের থাকবার স্থান নিয়ে কলরব তুলেছিল। দেবী শুনতে পেয়ে, নিজের ঘরের কাজ ফেলে তাদের উদ্দেশ্যে ছুটল। দেবীকে দেখবামাত্র কোলাহল থেমে গেল। দেবী বলল ঃ একটা কথা সকলে মনে রেখ—আমরা এখন অন্যের বাড়ীতে অতিথি। যা দিয়েছেন বা দেবেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কথায় আছে না—ভিক্ষের চাল হাসি মুখে নিতে হয়, সে চাল সরু কি মোটা, কাঁড়া কি আঁকাড়া—সে বিচার যে করে তাকে বলতে হয় আহাম্মুখ। তাই কথা আছে—ভিক্ষের চাল কাঁড়া আঁকাড়া। আমি তোমাদের জায়গার সব বিলি-ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—সেই জায়গায় যে যার বিছানা পেতে ফেল।

অবিনাশ সরকার সন্নিহিত বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেবীর কাণ্ড দেখছিলেন। বুঝলেন, এ মেয়ে সত্যই অসাধারণ। তিনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে লালাজীর ঘরের দিকে গেলেন।

লালাজী তখন নিজের ঘরখানি তাঁর খাস পরিচারকদের সাহায্যে

গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। সরকার সাহেব ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় হু'খানা বেতের চেয়ার পাতবার হুকুম দিলেন জনৈক পরিচারককে লক্ষ্য করে। তারপর পাশাপাশি হু'জনে বসে বহুক্ষণ ধরে যে পরামর্শ করলেন, তার প্রধান বিষয়বস্তু দেবী।

এর পর সরকার সাহেব হু'বেলাই প্রমোদ-মঞ্জিলের এই নিভৃত মহল্লায় এসে দেখা শোনা করেন; অভাব অসুবিধার প্রসঙ্গ তুলে দলের প্রত্যেক মেয়েটিকে ব্যস্ত ও বিব্রত করেন। কিন্তু আসল তাঁর লক্ষ্যস্থল দেবী হলেও, তার দর্শন পাওয়া কঠিন হয়ে উঠে। প্রায়ই জানা যায়, কোনও না কোনও কাজে দেবী নিবিড়ভাবে লিপ্ত—তার কক্ষদ্বার ভিতর হতে রুদ্ধ।

কাজের কথা শুনে সরকার সাহেব আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, এই বয়সে অনূঢ়া একটা মেয়ের এত কি কাজ—যে, সর্বক্ষণই সে ব্যস্ত থাকে, দেখা করবারও ফুরসদ পায় না? লালাজী হেসে বলেন—সাধ করে কি বলেছিলুম সাহেব, এ মেয়ে সব দিক দিয়েই অসাধারণ! রাত চারটে বাজলেই বিছানা ছেড়ে ওঠে, তখন থেকেই সুরু হয় তার প্রাতঃকৃত্য; তার পর ব্যায়াম, হঠযোগ, পূজা-পাঠ, এরপর স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের মত নিয়ম করে পড়া শোনা। ও এক ওয়াজীর লেড়কী সরকার সাহেব—ঝুটমুট আপনি ওর দিকে ঝুঁকেছেন।

কিন্তু সরকার সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: আপনার কথায় আমার লোভ আরো বেড়ে যাচ্ছে। তবে আপনি ঘাবড়াবেন না—এ ত' আর বৃন্দাবনের আখড়া নয়, কলকাতার গোলকধাঁধাঁ; এখন আমি একটা প্ল্যান করেছি শুনুন ত'!

পুনরায় হুই বুদ্ধিজীবী পরামর্শে প্রবৃত্ত হন এবং দেবীর রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত পরামর্শ চলতে থাকে।

অবিনাশ সরকার নাছোড়বান্দা—দেবীর কাজের ফুরসদ হতেই তার কক্ষে গিয়ে গল্প সুরু করে দেন। নানা কথা জিজ্ঞেস করেন দেবীকে, তার রুচি, সখ, আগ্রহ সম্বন্ধে। দেবী মৃহু হেসে বলে—বেনা

বনে মুক্তো ছড়িয়ে কি লাভ বলুন ? সখ বলে আমার কিছু নেই, আর বিশ্বের কোন জিনিসের উপরে লোভও রাখিনে !

কথাগুলি ঝাঁ করে বলেই দেবী এত দ্রুত উঠে পড়ে যে, সরকার সাহেবের মত ঝানু লোকও আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেন না। অথচ, প্রত্যহ দু'বেলাই তাঁর এখানে আসা চাই এবং দেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি না করলে তিনি তৃপ্তিও পান না।

একদিন দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি নাকি নিত্য ঘণ্টা দুই ধরে দেহ-চর্চা কর ?

দেবী উত্তর করল : দেহ থাকলেই তার চর্চ্চা করতে হয়—এতে জিজ্ঞেস করবার কি আছে ?

সরকার সাহেব বললেন : নারী হয়েও তুমি দেহের কসরৎ কর। কিন্তু কলকাতার কোন মেয়েকে এ সব পাট করতে দেখিনি। তারা শুনলে হয়ত হাসবে।

দেবী বলল : সেই জন্যেই খবরের কাগজে নিত্য নারী-নির্য্যাতনের কথা পড়ি। আমি তখন তাদের দুঃখে সত্যিই কাঁদি। ভাবি, এদেশে কি মানুষ নেই—মেয়েগুলোকে মেষ করে রেখেছে !

সরকার সাহেব বললেন : লালাজী বলছিলেন, তোমার ছোরা-খেলা নাকি একটা দেখবার জিনিস। আমার ইচ্ছে করে—সাহেবদের সামনে তুমি একদিন ছোরা খেলা দেখিয়ে ওদের তাক লাগিয়ে দাও—ওরা বুঝুক, বাঙালীর মেয়েরাও কসরৎ করতে জানে।

দেবী তৎক্ষণাৎ মুখখানা কঠিন করে বলল : তাতে আপনার মতন লোকের পকেট ভারি হতে পারে, কিন্তু জাতির মুখ পুড়ে যাবে।

—এ কথা বলবার মানে ?

—সার্কাসেও বাঙালী মেয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিল, কিন্তু সেজন্যে কেউ তাকে বীরাঙ্গনা বলে নি !

একটু থেমে সরকার সাহেব বললেন : না বলুক, কিন্তু আমাকে

খোঁটা দিয়ে ওকথা বলবার মানে? এর সঙ্গে আমার পকেট ভারি হবে কেন?

অসঙ্কোচে দেবী উত্তর দিল: সার্কাসের আসরে হাজার দর্শকের সামনে যিনি সে দিন বাঙালী মেয়েকে বাঘের সামনে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁরও পকেট ভারি হয়েছিল!

সরকার সাহেব কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন: তারা করত ব্যবসা, বাঘ ভাল্লুক নিয়ে খেলা দেখাত দেশে দেশে ঘুরে তাঁবু খাঁটিয়ে পয়সা উপার্জ্জনের জন্য। আমাকে তুমি সেই সব সার্কাসওয়ালার সামিল করলে দেবী?

সামনের টিপয় থেকে একখানি খবরের কাগজ টেনে নিয়ে দেবী সেই কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি খুলে সরকার সাহেবের সামনে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে বলল: আপনার কথার জবাব এই প্রবন্ধে পাবেন। পড়ুন ত'!

নাসিকা কুঞ্চিত করে সরকার সাহেব বললেন: আমি খবর ছাড়া খবরের কাগজের কোন মন্তব্য পড়ি না।

দেবী মুখখানা কঠিন করে বলল: কিন্তু এটাও খবর, আর খুব দরকারী খবর—আপনার পড়া উচিত। এঁরা লিখেছেন—বিদেশী যোদ্ধাদের আমোদের খোরাক যোগাবার জন্য আমাদের দেশের কতিপয় সুবিধাবাদী অর্থ-লোভী দক্ষিণ কলিকাতায় এক প্রমোদ-প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছেন। দেশের নানা স্থান থেকে নানা প্রকারে নারীদের সংগ্রহ করে…

সরকার সাহেব চীৎকার করে উঠলেন: থাম তুমি, থাম। ওদের কথার কোন দাম নেই; 'হাঁ' কে 'না', আর 'না'-কে 'হাঁ' বলেই ওরা ব্যবসা বজায় রাখে! ও সব বাজে কথা।

দেবী বলল: আপনার এ কথা কিন্তু আমি মানতে পারছি না সরকার সাহেব। কেননা, খবরের কাগজ পড়েই আমি দুনিয়ার অনেক কিছু জেনেছি। এই কলকাতার কথাই বলি—প্রথম এসেছি, এখনো

চোখে অনেক কিছুই দেখিনি; কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে আমার যেন সব জানা হয়ে গেছে।

সরকার সাহেব বললেন: কাগজ পড়ে জানা, আর চোখ দিয়ে দেখে চেনা—ছুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। চলনা, আজ তোমাকে একটু বেড়িয়ে আনি। বদ্ধ ঘরে ক্রমাগত থেকে থেকে মাথা তোমার গরম হয়ে গেছে।

ঘাড় নেড়ে দেবী বলল: রক্ষে করুন, বেড়াবার সখ আমার নেই। আপনার এখানে থেকেই যে সব কাণ্ড দেখছি, তাতেই সারা সহরের ভাবগতিক দেখা হয়ে গেছে।

অতঃপর আর আলাপ জমল না; দেবীও সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে গেল। গৃহ মধ্যে যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বসে রইলেন এবং এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন চলছিল, সেদিকে দেবী ভ্রুক্ষেপও করল না। সরকার সাহেবও কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর মুখ ভার করে লালাজীর ঘরে গেলেন; আবার উভয়ের মধ্যে পরামর্শ চলল। এ দিনের পরামর্শে স্থির হল যে, কর্তৃপক্ষের সমক্ষে শীঘ্রই প্রমোদ-পর্বের যে বিশেষ অনুষ্ঠান হবে, তাতে লালাজীর সম্প্রদায় সর্ব প্রথম বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবে এবং দেবীকে দিয়েও গোটাকয়েক আংগিক কসরৎ দেখান হবে।

দেবী বুঝেছিল যে, সাধুজীর সংগে লালাজীর অনেক প্রভেদ। লোভের মোহ ইনি এখনও কাটাতে পারেন নি; বিশেষতঃ, সরকার সাহেব তাতে নতুন করে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। দেবী ইহাও বুঝতে পারল—অবশিষ্ট যে কয়টি মেয়ে সরকার সাহেবের আয়ত্বে এসে পড়েছে, তাদের প্রমোদ-মঞ্চে উঠিয়ে বিদেশী জঙ্গীদের সমক্ষে নানাপ্রকারে অনন্দদান করতে হবে। দেবী তলে তলে চেষ্টা করছিল, মেয়েগুলিকে এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য ক্ষেপিয়ে তুলবে। কিন্তু একই আশ্রমে লালিতা-পালিতা হলেও দেবীর শিক্ষা-দীক্ষা মনোবৃত্তি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সে লক্ষ্য করল, সরকার সাহেবের প্রমোদ-মঞ্চের মোহে তারা দেবীর সংগেই লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করেছে। বহু সাধ্যসাধনা করেও সরকার সাহেব দেবীকে তার মোটরে তুলে নগর ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেন নি। অথচ দেবী জানতে পারল, ইতিমধ্যেই অন্যান্য মেয়েরা সহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ফেলেছে এবং ইদানীং সরকার সাহেবের সংগে মোটর ভ্রমণে এদের উৎসাহের অন্ত নেই। দেবী তখন গম্ভীর হয়ে ভাবতে থাকে—তার এখন কর্তব্য কি? কেমন করে এই কঠিন স্থান হতে সরে পড়বে সে!

সেদিন লালাজী দেবীর ঘরে এসে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলল: আমার একটা কথা রাখতে হবে মা! সরকার সাহেব মস্ত এক আসর বসাচ্ছেন—বড় বড় সাহেব স্থবা সব আসবেন···মায় লাট সাহেব পর্যন্ত। আমাদের আশ্রমের মেয়েরা ঐ আসরে খেলা দেখাবে। সরকার সাহেবের একান্ত ইচ্ছা, তুমিও ঐ সংগে এমন দু' চারটে কসরৎ দেখাও, সবাই দেখে ধন্যি ধন্যি করে।

দেবী ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে লালাজীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল: কাকাজী, এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেও, এটা কিন্তু কল্পনা করিনি, আপনি আমাকেও এত নীচুতে নামাতে চাইবেন। হ'তে পারে, সখ করে ঝোঁকের মাথায় আমি আপনার সাকরেদদের সংগে পাল্লা দিয়ে ছোরা-ছুরি চালাবার কসরৎ শিখেছি, কিন্তু তাই বলে আমাকে আপনি বাইরের লোকের সামনে সেগুলো দেখাতে বলবেন, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি; তাহলে আমি ওসব কখনই শিখতাম না। আপনি শুধু সাধুজীর কথা মনে করুন; তিনি আমাকে যে চিঠি দিয়ে যান—আপনিও তা পড়েছেন!

লালাজী বললেন: হ্যাঁ—সে চিঠিতে তিনি তোমাকে আমার কথা সব মেনে চলতে বলে গেছেন।

দৃঢ়স্বরে দেবী বলল: তাহলে বলব—আপনি কথাগুলি ভুলে

গেছেন বা বুঝতে পারেন নি। আমার মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে আপনি যে নির্দেশ দেবেন, আমাকেও তা মেনে চলতে হবে—এ কথাই সাধুজী লিখেছিলেন কাকাজী! আপনাকে আমি এখনি সে চিঠি দেখাচ্ছি।

লালাজী বাধা দিয়ে বললেনঃ না, না, তার দরকার নেই; আমার চেয়ে তোমার স্মরণশক্তি যে খুব বেশী, সে আমি জানি। কিন্তু কি করি বল, আমি সরকার সাহেবের সংগে চুক্তি করে ফেলেছি। যদি তুমি কথা না রাখ, তার জন্যে আমাকে মোটা টাকা খেসারত দিতে হবে, হয়ত বা এখান থেকে চলে যেতে হবে।

দেবী বলল: সেও আপনার পক্ষে অনেক ভাল ছিল কাকাজী। আপনি যদি সরকার সাহেবের পাল্লায় না পড়ে আলাদা একখানা বাড়ী ভাড়া করে সবাইকে নিয়ে উঠতেন...

দেবীর কথায় লালাজী বললেনঃ ওসব কথা শুনতেই ভালো! জানো, সারা দেশের মানুষ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? এক মুঠো ভাতের জন্যে কত সোনার চাঁদ মেয়ে ইজ্জত বিলিয়ে দিচ্ছে! সরকার সাহেব আমাদের রাজার হালে রেখেছেন, কোন কষ্ট নেই, যা চাইছি তখনি পাচ্ছি, আমাদের কি কোন কৃতজ্ঞতাও নেই? তবুও আমি তোমাকে নামাতে চাইনি—চামেলীকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতাম; কিন্তু তার তবিয়ৎ ভাল নয়, ক'দিন থেকেই পেটের দরদে ভুগছে; সেইজন্যেই তোমাকে বলছি। লক্ষ্মীটি, এই দিনটির মত তুমি আমার মুখ রাখ। আর আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর পর আমার একমাত্র কাজ হবে তোমার বাপ মা'র সন্ধান করা।

ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে দেবী বলে উঠল: না, না, আমার বাপ মায়ের সন্ধান আপনাকে দিতে হবেনা; আমি চাই না, আমি চাই না; আমি জানি—জগতে আমার কেউ নেই, কেউ নেই, আমিই শুধু আমার!

॥ ছাব্বিশ ॥

সুচতুর সরকার সাহেব লালাজীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে তার সুপক্ক ও সুপুষ্ট কোয়াগুলি আত্মসাৎ করবার অভিপ্রায়ে সিদ্ধাশ্রমের কার্যগুলির অবগুণ্ঠন মোচনে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে, এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাঁর চক্ষু-চমৎকারী সঞ্চয় দেখে পুলকিত হবেন, তিনিও এই সুযোগে কাজ গুছিয়ে নেবেন। ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে যে, সরকার সাহেব এই গুরুত্বপূর্ণ প্রমোদ-প্রদর্শনীর 'অর্গানাইজার' রূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হতে বহু প্রয়াসে ও বিপুল অর্থব্যয়ে যে সকল আনন্দময়ী উদ্ভিন্নযৌবনা স্বাস্থ্যবতী রূপসীদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তা এক বিস্ময়াবহ ব্যাপার। এই জন্যই তিনি লালাজীকে বিশেষভাবে তোয়াজ করে অবহিত করতে সমর্থ হয়েছেন যে, যেমন করে হোক, অন্ততঃ বিভিন্ন কয়েকটি রূপসজ্জায় দেবীকে তিনি মঞ্চে নামাবেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপলব্ধি করে দেবীকেও অগত্যা লালাজীর অনুরোধ রক্ষা করতে হয়েছে। গম্ভীর মুখে সে লালাজীকে বলেছে যে, তাঁর সংগে কথা কাটাকাটি করে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করতে অনিচ্ছুক। লালাজীর উপরেই সে বিশ্বাস করে তার নিজের সমস্ত ভার দিতেছে। এখন তিনিই বলুন, তাকে কি করতে হবে। লালাজী এতে যেন বর্তাইয়া যান। কারণ, তর্কে তিনি দেবীর সহিত পেরে উঠছিলেন না; এ কথায় উৎফুল্ল হয়ে বললেন : খুব ভালো কথা মা! এর পর আমি তোমাকে এমন কোন অনুরোধ করব না, যেটা তোমার মনে ঘা লাগে। শুধু ঐ দিনটার জন্যে তুমি আমার মুখ রাখো, মা! হ্যাঁ, কি তোমাকে করতে হবে, সে কথাও বলছি। সরকার সাহেবের নিজের দলের মেয়েদের নাচ-গান-হল্লা দেখে দেখে

সবার অরুচি হয়ে গেছে। এখন আমাদের পালা—এমন কিছু দেখাতে হবে—সকলেই যেন তাজ্জব মনে করে। সিদ্ধাশ্রমের মেয়েদের হিম্মত তো তোমার অজানা নেই মা; তুমি যদি ভার নাও যেমন প্রোগ্রাম তুমি করে দেবে, ওরা ঠিক সেই মত চলবে। আর তুমি নিজে এমন কিছু সেজে বেরুবে, সেই সংগে ছু' একটা কসরৎ দেখাবে—তুমি ছাড়া যেগুলো অন্যের পক্ষে পর্বত মনে হবে। বুঝেছ আমার কথা?

দেবী ঘাড় নেড়ে বললেঃ বুঝেছি; বেশ, আমি একটা নাচের পালা ঠিক করে নিজেই ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। মোট কথা, আমি যথাসাধ্য করব কাকাজী—আপনাদেব ঋণ শোধবার জন্যে।

শেষের কথাগুলির সংগে সংগে দেবীর ছু' চক্ষু অশ্রুভারে আর্দ্র হয়ে আসে—কণ্ঠের স্বরও যেন আর্তনাদের মত শোনায়। লালাজী দেবীর কথায় এতই উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হয়ে উঠেন যে, উল্লাসের স্থরে তাকে ধন্যবাদ দিয়েই তৃপ্তি পান কিন্তু তার অন্তরটা বুঝবার সামান্য চেষ্টাও করেন নি।

অবশেষে সেই বিশেষ প্রমোদ-পর্বের দিনটি এসে গেল। ছুটির দিন বলে বেলাবেলি 'ম্যাটিনী' প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ—মেজর, কাপ্তেন, লেফ্টেন্যান্ট প্রভৃতি উপাধিধারী বহু অফিসার, কর্তৃপক্ষস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বহু মহিলা মঞ্চের সন্নিহিত আসনগুলি অলঙ্কৃত করেছেন। পিছনের বিস্তৃর্ণ আসনগুলি বিভিন্ন দলের সৈনিকগণে পরিপূর্ণ। কলকাতায় তখন পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশের যোদ্ধৃপদবাচ্য ব্যক্তিদের একত্র সমাগম ঘটেছে। এদের মধ্যে ভারতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সমরবিভাগের কর্মীদের সংখ্যাও কম নয়।

দেবীর পরিকল্পনা অনুসারে অপরূপ একটি নৃত্য-নাট্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। ঐক্যতান বাদনের পর আলোকোজ্জল মঞ্চে সিংহাসনাধিষ্ঠিতা মহীয়সী রাজ্ঞীর সজ্জায় অপূর্ব এক রূপসীকে দেখা গেল। রাজ্ঞীর রূপসজ্জায় এই রূপসী—দেবী। সিদ্ধাশ্রমের

কন্যাগণ রাজ্ঞীর সহচরীরূপে সুসজ্জিতা অবস্থায় রাণীকে চামর ব্যজন করছে। এমন সময় নৃত্যভঙ্গিতে এক অনুচরী এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে জানাল যে, দেশে যুদ্ধের অগুন জ্বলছে ; প্রজাগণ নিরাশ্রয়, অসহায়, অন্নাভাবে হাহাকার করছে। এই সংবাদে রাণী চমকিত হয়ে সিংহাসন হতে উঠে নৃত্যভঙ্গিতে জানালেন যে, ভয় নাই, তিনি তাদের রক্ষা করবেন।

যেমন রাণীর কথা, সেই মত কাজ। রাণী সহচরীদের সংগে দুর্গত নরনারীদিগকে অর্থ ও পণ্য বিতরণ করছেন। আতুর নরনারী বালক-বালিকাগণ মুক্ত কণ্ঠে রাণীর জয়ধ্বনি করতে লাগল।

ইহার পর দেখা গেল—নৃত্যভঙ্গিতে রাজা জানাচ্ছেন—ধ্বংস কর, ধ্বংস কর, ধন-ধান্য পণ্য সব লুণ্ঠন কর। সিদ্ধাশ্রমের কন্যাগণই মুখোস পড়ে পুরুষ সেজেছে।

পর দৃশ্যে সর্বহারা রাণী সহচরীদের সংগে পালাচ্ছেন। এখন তাদের আর সেই বেশভুষা নেই। কিন্তু নিরাভরণা একবস্ত্র-পরিহিতা রূপসী রাণীর রূপ আরও মনলোভা হয়েছে। নৃত্যভঙ্গিতে রাণী বলছেন—সকলকে লয়ে বনবাসিনী হবেন। বনের ফল মূল, গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করবেন।

রাজদস্যুগণের উৎসব আরো প্রবলভাবে চলছে। তাদের নৃত্যলীলায় ধরা টলমল করছে। রাজা নৃত্যভঙ্গিতে জানালেন, আমোদ-প্রমোদ পরিপূর্ণ করতে চাই। রাজ্যের সুন্দরী নারীদের আনো—তারা এসে আমাদের আনন্দ সার্থক করবে। কিন্তু এক অনুচর নৃত্যের তালে তালে এসে জানাল—নারীরা নগর ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের বড় লজ্জা। রাজদস্যুরা লজ্জার নামে হেসে অস্থির। রাজা হুঙ্কার দিলেন—লালসা কোথায় ডাক তাকে। সে লজ্জাশীলাদের নির্লজ্জা করবে। লোভ ও লালসার প্রতিমূর্তি বিচিত্ররূপিণী এক নারী উত্তম সূক্ষ্মবসনে সেজে নাচতে নাচতে এলে রাজা তাকে জানালেন—তুমিও নারী, নিজের লজ্জা

যেমন করে হারিয়েছ, এই রাজ্যের লজ্জাশীলাদের লজ্জাও সেই ভাবে হরণ করে তাদের এখানে এনে উপস্থিত কর। এর জন্য ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দাও—অর্থ বস্ত্র আহার্য সব নিয়ে যাও…তাদের বিনিময়ে ক্রীত পণ্যের মত কামিনীদিগকে ক্রয় করে আন।

নগর ছেড়ে গ্রামান্তরে আশ্রয় নিয়েছে নারীবৃন্দ…কারও কারও বক্ষে ও সংগে সন্তান। অন্নাভাবে কষ্টের অবধি নেই…অভাব-রাক্ষসী মুখব্যাদন করে ভয় দেখাচ্ছে। এমনি সময় ফুলসজ্জায় সজ্জিতা বিলাসিনীর বেশে নৃত্যভঙ্গিতে এল লালসা; তার সংগে নানা বস্ত্র, আভরণ, উত্তম উত্তম খাদ্য। অভাব-রাক্ষসী তখন অদৃশ্য হয়েছে। লালসা নারীদিগকে আহ্বান করতে লাগল চটুল নৃত্য-লীলায়। নারীরা লোভাতুরা হয়ে হাত পেতেছে, এমন সময় সর্বহারা সেই রাণী এসে বাধা দিলেন—বসন ভূষণ টেনে দূরে নিক্ষেপ করলেন। লালসার হুঙ্কারে উন্মুক্ত ছোরা হস্তে ভীষণ মূর্তি দুই রক্ষী এল—লালসা নির্দেশ দিল রাণীকে ধরবার জন্য…রক্ষীরা অগ্রসর হতেই রাণীও কটিদেশে লুক্কাইত ছোরা টেনে বার করে বাধা দিলেন…দুই জন দুর্দ্ধর্ষ রক্ষীর সহিত একক নারীর ছোরা-যুদ্ধ চলল এবং রক্ষীদ্বয় আহত হয়ে রক্তাক্তদেহে পলায়ন করল। তখন রাণীর নির্দেশে নারীরা লালসাকে সম্মার্জনী প্রহারে জর্জরিত করে তাড়িয়ে দিল।

পরদৃশ্যে প্রতীক্ষারত রাজা ও রাজপরিষদদের সমক্ষে প্রহৃতা লালসা এসে তার দুরবস্থা নিবেদন করছে নৃত্যভঙ্গিতে। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈনিকদিগকে আদেশ দিলেন—নারীদিগের সহিত স্পর্দ্ধিতা রাণীকেও ধরে আন। লালসা তোমাদের পথ দেখাবে।

নারীদের তখন চরম অবস্থা। অন্নাভাবে অনশনে দেহ শীর্ণ, অঙ্গ-বসন শত ছিন্ন, দুর্দশার অন্ত নেই। এমন সময় খবর এল—সেই কুটনী রাজসৈন্য নিয়ে তাদের ধরতে আসছে। নারীরা তখন নেত্রীরূপিণী রাণীকে জিজ্ঞেস করল—এখন কি করবে তারা?…রাণী

নৃত্যভঙ্গিতে জানালেন—তুই পথ আছ, ধরা দিয়ে মরা, কিম্বা মরে বাঁচা। কি চাও?…নারীরা বলল…আমরা ধরা দিয়েই বাঁচতে চাই। অভাব—অনাহার—দারিদ্র্য আর সহ্য করতে পারছি না। …রাণী বললেন—তোমাদের যা অভিরুচি তাই কর। কিন্তু আমি মরে বাঁচতে চাই—তা হলে আমার আদর্শে তোমরাও বাঁচবে। …রাণী একাকিনী বিপরীত পথে চলে গেলেন সাশ্রুলোচনে বিদায় নিয়ে।

রাজসভা। রাজা সৈনিক বেষ্টিতা ধৃতা নারীদিগকে দেখে নিকটে এলেন—একে একে প্রত্যেককে দেখে শ্লেষের ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন: এখন যে বড় এলে? কি চাও?

নারীরা জানাল: তারা আনন্দ দান করে বাঁচতে চায়, বসন ভূষণ আরাম বিলাস চায়, তাই এসেছে।

ভ্রূকুটি করে রাজা লালসাকে জিজ্ঞেস করলেন: এরাই অসীম দম্ভে রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিল?

লালসা বলল: না, না, না, এরা নয়—

নারীরা সভয়ে জানাল: সত্যই তারা নয়। যাঁর কথায় তারা মেতেছিল, বাঁচবার জন্য আসতে দেয়নি, সে ত' আসেনি; সে গেছে মরতে।

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: ভুল, ভুল! তোমরাই মরতে এসেছ, সে-ই বেঁচে গেছে। কিন্তু তা হবে না—সে বাঁচলে রাজদম্ভ ধ্বংস হবে, তোমরাও আবার বেঁচে উঠবে। তাকে চাই, তাকে চাই—ধরা চাই; চল, চল, সমস্ত শক্তি নিয়ে তাকে ধরি!…সংগে সংগে শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—ধর, ধর, তাকে ধর। ঘোর রোলে রণবাদ্য বেজে উঠল।

প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়ল।

সকল শ্রেণীর দর্শক সমান আগ্রহে এই অপূর্ব নৃত্য-নাট্যের অভিনয় উপভোগ করছিলেন। ঘন ঘন প্রেক্ষাগৃহ করতালি-শব্দে মুখরিত

হচ্ছিল ; বিশেষতঃ রাণীর নৃত্যভঙ্গি এতই চিত্তাকর্ষক হয় যে পরবর্তী অঙ্কটির জন্য প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এই দলটি সম্বন্ধে বিশেষ করে নায়িকা-নর্তকীর রূপসজ্জায় যে মেয়েটি আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তাকে নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

সরকার সাহেব এই দিনই মিস্ মালার সহিত পরিচিত হয়ে তাকে এই অভিনয় দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন এবং নিজেই তাকে সংগে করে আনেন। তাঁরা এক পার্শ্বে পাশাপাশি দু'খানি চেয়ারে বসে এই আনন্দ উপভোগ করছিলেন। দেবীর রূপ ও নৃত্য দর্শনে মিস্ মালতির মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়তেই সে যেন হাঁফিয়ে উঠে ; সরকার সাহেবকে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে কি যে বলবে ঠিক করতে পারে না। এমন সময় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সরকারকে ব্যগ্রভাবে তাঁদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় হুকুম শোনবার আশায়। বড় বড় পদস্থ অফিসার প্রত্যেকের মুখে একই প্রশ্ন দেবী মেয়েটির প্রসঙ্গে।

—ঐ মেয়েটি কি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ?

—কোথা হতে ওকে সংগ্রহ করলেন ?

—বেলজিয়াম থেকে যে কটা মেয়ে কলকাতায় এসেছে, তাদেরই কেউ নাকি ?

এই ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সরকার সাহেব পুলকিত হয়ে উঠেন ; তাঁর কল্পনা সত্য হয়েছে ; দেবী মেয়েটি সত্য সত্যই সাহেবদের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন : না স্যার, আপনাদের অনুমান ঠিক নয় ; যে ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্বও ত' কম নয়। আমাকে লোক লাগিয়ে ভারতের নানাস্থান থেকে সুগঠনা স্বাস্থ্যবতী আনন্দময়ী মেয়েদের সংগ্রহ করতে হয়। এই নাচের নাটকে তারই নমুনা আপনারা দেখছেন। আর যে মেয়েটির কথা বলছেন, সে য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা বেলজিয়ামের বিউটি নয়—একেবারে ইণ্ডিয়ান গার্ল। এই

নাচের নাটকের পর কতকগুলো নির্বাচিত নৃত্যে বিদেশিনী মেয়েরা আপনাদের অভিবাদন জানাবে।

কথা-প্রসঙ্গে এটাও স্থির হয়ে গেল যে, নৃত্য-নাট্যের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সরকার সাহেব এই নতুন দলটি, বিশেষতঃ নায়িকা মেয়েটির সংগে পরিচিত করে দেবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই মেয়েটি অর্থাৎ দেবীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ করবার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।

এঁদের মধ্যে নবাগত জনৈক নতুন অফিসার ছিলেন এবং কোন প্রশ্ন না করে নিবিষ্ট মনে এঁদের কথোপকথন শুনছিলেন। এই প্রমোদ-মজলিসে পুলিস বিভাগের জনৈক পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; নবাগত এই অফিসারটি তাঁর পার্শ্বে বসে নৃত্য-নাটিকার অভিনয় আগাগোড়া দেখছেন এবং নর্ত্তকীদের সম্বন্ধে আলোচনাও শুনেছেন। ইনি অন্য কেউ নন—করাচীর পীর পাগোরার গুপ্ত আড্‌ডার উদ্ভাবক ও অবরুদ্ধ নারীদের উদ্ধারক বিচক্ষণ গোয়েন্দা লালবিহারী সিংহ। বৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রমে প্রাপ্ত পত্রগুলি অবলম্বন করে কয় দিন হল কলকাতায় এসেছেন এবং এইদিন কৌতূহলী হয়ে সরকার সাহেবের অনুষ্ঠিত প্রমোদ-উৎসবে যোগদান করেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে 'ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রন্ট' 'ওয়ারিয়ার য়্যামিউজমেণ্ট সিণ্ডিকেট' 'অল ইণ্ডিয়া য়্যামিউজমেণ্ট বুরো' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তখন টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন এবং সরকাররূপী গৌরীসেনের কোষাগারের দ্বার এই সকল ব্যাপারে সদা উন্মুক্ত। লালবিহারী কলকাতায় এসে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করে সবিশেষ উৎসাহ পাননি। কারণ, প্রমোদ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত সরকার সাহেব চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেনামহলের চিত্তবিনোদনের জন্য নানাস্থান হতে প্রমোদপ্রদর্শনের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে এনেছেন। এ অবস্থায় সরকার সাহেবকে দণ্ডবিধির সামনে আনা সহজ কথা নয়। তবে সিদ্ধাশ্রমের লালা লছমন দাসের উপর এক হাত নেওয়া যেতে পারে, যদ্যপি তার

আয়ত্তাধীনা নারীদের মধ্যে অন্ততঃ একটি নারীও সরকারী সাক্ষী হয়ে সমস্ত স্বীকার করে। এই সময় বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি দেখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ লালবিহারীর জন্য একখানি প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেন এবং পুলিস অফিসাররূপে তিনি লালবিহারীকে সংগে নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে এই নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখছিলেন। দৃশ্যের পর দৃশ্যের নৃত্যাভিনয় দেখতে দেখতে লালবিহারীর দু' চক্ষুর দৃষ্টি পরিবর্তিত হতে থাকে—তাঁর স্নায়ুপুঞ্জেও কতকগুলি অভিনব সূত্র সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে কৌতূহলী করে তুলে।

দেবী নিজের জন্য এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র ঘর আলাদা করে রেখেছিল—সেই ঘরে বসে স্বহস্তে সাজসজ্জা করবার জন্য। মঞ্চ হতে এই ঘরে এসে সবে মাত্র সে বসেছে, এমন সময় সরকার সাহেবকে সংগে নিয়ে লালাজী সেখানে প্রবেশ করে বললেন: সবার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছ মা, একেবারে তাজ্জব কাণ্ড!

সরকার সাহেব বললেন: সিট ছেড়ে কেউ ওঠেনি; এর পর কি কাণ্ড তুমি কর, সেটা দেখবার জন্যে বিপুল আগ্রহ নিয়ে সকলে বসে আছে।

দেবী তাড়াতাড়ি উঠে করযোড়ে বলল: আপনারাও দয়া করে ওঁদের ঘিরে বসুনগে; আমাকে এখনি সাজতে হবে।

সরকার সাহেব বললেন: তুমি সাজ, আমরা যাচ্ছি। তবে একটা কথা, ড্রপ পড়বার পর ওপরওলারা এসে তোমার সংগে আলাপ করবেন, হয়ত প্রেজেণ্ট করবেন তোমাকে দামী দামী জিনিস। তুমি কিন্তু প্রথমে যে পোষাক পরেছিলে, সেইটে পরেই ওঁদের সংগে আলাপ করো—বুঝলে?

'যে আজ্ঞে; তাই হবে। এখন আমাকে ছুটি দিন।' বলেই দেবী ঘুরে দাঁড়াল। সরকার সাহেব লালাজীর হাত ধরে চলে গেলেন। দেবী দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় মেক-আপ-ম্যান দ্বারপ্রান্ত হতে বলল: আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে কিছু…।

'না। আমার কাজ আমি নিজের হাতেই করে নেব; তুমি ওদের দেখগে।' বলে দেবী দরজা বন্ধ করে দিল।

ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে দেবী এখন একা। ধীরে ধীরে সে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। পার্শ্বেই একটা আলমারীর মধ্যে সজ্জার উপযুক্ত নানাবিধ পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। দেবী সেগুলি টেনে বার করে টেবিলখানির উপর রাখল; তার পর ক্ষিপ্র হস্তে বেছে বেছে যে সব উপকরণ নিয়ে সজ্জিত হল—অভিনয়ে নৃত্য-নাটিকার নায়িকা নর্তকীর সংগে তার কোন সম্বন্ধ নেই; এখন তাকে দেখে ছদ্মবেশিনী দেবী বলে কে ভুল করবে? তার পরনে খাঁকী হাফপ্যান্ট, গায়ে একটা ময়লা রঙীন জামা, তার ছাঁটকাট্ও অদ্ভুত। টোয়ালের মত পুরু ও ফুলো, এক খণ্ড নীল রঙের রেশমী চাদর কাঁধের দু' পাশ দিয়ে কটিদেশ পর্যন্ত নেমেছে। গলা ও বুকের কাছে পিন্ দিয়ে উভয় পার্শ্বের বস্ত্রাংশ সংযুক্ত। মাথায় গেরুয়া রঙের প্রকাণ্ড এক পাগ্ড়ি। তার মধ্যে এলোমেলো খোঁপাটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে।

সজ্জা সমাপ্ত হলে দেবী সামনের রুদ্ধ দ্বারের অর্গলটি খুলে দিল। এ ঘরের অন্যদিকে টানা বারান্দা—খুব চওড়া। তার পরেই উদ্যান। সেদিকের রুদ্ধ দরজার খিল খুলে দেবী অলিন্দে উপনীত হয়ে বা'র থেকে তার শিকল তুলে দিল। অলিন্দের এক দিকে লোহার গরাদে যুক্ত কাঠের রেলিং; অন্য দিকে খানিকটা গাঁথা আলিশা—কতকটা দেওয়ালের মত। কাঠের রেলিংএর সাহায্যে দেবী উচ্চ আলশের উপর অত্যন্ত কৌশলে উঠে পড়ল। উদ্যান হতে কৃষ্ণকলি ফুল গাছের একটি বৃহৎ ডাল আলশে থেকে খানিক দূরে বেঁকে গেছে; দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা দেখে এবং লক্ষ্য স্থির করে আলশের উপর হতে লাফিয়ে দু' হাতে সেই ডালটি আঁকড়ে ধরল; পরক্ষণে সেই শক্ত ডালটির ওপর দিয়ে তার সন্ধিস্থলে গিয়ে বসল। সেখান হতে কাণ্ড বেয়ে উদ্যানে অবতরণ করা তার পক্ষে কিছু মাত্র

কঠিন হল না। বিস্তীর্ণ উদ্যান, চারদিক প্রাচীরবেষ্টিত। আর একটি বৃক্ষ অবলম্বনে সে অতি সন্তর্পণে প্রাচীরের ওপর উঠে দেখল, অদূরে সঙ্কীর্ণ একটি নির্জন পথ। প্রাচীর হতে নেমে সেই পথ ধরে সে অগ্রসর হল। তার মুখে ভয় বা দুশ্চিন্তার কোন চিহ্ন নাই; বিপদের সময় মনকে স্থির রাখবার কৌশল তার জানা ছিল। দেবী সেই অপরিচিত পথে ছুটল না, দিব্য সহজ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সামনের দিকে আগিয়ে চলল; খানিক দূর গিয়ে তুলসী দাসের একটি দোঁহা ধরল। দেবীর মধুর কণ্ঠের ঝঙ্কারে সেই নির্জন পথ মুখরিত হয়ে উঠল।

মিলিটারী এলাকাভুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের বাসীন্দারা অন্যত্র উঠে গেছে; এক গুর্খা রক্ষীর সহিত এই পথে দেবীর সাক্ষাৎ ঘটল। দেবীর মুখে তুলসীদাসী দোঁহা শুনে গুর্খা রক্ষীটি ক্যাম্প হতে তার অভিমুখে আসে এবং চোখাচোখি হতেই দেবীকে লোক-চলাচলের পথ দেখিয়ে দিয়ে জানায় যে, এটা সরকারী এলাকা—এদিকে চলবার রেওয়াজ নেই। দেবীও বুঝল, এই জন্যই পথটি নির্জন।

লেক রোডের রেণু-নিবাসের নীচের ঘরে আসর সাজিয়ে নরেন তখন সাগ্রহে মালতী দেবীর প্রতিক্ষা করছিল। মালতী নিশ্চিত আসবে জেনে সে বাইরের দরজা বন্ধ করেনি।

এদিকে দেবী লেক রোডে পড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নির্মিত বাড়ীগুলি দেখতে দেখতে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল। দরজার গায়ে দু' একটা বাড়ীর মালিকের নামের প্লেটও সে পাঠ করল, কিন্তু পদবী তার মনে ধরল না। অবশেষে 'রেণু-নিবাস' নামটি পড়ে সে যেন আশ্বস্ত হল; সে সংগে এক খণ্ড কালো রঙের বোর্ডের উপর সাদা অক্ষরে উৎকীর্ণ—'নরেন্দ্র বিশ্বাস বি-এ, চিত্র-শিল্পী', এ

নামটি বিশেষভাবে তাকে আকৃষ্ট করল। এ স্থানে সে থমকে দাঁড়িয়ে দেখল যে, বাইরের দরজা ভেতর হতে বন্ধ নয়—উন্মুক্ত রয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে ভেতরে ঢুকে নিজেই অতি সন্তর্পণে দ্বার বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল।

শিল্পী তখন মালতীর আগমন সম্পর্কে হতাশ হয়ে টেবিলে হাতখানির উপর মাথাটা রেখে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

তার পরের ঘটনা পূর্বেই বলা হয়েছে।

॥ সাতাশ ॥

ওদিকে প্রমোদ-মণ্ডপে ঐক্যতান বাদনের পর পুনরায় যবনিকা উঠেছে। রাজসভায় উৎসব চলছে; সে উৎসবের আর নিবৃত্তি নেই—দর্শকবৃন্দ অধৈর্য হয়ে উঠছেন। ভিতরে গ্রীনরুমের মধ্যেও যেন একটা গোলযোগ ঘটেছে। মঞ্চে এই সময় নায়িকা—রাণীর আবির্ভাব হবার কথা—আকুল আগ্রহে সকলে তারই প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু এ কি বিশ্রী কাণ্ড! এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? এমন সময় এক অনুচর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল: সর্বনাশ হয়েছে! দেবী মেয়েটি নেই, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না—সে পালিয়েছে।

নৃত্যের ভঙ্গি এ-পর্যন্ত এত স্পষ্ট ছিল যে, বাণী বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বাঙলা ভাষায় এই আড়ষ্ট স্বর সকলে বুঝতে পারলেন না। তাছাড়া, অনুচরবেশধারিণী তরুণীটিও তখন কাঁপছিল।

রাজা ব্যাপারটি না বুঝে নৃত্যভঙ্গিতে হুকুম করতে লাগল: কোথায় পালাবে, তাকে চাই—খুঁজে ধরে আন।

পরক্ষণে সরকার সাহেব ও লালাজী উভয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। সরকার সাহেব দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করে ইংরাজীতে বললেন: যে মেয়েটি নায়িকা-রাণী সেজে প্রথম অঙ্কে নেচেছিল,

তাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। ইনিই সেই মেয়েটির অভিভাবক লালা লছমনদাসজী। আমরা আজ যে আনন্দ পরিবেষণ করে আপনাদের মনে প্রচুর আনন্দ দিতে পেরেছি, সেটা সম্ভব হয়েছে এঁরই সৌজন্যে। কিন্তু সে আনন্দে বাধা পড়ায় আমরা একেবারে ভেঙে পড়েছি। অবশ্য আরও অনেক ব্যবস্থা আছে আপনাদের তৃপ্তি দেবার ; কিন্তু তার আগে আমরা কিছুক্ষণ যবনিকা ফেলে ঐ মেয়েটির সন্ধান করতে চাই।

প্রেক্ষাগৃহে তখন রীতিমত চাঞ্চল্যের তরঙ্গ উঠেছে। প্রায় সকলেরই ইচ্ছা, নায়িকা মেয়েটির সন্ধান করা হোক। প্রয়োজন হলে তারাও সাহায্য করতে পারে।

কর্তৃপক্ষস্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংগে করে সরকার সাহেব ও লালাজী দেবীর নিভৃত সাজঘরে উপস্থিত হলেন। দেবী কিন্তু পলায়নকালে অনুসরণকারীদিগকে ধোঁকায় ফেলবার উদ্দেশ্যে এমন ভাবে সামনের দরজা খুলে রেখে গিয়েছে, দেখলেই মনে হয়, সে যখন ঘরে নেই—এ পথেই কোথাও গিয়েছে। বাগানের দিকের দরজা রুদ্ধ থাকায় এ দিক দিয়ে তার পলায়ন সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। প্রমোদ অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সংগে পুলিসের তদন্ত বিভাগের ওপরওয়ালাও ভিতরে এসেছিলেন এবং লালবিহারীও তাঁর সংগে আসবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

তখন প্রশ্ন উঠল : মেয়েটি পালাল কেন ? নাচে এমন সুখ্যাতি উঠবার পর তার পক্ষে পালাবার কথা ত' নয়।

লালাজী জানালেন : অত্যন্ত শিশুকাল থেকে আমি তাকে মানুষ করেছি ; লেখাপড়া নাচ গান শিখিয়েছি, সে আমার মেয়ের মত—যেমন আর সব মেয়েরা। আমিও আশ্চর্য হচ্ছি হুজুর।

লালবিহারী এতক্ষণ নীরবে ঘরখানি ও তার ভিতরকার জিনিস-পত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। সে সময় ড্রেসিং টেবিলের উপরকার বড় আয়নাটির তলায় ব্রোঞ্জের নর্তকীমূর্তি চাপা একখানা চিঠি তাঁর

দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষিপ্র হস্তে সেখানি তুলে নিয়ে তদন্ত বিভাগের চীফের হাতে দিলেন। সরকার সাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন : চিঠি নাকি ?

চীফ বললেন : তাই ত' মনে হচ্ছে। খামের উপরে বাঙলায় লেখা রয়েছে :

লালাজী বললেন : সে আমাকে কাকাজী বলে ডাকে। ও চিঠি তাহলে আমাকেই লিখেছে, আমার চিঠি—আমাকে দিন হুজুর !

চীফ বললেন : কিন্তু নীচে লেখা রয়েছে—কাকাজীর নামে চিঠি হোলেও এ-চিঠি সকলের সামনে পড়বার জন্য অনুরোধ করে যাচ্ছি।···

বাঙলায় বলে চীফ কথাগুলো পুনরায় ইংরাজীতে বললেন। প্রমোদ-বিভাগের কর্তা ইংরাজীতে বললেন : তাহলে আপনিই পড়ুন স্যর।

চীফ তখন চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন :

কাকাজী !

আমার গুরু ও প্রতিপালক সাধুজী যে সর্তে আমাকে আপনার হাতে দিয়ে যান, আমি কোন দিন তাহা লঙ্ঘন করি নাই। আমার প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল—আপনার সকল নির্দেশ মেনে চলিব এবং আপনার সেই নির্দেশে মর্যাদাহানিকর কিছুই থাকবে না। যদি তেমন কিছু ঘটে, তিনি আমাকে আত্মশক্তির সাহায্য লইতে স্বতন্ত্র নির্দেশও দিয়াছিলেন। আমার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত অন্ধকারে আছি। আমার পিতামাতা যদি থাকিয়া থাকেন, তাহাও সেই অন্ধকারে। আপনি তাহাতে আলোকপাত করিতে পারেন, এই ভরসায় আমি সাধুজীর আশ্রম ত্যাগের পরেও আপনার অভিভাবকত্ব স্বীকার করি। পিতামাতার সন্ধান পাওয়া যাইবে, এই দুরাশায় আমি বিনাপ্রতিবাদে আপনার সম্প্রদায়ের সহিত কলিকাতায় আসি। কিন্তু এখানে সরকার সাহেবের আশ্রয়ে আপনি আমাকে আনাতে বুঝিলাম

যে, উত্তপ্ত কটাহ হইতে আগুনে পড়িবার মত অবস্থা আমার হইয়াছে। আপনার আশ্রমে হারানো কন্যাদিগকে কি উদ্দেশ্যে লালন-পালন করা হইত, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। উচ্চদরে বিকাইবে বলিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন ভাষা ও নানা বিদ্যা শিখানো হইত—নৃত্যকলাও ছিল তাহাদের অন্যতম। কৌতূহল-বশে আমি ঐ সকল বিদ্যা শিখিয়াছিলাম—যদিও সাধুজীর নিকট হইতে আমি আশ্বস্ত ছিলাম যে, আমাকে উহাদের মত 'সওদা' হইতে হইবে না। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া জানিলাম যে, আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত সব কয়টি কন্যাই সরকার সাহেবের 'সওদা' হইয়া গিয়াছে—আমি পর্যন্ত! নতুবা আমাকে আজিকার অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে দর্শকদের সমক্ষে নাচাইতে পারতেন না। এইখানেই আপনি সাধুজীর সহিত সর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন এবং আমার অমর্যাদা করিয়া বিশ্বাসহন্তা হইয়াছেন। এই অবস্থায় আমাকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। নিরূপায় হইয়াই আমি নাচিতে বাধ্য হই এবং নিজেই নাচের পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করি। প্রথম অঙ্কের পর যবনিকা পড়িলেই আমি পলাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখি। নাচের এই পরিকল্পনার পিছনেও আমার উদ্দেশ্য চাপা থাকে। এখানে দর্শকদের মধ্যে হৃদয়বান নারী-দরদী বিজ্ঞ ব্যক্তিও থাকিতে পারেন। তাঁহারা ইহা হইতে দেশের অসহায়া নারীদের দুর্দশা হয়ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন—সরকার সাহেবের মত সুবিধাবাদী দালালদের হাতে পড়িয়া কিভাবে ইহাদিগকে জঙ্গীদের আনন্দের খোরাক যোগাইতে হইতেছে। যুদ্ধের এই দুর্দিনে নানাভাবে বিপন্না অভাব-গ্রস্তা রূপসীগণকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা এই বিরাট আনন্দ উৎসব চালানো হইতেছে, ইহার পিছনে রহিয়াছে আর্মি-অফিসারদের উৎসাহ, সরকারের অর্থসাহায্য। এত বড় দুর্নীতি কি সুসভ্য সরকার সমর্থন করবেন? এই নগরীতে সাধারণ প্রমোদ-শালার অভাব নাই—সরকারী জঙ্গীরা সেই সব প্রমোদ-প্রতিষ্ঠানে গিয়া ত' চিত্তের আনন্দ চরিতার্থ করিতে পারেন?…আপনাকে চিঠি

লিখিতে বসিয়া আমাকে কর্তব্যের অনুরোধে এই সব কথা লিখিতে হইতেছে। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই জীবনকে ধন্য মনে করিব। ইতি—

—দেবী

তদন্ত বিভাগের চীফ চিঠিখানি পড়ে তার মর্ম আর্মি-অফিসারদের বুঝিয়ে দিলেন। শুনতে শুনতেই অনেকের মুখমণ্ডল অন্ধকার হচ্ছিল। প্রমোদ-বিভাগের বড়কর্তা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সরকার সাহেবের দিকে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে বললেন: মিঃ সরকার, এখানকার ষ্টেজের উপর যে ড্রপ পড়েছে, আর তা তোলা হবে না এবং সম্ভবতঃ এর পরেও নয়। কাল সকালেই আপনি আমার সংগে দেখা করবেন।

মিঃ সরকার সবিনয়ে বললেন: স্যর, একখানা উড়ো চিঠির ওপর নির্ভর করে—

বাধা দিয়ে অফিসার বললেন: চিঠিখানা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে অনেক নগ্ন সত্য দেখিয়ে দিয়েছে। ওকে আমরা বাতিল করতে পারি না। আর যিনি এই চিঠি পড়লেন, তাঁকে আমরা তদন্ত বিভাগের অফিসার বলে জানি। আমি এই চিঠি, আর এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ওঁকেই অনুরোধ করছি। গবরমেণ্ট মিলিটারী অফিসার ও সৈনিকদের অবসরকালে আমোদ-প্রমোদের জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন সত্য, কিন্তু তা বলে সেই সুযোগ নিয়ে তার ব্যবস্থাপকরা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন, গবরমেণ্ট কখনই তা বরদাস্ত করবেন না।

এর পর চীফ প্রমোদ-বিভাগের বড়কর্তার সংগে কিছুক্ষণ গোপনে পরামর্শ করে সরকার সাহেবকে বললেন: আপনিই যখন এই য়্যামিউজমেণ্টের ব্যবস্থা করেছেন, আপনিই মঞ্চে উঠে সকলকে জানিয়ে দিয়ে আসুন—আজকের এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের পর আর কোন অনুষ্ঠান হবে না।

বাধ্য হয়েই সরকারকে মঞ্চের ওপর যেতে হল। লালাজীও

তাঁকে অনুসরণ করছিলেন, কিন্তু লালবিহারীর ইঙ্গিতে চীফ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন : আপনি যাবেন না, এখানকার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে পুলিসের নজরবন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। আপনার দলে যে-সব মেয়ে আছে, আমি তাদের একটা লিষ্ট করে প্রত্যেকের জবানবন্দী নেব। এখনি এই ব্যারাকের ওপর পুলিসের কড়া পাহারা বসবে।

॥ আঠাশ ॥

রেণু-নিবাসে গৃহস্বামী হরপ্রসাদের ফ্লাটের উপরতলার ভিতরের দিকে একখানি ঘরে দেবীর বসবাস নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে নরেন্দ্রনাথ। সামনের দিকের ঘরখানিতে গৃহস্বামীর কন্যার আলেখ্য অঙ্কনের কাজ যেমন চলছিল, তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ভিতরের ঘরের সংগে এর কোন সম্বন্ধ নেই। এক দিনের ও কিয়ৎক্ষণের আলাপ-পরিচয়েই দেবী এই তরুণ শিল্পীটিকে চিনতে পেরেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির যত লোকের সংগে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, এই ছেলেটি যেন তাদের মধ্যে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। পুরুষের মুখ চক্ষু ও ভঙ্গি দেখেই দেবী নির্ণয় করতে অভ্যস্ত যে, কোন শ্রেণীর জানোয়ারের প্রকৃতি তার প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে! কিন্তু এই প্রথম তার দৃষ্টির পরিধির মধ্যে এমন এক পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, সত্যকার মানুষরূপেই যাকে সে চিনতে পেরেছে। দেবীর অন্তরে এই সম্পর্কে যে জন্য বিস্ময়ের আলোড়ন উঠেছে, তা হচ্ছে—এই আশ্চর্য মানুষটির মানসিক দৃঢ়তা ও অদ্ভুত রকমের সংযমশীলতা। পুরুষের ছদ্মবেশে দেবীর নাটকীয় উপস্থিতি এবং তার পর বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশের পিছনে যে গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সে এ পর্যন্ত করে নি। শুধু তাই

নয়, বিনা সর্তে দেবীকে সে আশ্রয় দিয়েছিল বলে সে সর্ত হতেও বিচ্যুত হয়নি সে। ভুলেও প্রশ্ন করেনি কোন দিন কোন সময়—কেন দেবী পুরুষের ছদ্মবেশ ধরেছিল, কোথা হতে সে এসেছে, কি তার পরিচয়! অবশ্য, নরেন যে পূর্ব-বন্দোবস্ত মত কোন তরুণীর আলেখ্য অঙ্কনের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল, তার বিলম্বের জন্য হতাশ হয়ে পড়েছিল এবং দেবী স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করায় তার কর্যোদ্ধার হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কাজ শেষ হবার পর স্বল্প সংলাপের মধ্যে দেবী এই ছেলেটির কৌতূহল-বিহীন বলিষ্ঠ মনের যে পরিচয় পায়, তাতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পর, ভাড়া-করা শাড়ী ও ব্লাউস প্রভৃতি নেবার জন্য তার পরিচিত বস্ত্র-প্রতিষ্ঠানের লোক এলেই, নরেন যখন তাকে আড়ালে ডেকে গৃহস্থঘরের মেয়েদের উপযোগী এগারোহাতি শাড়ী ও ঐ মাপের ছিটের ব্লাউস কয়েক জোড়া আনবার ফরমাস করে তাকে বিদায় করে দেয়, আড়ালে কথা হলেও বুদ্ধিমতী দেবী তা অনুমানে বুঝে প্রশ্ন করবামাত্র নরেন যখন সহজভাবেই বলে—'বিপন্না অবস্থায় শুধু আশ্রয় দিলেই ত' গৃহীর কর্তব্য শেষ হয় না। এখন লজ্জা রক্ষার জন্য বস্ত্র চাই, দেহরক্ষার জন্য খাদ্য চাই। যদি গ্রহণ করতে না চাও, তাহলে আমি বুঝব—মানুষ চিনতে তুমি ভুল করেছ!' তখন দেবী বেদনার সুরে সবিনয়ে বলে উঠে—'সত্যই আমি অন্যায় করেছি; তবে মানুষ চিনতে যে আমি ভুল করিনি—এ কথা আমি এখনো জোর দিয়ে বলছি। একান্ত অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় আমি যখন আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, আপনাকেই আমার আশ্রয়দাতা অভিভাবক মনে করে আতিথ্যও স্বীকার করছি। কিন্তু এই ঋণের বোঝা কি করে যে শোধ করব—'

বলেই দেবীর কণ্ঠস্বর উদ্গত অশ্রুর বাষ্পে রুদ্ধ হয়ে যায়।

নরেনও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—'তুমি তাহলে আবার ভুল করছ। অতিথির অন্তরে ত' ঋণের প্রশ্ন ওঠবার কথা নয়। অন্তরিকতার সংগে

আমি যখন তোমাকে অতিথির মর্যাদা দিয়েছি, আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সেখানে তোমার অন্তরে কোন দ্বিধা বা সংকোচ ওঠবার কথা নয়। তবে যদি আমার সম্বন্ধে তোমার মনে কোন সংশয় ওঠে, আশঙ্কা জাগে, সে কথা আলাদা। তাহলে বুঝব যে, মানুষ বলে আমাকে স্বীকার করে নিতে তোমার অন্তরে এখনো সন্দেহ আছে।

এই কথায় দেবীর সমস্ত অন্তরটা যেন মোচড় দিয়া উঠে; প্রতিবাদের ভঙ্গিতে সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে—'না না না, ও-কথা আপনি বলবেন না, আমি শুনতে পারছি না। তাহলে এখন আপনাকে বলি—আমার চোখে পূর্ণ মানুষের মূর্তি এই প্রথম পড়েছে, এখানে এসেই আমি জেনেছি, সত্যই মানুষ কেমন হয়। দেখুন, এ বয়সে আমি যা দেখেছি, যে আবেষ্টনে আমি মানুষ হয়েছি, যদি আপনি শোনেন—'

শান্ত কণ্ঠে নরেন দেবীর কথায় বাধা দিয়ে বলে—'না, সে কথা আনি শুনতে চাইনে। তুমি যে আমাকে মানুষ বলে চিনেছ, এতেই আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আর তোমার সম্বন্ধেও তাহলে বলি—নারী মহামায়ার কায়া, তাই সকল অবস্থায় তিনি শুদ্ধা ও শ্রদ্ধেয়া—এ ধারণা আমি পোষণ করে থাকি। সুতরাং সংশয়ের স্থান এখানে নেই। এখানে আমার কতটুকু প্রতিষ্ঠা, কি অবস্থায় আমি থাকি, সেটা আমি তোমাকে খানিক পরেই বলব। এই বাড়ীর উপরতলায় ভিতরের দিকে ছোট একটি মহল আছে; সেখানে একখানি থাকবার ঘর, স্নানের জায়গা, রান্নার ব্যবস্থা সবই আলাদা। মহলের সংগে কোন সম্বন্ধ নেই। বার মহলে একখানি ঘরে আমি কেবলমাত্র ছবির কাজ করি। আমার শয়নকক্ষ এই নীচেই। চল তোমাকে সব দেখিয়ে দিই; কাপড়-চোপড় এসে পড়লেই স্নান করে বা গা ধুয়ে বিশ্রাম করবে। তার আগে কিঞ্চিৎ জলযোগ ত' করা চাই।'

বিনা প্রতিবাদে অতঃপর দেবী নরেনের সংগে উপরতলায় গিয়ে তার মহলটি দেখে, আর মনে মনে ভাবতে থাকে—বিধাতা তাকে

নরক হতে এ কোন্ স্বর্গে এনে এভাবে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু খানিক পরে দেবী নরেনের মুখে তার বৃত্তান্ত শুনে নরেনকে অনুরোধ করে বলে—'দেখুন, একটু আগে আপনি বলেছেন—নারী মাত্রেই মহামায়ার কায়া আর সব অবস্থাতেই শুদ্ধা ও শ্রদ্ধেয়া। তাহলে আমার কথা হচ্ছে—এই নারী-অতিথির ওপর আপনার এই ক্ষুদ্র গৃহস্থালিটির ভার দিতে হবে। চা-জলখাবার থেকে ছু'বেলার রান্নাবান্না আমিই করব নিজের হাতে ; আমি থাকতে আপনাকে কুকারে রান্না করতে দেব না। আপনি শুধু আপনার ছবির কাজ করে যাবেন ; আমিই আপনাকে বলব কোন্ দিন কি আনতে হবে। তার পর আপনাকে আর কিছুই দেখতে হবে না।'

নরেন একথা শুনে একবার শুধু দেবীর মুখের পানে তাকায় এবং তার মুখের ভঙ্গি দৃষ্টে প্রসন্ন মনে জানায়—বেশ, তাই হবে।

অতঃপর বাঁধাধরা নিয়মে নির্ঝঞ্ঝাটে দিনের পর দিন রেণু-নিবাসে এই ছুটি তরুণ-তরুণীর দিন কাটতে থাকে। কেবলমাত্র প্রাতঃকালে প্রাতরাশের সময় এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যভাগে ভোজনকালে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। সে সময় দেবী সযত্নে নরেনের পরিচর্যা করে।

অতি আপনার জনের মত দেবীর সাগ্রহ যত্নে নরেনকে বিব্রত করে তোলে। কিন্তু দেবীর খাওয়া-দাওয়া সবই সংগোপনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেদিকে নরেন আগ্রহ প্রকাশ করলে সে বলে যে, এদেশের মেয়েরা যে ভাবে সংসার চালায়, রান্নাবান্না করে পুরুষদের আগে যত্ন করে খাইয়ে তার পর আড়ালে বসে খাওয়ার পাট সারে—ছেলেবেলা থেকে সে শিক্ষা আমি পেয়েছি। অতিথি হলেও আমাকে ঐ অভ্যাস ছাড়বার জন্যে কিন্তু অনুরোধ করবেন না।

সেই অনুরোধ কোন দিন নরেন করে নি। তবে প্রথম প্রথম ছু' একদিন অনুসন্ধান করেছিল যে, তার অতিথি নিজের জন্য আহার্যাদি রেখেছে কি না!

নরেনের মুখে দেবী গৃহস্বামীর সম্বন্ধে এটুকু মাত্র জেনেছে যে, সস্ত্রীক তিনি বোম্বাই গিয়েছেন। সেখানে তাঁর জম-জমাট কারবার। নরেন এমন আশ্বাসও দিয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রীও দয়াবতী। তাঁরা ফিরে এলে সে দেবীকে কন্যার মত এ-বাড়ীতে আশ্রয় দেবার জন্য অনুরোধ করবে। সেই সময় দেবী তার কাহিনীও বলবে। দেবীর সম্বন্ধে নরেন এই মাত্র জেনেছে, —সে অসহায়, নিরাশ্রয়, সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। তার প্রতিপালক বিশ্বাস করে যার হাতে তাকে সমর্পণ করে যান, সে ব্যক্তি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করায় সে পালিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় নরেনকেও অত্যন্ত সতর্কতার সংগে দেবীকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হচ্ছে। তার প্রধান আশঙ্কা, পাছে মালতী কোনদিন হঠাৎ এই ফ্লাটে এসে দেবীকে দেখে ফেলে এবং সেই সূত্রে অনর্থ বাধিয়ে বসে। সেজন্যে নরেন দেবীকে মালতী সংক্রান্ত ব্যাপারও যতখানি বলা উচিত, জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করে রেখেছে। এই মালা মেয়েটির আলেখ্য তোলবার জন্য যে নরেন সেদিন প্রতীক্ষায় ছিল এবং দেবী এসেই তার আশা-প্রতীক্ষা আর একদিক দিয়ে সার্থক করেছে, এ খবরও দেবী জেনেছে।

দেবীর আসবার পর নরেনের চিত্রাঙ্কনের কাজ দিবারাত্রি অবিরাম গতিতে চলছে। ইতিমধ্যেই সে দেবীকে আদর্শ করে তার সিদ্ধ হস্তের তুলিকায় অপরূপ এক আলেখ্য এঁকে ফেলেছে এবং সংগে সংগেই সেখানি তার অধ্যাপক ডাঃ রজত রায়ের মাধ্যমে গ্র্যাণ্ড হোটেলে পিকচার একজিবিশনের কর্তৃপক্ষের বরাবর পাঠিয়ে দিয়েছে। ছবির নামকরণ করেছে—'ভারত মহিলা।' অধ্যাপক ছবিখানি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বিস্তর প্রশংসা করেছেন।

॥ উনত্রিংশ ॥

যেদিন সকালের দিকে নরেন ছবিখানি নিয়ে অধ্যাপকের বাসায় যায়, সেইদিন তার অবর্তমানে তার ফ্লাটে এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মালতী ক'দিন ধরে লক্ষ্য করেছে, এদিকের ফ্লাটের দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে, কড়া নাড়লেও কেহ খুলে দেয় না। তার ধারণা, সেদিনের ব্যাপারে শিল্পীর মনে নিশ্চয়ই অভিমান হয়েছে ; সেই জন্যই এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা। কিন্তু তাদের ফ্লাটের ছাদ হতে একদিন এদিকের ফ্লাটে সাড়ীর একটা অংশ উড়তে দেখে সে চমকে উঠে। এ ফ্লাটে শাড়ী পরবার মত কেহ এসেছে নাকি ? ফ্লাটগুলি এমনভাবে নির্মিত যে, এক ফ্লাট হতে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে অন্য ফ্লাটের কিছুই দেখা যায় না—ছাদের দিকেও ঐরূপ আড়ালের ব্যবস্থা। কিন্তু বাতাস সেদিন অনর্থ বাধিয়ে দেয়—শাড়ীর খানিকটা অংশকে ঊর্দ্ধাকাশে তুলে। পর-দিনই সকালে আপন-ভোলা শিল্পী সম্ভবতঃ রন্ধনরতা দেবীকে নীচের দরজা বন্ধ করবার জন্য না ডেকেই ভুলক্রমে চলে গিয়ে থাকবে এবং সেই অবকাশে মালতী আচম্বিতে মুক্ত দ্বারপথে ফ্লাটে প্রবেশ করে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই উঁকি দিয়ে মালা দেখল, শিল্পীর সাধনা-ঘরখানির দরজা বন্ধ, কড়ায় তালা ঝুলছে। ঘরের সামনের দালান ও দরদালান অতিক্রম করে সে ভিতর মহলের দরজার সামনে গিয়ে দেখল, ভিতর হতে বন্ধ করা হয়েছে। মালতী সেদিন এসে দেখেছিল, আগের ঘরখানির সামনে দালানে এই সময় শিল্পীর কুকার তার আহার্য প্রস্তুত করছে। কিন্তু আজ তার চিহ্ন নেই। তবে কি শিল্পী ভেতরের পাকশালায় কুকার নিয়ে পড়েছে ! কিম্বা···সন্দিগ্ধ-ভাবে মালতী ধীরে ধীরে রুদ্ধ দরজার কড়া তুটি বাজাতে লাগল।

রান্নার পাট সেরে দেবী তখন অবসর পেয়ে মাথার ভিজে চুলগুলি

আঁচড়াচ্ছিল দীর্ঘ মুকুরখানির সামনে দাঁড়িয়ে। কড়া নাড়বার শব্দে তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলতেই দেখল, সম্মুখে তারই সমবয়সী সুসজ্জিতা এক তরুণী—পরণে তার সোনালী রঙের শাড়ী, পায়ে লাল রঙের নাগরা, মাথায় কাপড় নেই, অাঁচলখানি পিছনের দিকে এলো খোঁপার পাশ দিয়ে লুটাচ্ছে।

মালতী ভেবেছিল, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে শিল্পী ছুটে এসে দরজার সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু সে স্থলে যে মুর্তি দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। দু'চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করে সে দেখল, চওড়া লাল পাড়ের বাহার দেওয়া সাদা ধবধবে শাড়ী পরা এক নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে ঠিক তার সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে। মুখখানি তার হাসি হাসি হলেও কৌতুক যেন তার সহিত মিশে ঝলমল করছে ; এক রাশি কাল চুল সমস্ত পীট ঝাঁপিয়ে পড়েছে ; হাতে তার মোটা দাড়ার একখানি দেশী চিরুণী—দেখেই বুঝতে পারল মালতী কড়ার আওয়াজ পেয়েই মেয়েটি চুল অাঁচড়াতে অাঁচড়াতে ছুটে এসেছে দরজাটি খুলে দেবার জন্য।

বিস্মিতা মালতীকে অধিকতর বিস্ময়ান্বিতা করে দেবীই প্রথমে কথা বলল। বিহসিতমুখে প্রশ্ন করল : আপনিই বুঝি মাঝের ফ্লাটের মিস্ মালতী ?

দেবীর মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মালতী জিজ্ঞেস করল : আপনার সংগে কোন পরিচয় ত' আমার নেই, নাম জানলেন কি করে ?

মুচকি হেসে দেবী উত্তর দিল : নাম ছড়িয়ে বেড়ানো যাদের পেশা, পরিচয় না থাকলেও তাঁদের জানতে দেরী হয় না।

কথাটা ভাল লাগল না মালতীর। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল : আমরা ত' জানি এখানে একজন আর্টিষ্ট থাকেন—ছবি অাঁকেন তিনি। তাঁকে ডাকতেই চুল অাঁচড়াতে অাঁচড়াতে এসে আপনি সাড়া দেবেন, তা ভাবি নি।

মুখের হাসি আরও একটু তীক্ষ্ণ করে দেবী বলল : কিন্তু এটাও

আপনার জানা উচিত ছিল—ছবি আঁকতে হোলে মডেল চাই; আর যারা চিরুণীতে এলো চুল আঁচড়ায়—তারাই মডেল হোয়ে আসে শিল্পীর কাছে।

দু'চক্ষু বড় করে মালতী জিজ্ঞেস করল: আপনি কি তাহলে নরেনবাবুর মডেল হয়ে এসেছেন এখানে?

তেমনই হাসিমুখে দেবী জবাব দিল: আপনার সৌজন্যেই এ চান্সটা আমার জীবনে এসে গেছে।

রুক্ষস্বরে মালতী জিজ্ঞেস করল: তার মানে?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে দেবী বলল: বুঝতে পারেন নি—সত্যি বলছেন?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে মালতী বলল: আপনার সংগে দিব্যিদিলেসা করতে আসিনি; কি মনে করে ঐ কথাটা বললেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।

একটু গম্ভীর হয়ে দেবী বলল: তাহলে আট দিন আগের কথা আপনাকে মনে করতে বলছি। বেলা চারটের সময় নীচের ঘরে শিল্পীর সামনে আপনার সিটিং দেবার কথা থাকে। আপনি না আসায় শিল্পীর যোগাড়-যন্তর যখন পণ্ড হতে বসেছিল—কাজ খুঁজতে খুঁজতে সেই সময় আমি এসে পড়ি; আপনার আসনে তখন আমাকেই বসিয়ে শিল্পী তাঁর কাজ শেষ করেন। কথাটার মানে এখন বুঝতে পেরেছেন?

মুখখানা বিকৃত করে ঘৃণার ভঙ্গিতে ও সুরে মালতী বলে উঠল: ননসেন্স! আমার ত' আর কাজ নেই—একটা লোফারের সামনে বসে তার মডেল হওয়া আমি ডিসগ্রেস মনে করি।

শ্লেষের সুরে দেবীও সংগে সংগে জিজ্ঞেস করল: কিন্তু সেই লোফারের সামনে হাত পেতে এই উদ্দেশ্যেই যখন পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়েছিলেন, তখনো কি আপনার মনে এই বিরাগটুকু ছিল?

দেবীর কথাগুলি ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত মালতীর হৃদয়টি বুঝি তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করল—তার সুন্দর মুখখানি মুহূর্ত মধ্যে কালো হয়ে গেল। এত বড় কথা এ পর্যন্ত কেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে

বলতে পারে নি! আজ কি না বাজারের একটা ভাড়াটে মেয়ে এ বাড়ীতে উড়ে এসে তাকে অপমান করে? কিন্তু তার কথার উত্তর দেবার মত ভাষা না পেয়ে মালতী এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। ডান হাতখানা সবেগে তুলে দেবীর গণ্ডের দিকে চালিয়ে দিল। দেবী বোধ হয় জানত, মুখের দৌড় কমলে হাত সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার এই অভিজ্ঞতা সার্থক হল। মালতীর হাত তার গণ্ডে পড়বার আগেই সে নিজের হাতের অভ্যস্ত কৌশলে মালতীর হাতখানা চেপে ধরল এবং মণিবন্ধের দুর্বল স্থানটিতে এমন টিপুনি দিল যে, মালতীর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সেই সংগে বিবর্ণ মুখ দিয়ে যন্ত্রণার সুরে আর্তস্বর বা'র হল—মাগো!

ওদিকে কিছু পূর্বে এদের কথা কাটাকাটি শুনে নরেন নিঃশব্দে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং এই অনর্থের জন্য নিজের অসতর্কতামূলক ভ্রমকেই দায়ী করছিল মনে মনে। সংঘাতের এই মোক্ষম সময় নিকটে এসে উদ্বেগের সংগে বলল: এ কি কাণ্ড?

মালতী অসহায়ভাবে আর্ত করুণ দৃষ্টিতে নরেনের দিকে তাকাল—সে দৃষ্টি দিয়ে তার দৈহিক যন্ত্রণার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। নরেন মিনতির সুরে দেবীকে লক্ষ্য করে বলল: ওকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু দেবীর মূর্তি একেবারে বদলে গেছে। তার দু' চক্ষু দিয়ে যেন আগুনের হলকা বের হচ্ছে—তার আভায় মুখখানাও ঝলমল করছে যেন। নরেনের মিনতি বোধ হয় তার কর্ণ স্পর্শও করে নি। এই সময় মালতী ধনুকের মত বেঁকে এলিয়ে পড়বার মত হয়ে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল—'খুন করলে আমাকে—মাগো!' কিন্তু বেদনায় আড়ষ্ট কণ্ঠ দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে সে স্বর বের হল।

নরেন তখন কম্পিত কণ্ঠে যুক্ত করে মিনতি জানাল: সত্যই মরে যাবে—ওকে ছাড়···আমার অনুরোধ।

মালতীর হাত ছেড়ে দিয়ে দেবী উত্তেজিত কণ্ঠে বলল: যা হয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে আমি বলছি—শুনে আপনি বিচার করুন।

নরেন বলল : আমি সব শুনেছি ; তোমার কোন দোষ নেই। অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকার চর্চার জন্য ওঁর লজ্জা পাওয়া উচিত।

দেবীর চক্ষু দিয়ে তখনও যেন অগ্নিশিখা বের হচ্ছিল। মালতীর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দৃপ্ত স্বরে বলল : আমার গায়ে কেউ হাত তুললে সে হাত আমি আস্ত রাখি না। আপনার কথাতেই ওঁর হাতখানা রক্ষা পেল।

দেবীর এই পরিবর্তিত রূপ মালতীর চোখে পড়তে এই অবস্থাতেই হঠাৎ সে চমকে উঠল! তার মনে পড়ল—একে সে দেখেছে। হ্যাঁ, এই চোখ, এই মুখ, এই ভঙ্গি! সেদিন প্রমোদ-মজলিসে মঞ্চের উপর যে মেয়েটি নায়িকা রাণী সেজে নেচেছিল, প্রথম অঙ্কের পর যে পালিয়ে যায়, সেই মেয়েটিই—এখানে এই ফ্লাট বাড়ীতে শিল্পী নরেনের মডেল হয়ে লুকিয়ে আছে। মালতী আজ নিজের লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে তাকে চিনেছে! আঙ্গিক কষ্টের দরুণ মালতীর বেদনাক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখেও অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বুকে বিজলী বিকাশের মত হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু তার মুখের এই পরিবর্তিত ভঙ্গিটুকু দেবীর দৃষ্টি এড়াল না।

বিশ্রস্ত বেশভূষা ও এলায়িত দেহটিকে গুছিয়ে সোজা করে মালতী টলতে টলতে দালানের দিকে গেল। তারপর সেখান হতে মুখখানি ফিরিয়ে শ্লেষের সুরে নরেনকে বলল : বুড়ো বাড়ী ছেড়ে যেতে না যেতেই আপনি এখানে মজা জমিয়েছেন ভালো?

নরেন বলল : কথাটার কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না।

'মানে না হয় আর এক দিন এসেই বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।'—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই মালতী দ্রুতপদে চলে গেল।

দেবী বলল : আজ আর ও কথার মানে বোঝাবার মত সাহস ওঁর মনে নেই। তাই ভয় দেখিয়ে গেলেন।

নরেন বলল : ওঁকে চটানো মানেই বোলতার বাসায় ঘা দেওয়া। ওঁর চেয়ে ওঁর মাকে আমার বেশী ভয়।

দেবী সহাস্যে বলল : সমবয়সীদেরই চিনি, আর তাদের সংগে ঝগড়া হলে আমি সব সময়েই জিতি। বেশ ত', বর্ষীয়সী ঝগড়াটে মেয়েদের গল্পই শুনেছি, একদিন মুখোমুখী না হয় হওয়া গেল। যাক্, আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি ভাত বাড়ি ততক্ষণ।

দেবী ভিতরে চলে গেল। নরেনও নীচে তার ঘরের দিকে নামতে লাগল।

হরপ্রসাদবাবুর প্রদত্ত তাঁর হারানো কন্যার বালিকা বয়সের ছবির বর্তমান আদলটি আন্দাজ করবার জন্য মালতীর স্থলে দেবীর পরিপুষ্ট অঙ্গের আদল দেখে শিল্পী নরেনকে দারুণ চিন্তায় পড়তে হয়। রাত্রির পর রাত্রি উপরের ছবি-ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কি সে ভাবতে থাকে। চিত্রবিদ্যাও যে অনেক স্থলে অঙ্কের মত মিলের অবকাশ রাখে, শিক্ষিত পটু শিল্পী নরেনকে গভীরভাবে অনুশীলন ও অনুভূতির প্রভাবে তা উপলব্ধি করতে হয়েছে। দিবারাত্রি পরিশ্রমের ফলে, সেই বালিকার বর্তমান সময়োপযোগী আলেখ্যটি আঁকবার পর, তাকে বার বার দেখে সে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছে। এদিকে দেবীকে আদর্শ করে যে ছবি এঁকে পিকচার একজিবিশনে পাঠিয়ে দিয়েছে, যদিও সে ছবি তার কাছে এখন নাই, কিন্তু তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতীতি জন্মেছে যে, হরপ্রসাদবাবুর বালিকা কন্যার প্রামাণ্য ছবিখানির সংগে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এক এক বার মনে হয়, হয় ত' দেবীকে দেখবার পর সে প্রভাবান্বিত হয়েই ঐ ছবি একেছে, সেইজন্য এই সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেবীর মূর্তির সংগে মিলিয়ে দেখা যদিও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, তা হলেও হরপ্রসাদবাবুর কন্যার পূর্ণায়তনের ছবি দেখে দেবীর পানে তাকালে মনে হয় যে, দেবীকে দেখেই সে এই ছবি এঁকেছে। কিন্তু শিল্পী নরেনের অঙ্কিত ছবির বরাবরের বৈশিষ্ট্য

এই যে, একখানি ছবির সংগে আর একখানি ছবির কোন সাদৃশ্যই ধরা পড়ে না। তথাপি নরেনকে রীতিমত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হতে হয়েছে বৈকি ? এই জন্যই ওদিকের কার্য সমাপ্তির পর সে অবসর সময়ে দেবীকে নাচের ঘরের সেই স্মরণীয় স্থানটিতে শ্রদ্ধার সংগে বসিয়ে এখন একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির আলেখ্য আঁকছে—হরপ্রসাদবাবুর কন্যাটির বহুদিনের মলিন আলেখ্যখানি যে ভঙ্গির প্রতিচ্ছবি রূপে রয়েছে। এই ছবির কাজ শেষ হলে দু'খানি ছবি সাজিয়ে সত্য নির্ণয় সহজ হবে। এ সম্বন্ধে কত আশায় চিত্ত অনবরত উদ্বেলিত হবার কথা ; কিন্তু নরেন সবলে হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ করে গভীর নিষ্ঠার সংগে কর্তব্য পালন করে চলেছে।

মালতী সেদিন ভালো করেই জেনেছে যে, প্রমোদ-আসরে সরকার সাহেবের সংগে পাশাপাশি বসে যে রূপসী নায়িকাটির নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছে, সকলেই ধন্য ধন্য করেছে এবং তার পর গ্রীণরুম থেকে শিকল কেটে পলায়ন করেছে—চারদিকে যার তল্লাস চলছে, আশ্চর্য যে, সেই মেয়েটিই রেণু-নিবাসে শিল্পী নরেনের 'মডেল' হয়ে সবার চক্ষুতে অনায়াসে ধূলো ছড়িয়ে দিয়েছে ! প্রথম দর্শনে সহজ অবস্থায় মালতী তাকে চিনতে পারে নি সত্য, কিন্তু ক্ষেপিয়ে দেবার পরই তার আসল রূপ ফুটে বের হয়েছে—এ সেই পলাতকা কন্যা না হয়ে যায় না। এখন সে মালতীর হাতের মুঠার মধ্যে। সরকার সাহেবের ফ্লাটে গিয়ে খবরটি দিলেই হল। কিন্তু মালতীর চিত্ত ইহা সমর্থন করল না। এই মেয়েটি যে সরকার সাহেবের মত বাহাদুর পুরুষের মনে দারুণ একটা আসক্তির সঞ্চার করেছে, সে কথা মালতীর অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং মালতীও যার প্রতি বিশেষ ভাবে ঝুকতে বাধ্য হয়েছে, তার হাতে এই মেয়েকে তুলে দেওয়ার অর্থ, নিজের স্বার্থকে খর্ব করা। না, না,

মালতী তা পারে না! তা ছাড়া, সরকার সাহেবের প্রমোদশালা সেই ব্যাপারের পর বন্ধ রয়েছে—তাঁকেও হরদম ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। সেখানে পুলিসের পাহারা বসেছে—মেয়েগুলিও পুলিসের হেফাজতে রয়েছে এবং পলাতক মেয়েটির সন্ধানও চলেছে। মালতী এই অবস্থায় বেনামী পত্র দ্বারা পুলিসকেই সাহায্য করা সমীচীন মনে করল। আবার তার মনে লোভেরও একটা মোহ আসল। বেনামী পত্রে পুলিসকে খবর দিলে, তার নাম ত' প্রকাশ পাবে না। সুতরাং যদি কিছু প্রাপ্তি-যোগ থাকে, তার ভোগে আসবে না। বিশেষতঃ মেয়েটা তাকে যে ভাবে লাঞ্ছিতা করেছে, তার ত' কোন প্রতিশোধই লওয়া হবে না। না, ঐ মুখরা ও গোঁয়ার মেয়েটাকে রীতিমত জব্দ করা চাই, নতুবা তার গায়ের জ্বালা যাবে না। সে আবার ভাবতে বসল। এবার স্থির করল যে, বোম্বায়ের ঠিকানায় হরপ্রসাদবাবুর নামে একখানা লম্বা চিঠি লিখে ডাকে পাঠালে কেমন হয়? এমন ভনিতা করে চিঠি লিখবে যে, বুড়া গিন্নীকে নিয়ে আসবার পথ পাবে না। সেই সময় সে তার মায়ের সংগে ও-বাড়ীতে গিয়ে আচ্ছা করে ঝাঁটা পিটিয়ে তাকে সায়েস্তা করবে।

পরদিনই মালতীর লিখিত পত্র বোম্বাই মেলে রওনা হয়ে গেল।

॥ ত্রিশ ॥

বোম্বাইয়ের মোকামে গিয়েই হরপ্রসাদবাবু ডাক্তার অধিকারীকে এই মর্মে এক পত্র লিখেছিলেন যে, তাঁর সংগে লিখিত চুক্তি অনুসারে এলাহাবাদের বাড়ী যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু, কন্যাকে ফিরিয়ে পাবার আশা তিনি ত্যাগ করেছেন।

ডাঃ অধিকারী সেই পত্রের উত্তরে তাঁকে জানালেন যে, এমন একটি মেয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, আকারে-বয়সে সে তাঁর কন্যা

রেণু না হয়ে যায় না। শীঘ্রই তাকে এলাহাবাদে আনা হবে। আসবামাত্র তিনি হরপ্রসাদবাবুকে তার করবেন। তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সংগে নিয়ে চলে আসেন।

ডাঃ অধিকারীর চিঠির সুরে বোধ হল, তিনি হরপ্রসাদবাবুর নিরুদ্দিষ্টা কন্যার নিশ্চিত সন্ধানই পেয়েছেন। সুতরাং এই সংবাদ বোম্বাইয়ের ভবনে আশা ও আনন্দের উদ্দীপনা যেন নূতন করে জাগিয়ে তুলল। তিনি যখন সাগ্রহে ডাঃ অধিকারীর তারের প্রতীক্ষা করছিলেন, সেই সময় কলকাতার রেণু-নিবাস হতে শ্রীমতী মালতীর লিখিত পত্রখানা উপস্থিত হয়ে তাঁকে নূতন এক চিন্তায় দারুণ ভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

মালতীর দীর্ঘ পত্রের মর্ম এই যে, হরপ্রসাদবাবুরা বোম্বাই সহরে যাবার দু' এক দিন পরেই তাঁর আশ্রিত শিল্পী নরেনবাবু এক যুবতী রূপজীবিনীকে উপরতলার ঘরে এনে আশ্রয় দিয়েছে। এই বাড়ীতেই সে থাকে। একদিন মালতী গিয়ে আপত্তি করায় সে যে কাণ্ড বাধিয়েছিল, কেবল গৃহস্বামীর মুখের দিকে চেয়েই সে তা সহ্য করেছে। আবার শোনা যাচ্ছে, সেই মেয়েটির নামে নাকি সরকারের হুলিয়া আছে। এ অবস্থায় আপনার আর কালবিলম্ব না করে অন্ততঃ দু' চার দিনের জন্যও এখানে আসা উচিত—নতুবা আপনার হাতেও পুলিসের দড়ি পড়বে।

হরপ্রসাদবাবু খবরের কাগজে মেয়ে এনার্কিষ্টদের কাহিনী পড়েছেন। হয় ত' ভাল মানুষ নরেন ছোকরা এই ধরণের কোন জবরদস্ত মেয়ের পাল্লায় পড়ে তাকে খালি বাড়ীতে এনেছে। তিনি এ সম্বন্ধে আর লেখালেখি না করে তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাড়ি দেবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। ডাঃ অধিকারীকেও এই মর্মে এক পত্র লিখলেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। যে কন্যার কথা তিনি লিখেছেন, এলাহাবাদে এলেই তাকে নিয়ে তিনি যেন কলকাতায় 'রেণু-নিবাসে' উপস্থিত হন।

বিশিষ্ট অধ্যাপক ডাঃ রজত রায়ের উৎসাহে শিল্পী নরেন পিকচার্স একজিবিশনের জন্য 'ভারত মহিলা' ছবি অঙ্কিত করে এবং যথাসময় তাঁরই মাধ্যমে গ্র্যাণ্ড হোটেলে পাঠিয়ে দেয়। কয়েক শত ছবির মধ্যে নরেনের অঙ্কিত ছবিই শুধু যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে তা নয়—ছবিখানি এতই উচ্চাঙ্গের হয়েছে বলে প্রশংসা লাভ করে যে, এরূপ প্রতিযোগিতায় পূর্বতন রেকর্ডগুলিও ভাঙ্গিয়া দেয়। প্রতিযোগিতার ফল অধ্যাপক ডাঃ রায় জানতে পেরে আনন্দে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, কোন প্রকারে রাত্রিটি অতিবাহিত করে পর দিন সকালে প্রাতরাশের পর নিজেই খবরটি বহন করে রেণু-নিবাসে নরেনের ফ্লাটে উপস্থিত হন।

দেবীর সিটিং দেবার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন শিল্পী নরেন রঙ্ তুলির সাহায্যে ছবিখানি সম্পূর্ণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। উপরের নিভৃত ঘরে হরপ্রসাদবাবুর বালিকা কন্যার আলেখ্যটির আদর্শে তার যৌবনকালের যে ছবির কাজ সে শেষ করে রেখেচে, দেবীর ছবির উপর রঙ্ ফলাবার পর বিস্ময়ে তার চোখের পাতার স্পন্দন থেমে যায়। এ কি আশ্চর্য সাদৃশ্য উভয় ছবির মুখে-চোখে, অঙ্গ-সৌষ্ঠবে? উপরন্তু কয়েকটি সহজাত নিদর্শন ছ'খানি মুখের একইভাবে এমন বৈশিষ্ট্যবর্ধন করেছে, যা সত্যই বিস্ময়কর। ছ'খানি ছবির মুখ মিলিয়ে বিশেষ করে সে এটুকুই লক্ষ্য করেছে যে, উভয় মুখেই চিবুকের ঠিক কোলেই এক জোড়া তিল টিপ্ টির মত ফুটে সুন্দর মুখের সৌন্দর্যটুকু যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। উভয় চিত্রেই চোখ ছুটি অনন্যসাধারণ! চোখের তারাগুলি যেমন ডাগর, ভাসা ভাসা ও প্রতিভাব্যঞ্জক, চোখের উপরে টানা জোড়া ভূরু ছুটি তেমনই চমৎকার।

এই সাদৃশ্য লয়ে চিন্তা ইদানীং শিল্পী নরেনের নিয়মিত কাজের মত হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত সে কিছুই সাব্যস্ত করতে পারে নি।

সেদিন সকালের দিকে প্রাতরাশ সেরে নরেন নীচের ঘরে এসে সবে মাত্র বসেছে, এমন সময় দরজার সামনে একখানা মোটর গাড়ী এসে থামল। গাড়ীর ভিতরে ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ রজত রায়। দ্বারের কড়া নাড়তেই নরেন তাড়াতাড়ি উঠে দ্বার খুলে সবিস্ময়ে বলল : স্যার! আপনি নিজে এসেছেন?

প্রফেসর গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে সহাস্যে বললেন : উঠে এসো শীগগির, পনেরো মিনিটের মধ্যে গ্রাণ্ড হোটেলে পৌঁছাতে হবে।

শিল্পী মানুষ নরেন, সব সময়ই একটু ফিটফাট হয়ে থাকতে অভ্যস্ত। গায়ে একটা হাল্কা রঙের সুশ্রী সার্ট, পরণে পরিচ্ছন্ন ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডেল ও হাতে রিষ্টওয়াচ দেখে সাদাসিধা পরিচ্ছদের পক্ষপাতী অধ্যাপক রজত রায় তাকে আর বেশ পরিবর্তনের অবসর দিলেন না। দেবীর কথা নরেন অধ্যাপককে বলে নাই। সুতরাং দেবীকে ডেকে বাইরের দরজা 'বন্ধ' করবার আর নির্দেশ দেয়া হল না। 'আসছি স্যার'। বলে ঝাঁ করে ভেতরে ঢুকে তার ষ্টুডিয়োর দরজায় তালাবন্ধ করল এবং বাইরের দরজাটি সশব্দে টেনে বন্ধ করে মোটরে উঠে বসল। সোফারও মোটরে ষ্টার্ট দিল।

নরেন ভেবেছিল, সতর্ক দেবী দরজা বন্ধের শব্দে সচকিত হয়ে নীচে ছুটে আসবে এবং বাইরের ঘর বন্ধ দেখে ভেতর হতে সদর দরজা বন্ধ করে দিবে। কিন্তু এখানে শিল্পীর হিসাবে ভুল হয়েছিল। দেবী তখন ওপরতলার অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশ স্নানের ঘরে এক সংগে কলগুলি খুলে দিয়ে বালিকার মত চপলচাঞ্চল্যে স্নান করছিল। বাইরের দরজা বন্ধের শব্দ তার শ্রুতি স্পর্শ করে নি।

নরেনের হিসেবে আজ আরও একটি মোক্ষম ভুল হয়েছিল। নীচে নামবার আগে ওপরের ছবিঘরে একটিবার ঢুকে রেণুর সদ্য-সমাপ্ত আলেখ্যটির আবরণ সে খুলে দিয়ে যেত এবং আহারের সময় উপরে এসে ঘরের চাবি খুলে অতি সন্তর্পণে ছবির উপর পুনরায় আবরণ টেনে দিত। এদিন ঘরে ঢুকে আবরণটি সরিয়ে প্রয়োজনীয় একটা জিনিস

তুলে নেয়, তার পর দরজাটি বন্ধ করেই আত্মভোলা মানুষ নরেন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়—বন্ধ দরজায় এদিন আর তালা পড়ে নি।

প্রত্যূষে ওঠা নরেনের মত দেবীরও বরাবরের অভ্যাস। নরেন নীচে নেমে গেলেই সে একটু বেশীক্ষণ ধরে স্নান করে। তারপর তাদের দু'জনের মত ক্ষুদ্র সংসারটির কাজকর্ম নিয়ে পড়ে। কিন্তু শিল্পী নরেনের পক্ষে কোনদিনই বেলা বারোটার পূর্বে স্নানাহার সম্ভব হয় না। সেজন্য একটু বেলা করেই দেবী রান্না করে থাকে। প্রত্যহই ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় স্নানের জন্য নীচে গিয়ে নরেনকে তাড়া দেয়। নির্দিষ্ট স্থানে স্নানের এবং স্নানান্তে প্রসাধনের সকল ব্যবস্থাই প্রস্তুত থাকে। প্রথম প্রথম অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে নরেন প্রতিবাদ তুলেছিল, কিন্তু টেঁকে নাই। অগত্যা নীরবেই তাকে দেবীর এই সব পরিচর্যা স্বীকার করে নিতে হয়। নীচের তলাতেই নরেনের আর সব কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, কেবল সকালে ওপর তলার ছবির ঘরে বার দুই এবং ভোজনকালে দু' বেলা দু'বার উঠতে হয়। বৈকালী জলখাবার দেবী নিজেই নীচের ঘরে এসে রেখে যায়। এভাবে একই বাড়ীর দুটি তলায় দুটি নরনারীর জীবন-যাত্রা চলছিল।

এ দিনও ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় দেবী নরেনকে স্নানের জন্য তাড়া দেবার উদ্দেশ্যে নীচে যাচ্ছিল। কিন্তু সিঁড়ির কাছে পাশের ঘরখানার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে সবিস্ময়ে দেখল, ঘরের দরজা বাতাসে খুলে গেছে ও সামনেই সদ্য-সমাপ্ত আবরণ-মুক্ত পূর্ণায়তনের একখানি অপরূপ তৈল-চিত্রের ঔজ্জ্বল্যে ঘরখানি যেন হাসছে!

এ-ঘরখানি কোন দিনই দেবী এভাবে উন্মুক্ত দেখেনি। শিল্পী নরেন যে গৃহস্বামীর কোন পরিজনের তৈলচিত্রাঙ্কণের জন্যই ঘরখানি ব্যবহার করে থাকেন, জানা থাকলেও, কোন দিন এই ঘরের ভেতরে সে উঁকি পর্যন্ত দেয়নি বা এ ঘরে বসে শিল্পীর শিল্পচর্চা দেখবার জন্য আগ্রহশীলও হয়নি। এদিন মুক্ত দ্বারপথে এ ভাবে কক্ষমধ্যে

অনাবৃত আলেখ্যখানির ওপর তার চক্ষু পড়তেই, ভেতরে গিয়ে ভাল করে ছবিখানি দেখবার প্রলোভন সে সম্বরণ করতে পারল না। দেবীর মনে হল, ছবির মেয়েটি যেন তার ভাসা ভাসা মোহময় চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করে তাকে আহ্বান করছে। অভিভূতার মত সে ছবিখানির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। অপূর্ব ছবির অপূর্ব চক্ষুর সংগে তারও অপূর্বতাময় চক্ষু দুটির যেন অপূর্ব সংযোগ ঘটেছে। দেবীর দু' চক্ষু নিষ্পলক, মুখে কথা নেই।

ছবির মেয়েটিকে দেখে দেবী এতই তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, বাইরের দরজার সামনে একখানা গাড়ী এসে থামবার শব্দ, লোকজনের কলরব এবং সিঁড়ি দিয়ে তাদের উপরে উঠবার পদশব্দ পর্যন্ত তার খেয়াল নেই। সে বুঝি এতক্ষণ ছবিখানির দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তার মধ্যেই আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল। মালতীর তীক্ষ্ণস্বরে সে পলকে প্রকৃতিস্থ হয়ে দরজার দিকে চাইল।

দেবী দেখল—মালতী যেন রণং দেহি মুর্তিতে দ্বারমুখে দণ্ডায়মান। তার নাগরা-মণ্ডিত একখানি পা পড়েছে ঘরের ভেতরে, আর একখানি পা চৌকাঠের ওপর রেখে দালানের দিকে সমবেত কয়েকজন আগন্তককে উদ্দেশ্য করে বলছে: এই যে, বিদ্যাধরী এখানে গো!

এ সম্ভাষণে দেবীর প্রকৃতিও উগ্র হয়ে উঠল। সে ভাবল, সে দিনের সেই মেয়েটি আজ লোকজন সংগে এনে তার পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছে এবং তারা এখনই হয়ত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করবে। দেবীর আপাদমস্তকে যেন বৈদ্যুতিক ঝাঁকি লাগল নিজের অন্যায় আচরণের জন্যে। এই নিষিদ্ধ ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করে কত বড় অন্যায় কাজ সে আজ করে বসেছে! তারই দোষে, শিল্পীর গোপনীয় চিত্র বাইরের দশজনে দেখে যাবে। তবে কি শিল্পী নীচের ঘরে নেই?

ভাববার অবসরই বা কোথায়—ঝাঁ করে সহজাত বুদ্ধি তার মাথায় আসতেই, সর্বাগ্রে সে বিদ্যুদ্বেগে ছবিখানির উপর আবরণ

টেনে দিল। পরক্ষণে মালতীর রূঢ় উক্তির উত্তর স্বরূপ সেও রূঢ় ভঙ্গিতে মালতীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলিষ্ঠ দুটি হাতে তার কাঁধটি ধরে পুতুলটির মত তাকে তুলে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে দিল; সেই সংগে নিজেও বাইরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ করে কড়ায় দোদুল্যমান তালাটি চাবি বন্ধ করে নিজের আঁচলের খোঁটে বেঁধে রাখল।

এমন যে হবে, মালতী তাহা কল্পনাও করে নি। যে মেয়েটিকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বা'র করে রাস্তায় দাঁড় করাবার জন্য সে আটঘাট বেঁধে বিজয়িনীর মত এখানে হাজির হয়েছে, সেই মেয়েটাই যেন এক লহমার মধ্যে চর্কি ঘুরিয়ে দিল। সবার সামনে তারই ঘাড় ধরে যেন পাখীটির মত তুলে বা'র করে দিল! মেয়ে মানুষের হাতে এত জোর! নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে এখন সে মারমুখী হয়ে তর্জনের সুরে বলল: আমাকে তুমি ছুঁতে সাহস কর—এত তোমার তেজ, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মাথায় আঁচলখানা অল্প তুলে দিয়ে দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চেয়ে বলল: এ তিরস্কার আপনারই প্রাপ্য; অন্যায় আপনি করেছেন বলেই আপনার গায়ে আমাকে হাত দিতে হলো।

কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে মালতী বলল: আমি অন্যায় করেছি! মুখ সামলে কথা বল, বলছি।

সংযত কণ্ঠে দেবী উত্তর দিল: যা করেছেন, তাই আমি বলছি। জুতো পায়ে দিয়ে আপনি ঘরের ভেতরে ঢুকেছিলেন।

উদ্ধত কণ্ঠে মালতী ঝঙ্কার দিয়ে বলল: বেশ করেছি—তাতে কি হয়েছে?

দেবী এখানে কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ দৃঢ় করে বলল: ঐ ঘরে বসে যিনি মা সরস্বতীর সাধনা করেন, তাঁকে অপমান করা হয়েছে!

সমবয়স্কা দুটি তরুণী মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যতক্ষণ এ-ভাবে কথা-কাটাকাটি করছিল, অদূরে দালানে দাঁড়িয়ে সকলেই তা আগ্রহ-

সহকারে শুনছিলেন। সবার পিছনে ছিলেন মালতীর মা ইন্দিরা দেবী। দেবীর এ কথার পর তাঁর পক্ষে আর ধৈর্যধারণ করা সম্ভব হল না, তিনি পিছন থেকেই গর্জে উঠলেন: ওরে আমার ভাট্পাড়ার ঠাকরুণ রে! ঝাঁটা মেরে তোমার নিষ্ঠেপনা ঘুচাচ্ছি, দাঁড়াও!

কথা বলতে বলতে তিনি পাশ কাটিয়ে দেবীর দিকে ধাওয়া করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে বর্ষীয়ান পুরুষটি বাধা দিয়ে বললেন: থাম, মালতীর মা! মেয়েতে মেয়েতে কথা কাটাকাটি করছে—তুমি কেন ছুটছ ওদের মধ্যে! ঐ মেয়েটির কথাগুলি আমার ভারি মিষ্টি লাগছে।

মালতী অমনি ফোঁস্ করে উঠল: বৃদ্ধের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে বলল: তা মিষ্টি যখন লেগেছে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন—কোলে বসিয়ে মিষ্টিমুখ করান?

আগন্তুকদের দলে বৃদ্ধের গৃহিণীও ছিলেন। ইন্দিরা দেবীর প্রায় সমবয়স্কা হলেও তিনি তাঁর মত কিন্তু নারীজাতির সহজাত লজ্জাকে ত্যাগ করতে পারেন নি এখনও। স্বামী নিকটে থাকায়, তাঁর মাথায় অবগুণ্ঠন ছিল, তা একটু সরিয়ে চাপা গলায় বললেন: তোর মেয়ের ভারি মুখ হয়েছে ইন্দিরা, লঘুগুরু জ্ঞান নেই, ছি!

ইন্দিরা দেবী তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনেই বললেন: একেই বলে কালের ধর্ম। যার জন্যে মায়ে-ঝিয়ের চোখে ঘুম নেই—সব যাবার জো হয়েছে দেখে চিঠি লিখে খবর দিয়ে আনানু—হাতেনাতে ধরিয়ে দেবার তরে। এখন তারে দেখেই মনে দরদ জেগেছে, তা কি বুঝিনি!

বৃদ্ধ কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেবীর কথায় তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল। দেবী তাঁর দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল: দেখুন আপনাকে দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে বলেই জিজ্ঞেস করছি—উনি কি আপনাকে উপরে আসবার জন্যে অনুমতি দিয়েছেন?

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন: কার কথা তুমি বলছ মা? কে অনুমতি দেবে?

দেবী বলল : নীচের ঘরে বসে যিনি ছবির কাজ করছেন—

ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ বললেন : বুঝেছি—নরুর কথা তুমি বলছ। কিন্তু সে ত' নীচে নেই—তার ঘর বন্ধ, অথচ বাইরের দরজা খোলাই ছিল।

বিদ্রূপের সুরে মালতী বলল : খাঁচা খুলে পাখী গেছে উড়ে! বোধ হয়, আগেই সাড়া পেয়েছিল। এখন বিদ্যাধরীর কাছে কৈফিয়ৎ নিন দাদু—বিনা অনুমতিতে আপনার বাড়ীতে কেন ওঁর এই অনধিকার প্রবেশ!

দেবীর দু' চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সুন্দর মুখে তার আভা পড়ল। ক্ষণকাল নীরব থেকে সহসা বৃদ্ধের দিকে মুখখানি ফিরিয়ে সে নম্রস্বরে বলল : এখন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কে! আমি ত' জানতুম না। তারপর কতকটা ওঁর ব্যবহারে হয়ত আমাকে কঠিন হতে হয়েছিল, তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আরও একটা কথা, নরেনবাবুর কাছে আমি আপনার কথা সব শুনেছি। তিনি আপনাকে গুরুজনের মতন ভক্তি করেন। তাই আমিও আপনাকে প্রণাম করছি।

দেবী তৎক্ষণাৎ নত হয়ে মাথাটি মেঝেয় ঠেকিয়ে গৃহস্বামী হরপ্রসাদ বাবুকে প্রণাম করল। তাঁর পিছনে অনুপমা দেবী দাঁড়িয়েছিলেন; দেবী তাঁকেও প্রণাম করল—কিঞ্চিৎ দূরত্ব বজায় রেখে! অর্থাৎ কাকেও সে স্পর্শ করল না।

হরপ্রসাদবাবু জিজ্ঞেস করলেন : ওঁকেও যে গড় করে ফেললে—ওঁর পরিচয় পেয়েছ?

দেবী বলল : পরিচয় না পেলে সহজে আমি কারুর পায়ের কাছে মাথা এমন করে নীচু করি না। ওঁকে দেখেই জেনেছি—এ বাড়ীর মা।

হরপ্রসাদবাবু বললেন : যাক্, মালতী যে কৈফিয়ৎ নেবার কথা বলছিল আমাকে, দেখছি তার আর প্রয়োজন নেই।

ইন্দিরা দেবী সংগে সংগে মুখখানা বিকৃত করে বলল : মাটিতে মাথা

ঠেকিয়ে গড় করতেই গলে গেলেন কাকা। ছি! ছি! সব রোক্ নিভে গেল নাকি? জিজ্ঞেস কর না ঐ কালামুখীকে—কোত্থেকে ওকে বা'র করে এনে আপনার বাড়ীতে তুলেছে? সে অনামুখোই বা ভয়ে ফেরার হলো কেন?

দেবী এবার কঠিন হয়ে কঠোর স্বরে বলল: যিনি এখানে নেই, তাঁর উদ্দেশে অমন করে ইতরের মত কথা বলবেন না বলছি। আপনার মত আমার মুখ আল্‌গা না হলেও, হাত দু'খানা কিন্তু ভারী শক্ত তা বলে রাখছি।

ইন্দিরা দেবী এই কথার পর অগ্নিমুখী হয়ে চীৎকার করে বললেন: কি বললি, মারবি নাকি? কিসের এত তম্বি তোর শুনি? আমরা কি বুঝিনে—কর্তাকে দেখেই সে হতচ্ছাড়া ভেগেছে?

দেবী দৃঢ় স্বরে বলল: ভাগবার মানুষ তিনি নন, অন্যায়ও তিনি করেন নি। আবার আমি আপনাকে বলছি, আমাকে যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু সেই দেবতাকে লক্ষ্য করে যদি অন্যায় কিছু বলেন, আমি আপনার মুখ চেপে ধরব।

দেবীর মুখভঙ্গি দেখে মালতীই এখন চাপা গলায় বলল: মা, চুপ কর তুমি—

কিন্তু সে কথা অগ্রাহ্য করে ইন্দিরা দেবী তর্জ্জন করে উঠলেন: থামব কেন, ওর ভয়ে—শাসানি শুনে? মুড়ো ঝাঁটা গাছটা ওবাড়ী থেকে আন ত' একবার দেখি—

হরপ্রসাদবাবু এই সময় বিরক্ত ভাবে বললেন: মালতীর মা, বলি এসব হচ্ছে কি? থামো তুমি, চেঁচিও না অমন করে।

মুখ বেঁকিয়ে ইন্দিরা দেবী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন: সাধ করে কি চেঁচাচ্ছি! বাইরে রোখ দেখালে, বললে—ঘাড় ধরে রাস্তায় বা'র করে দেবে—কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধাবে! তারপর ওপরে এসে—কালামুখীকে দেখে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ। যাদু জানে, যাদু জানে! তা আর জানিনে। ওর ওষুধ হচ্ছে—মুড়ো ঝাঁটা!

দেবী ধীরে ধীরে হরপ্রসাদবাবুর আরও সান্নিধ্যে এসে বলল : দেখুন, আপনাদের ব্যাপারটা আমার বোঝা হয়ে গেছে। উনি না এলে ত' আমাদের ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হবে না। স্নানাহারের জন্যে আমি ওঁকে তাড়া দেব বলে নীচে যাচ্ছিলাম—নীচের ঘরেই উনি ছিলেন। কিন্তু ভুলে এ ঘরখানিও খুলে রেখে গেছেন দেখে, আমি এই ঘরে সবেমাত্র ঢুকেছি, এমন সময় আপনারা ওপরে এলেন। আমার মনে হচ্ছে—তিনি নীচে থেকেই কোথাও গেছেন। এখন, আমার কথা শুনুন —তিনি না আসা পর্যন্ত যে-ঘর আপনারা তালাবন্ধ করে গেছেন, খুলে বসুন, বিশ্রাম করুন। আমি যথাসাধ্য আপনাদের সেবা করব।

মুগ্ধভাবেই গৃহস্বামী এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটির কথাগুলি শুনছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী উপরে উঠে সেই যে প্রথম মেয়েটির মুখের ওপর তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তা এ পর্যন্ত সরাতে পারেন নি—চুম্বকের মত তাঁর চক্ষু দুটিকে যেন ক্রমাগত আকৃষ্ট করছিল এর অপরূপ মুখমণ্ডল।

দেবীর কথার পর হরপ্রসাদবাবু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে তারপর বললেন : আমাদের ব্যাপারটা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও অনুমানের জোরে তুমি যেমন বুঝতে পেরেছ, এখানকার ব্যাপারটা কিন্তু আমার পক্ষে তত সহজে বোঝা সম্ভব হবে না, যে পর্যন্ত না আমি জানতে পারছি—নরুর সংগে তোমার সম্বন্ধ কি! কাজেই, তোমার কথামত এখন বিশ্রাম করবার আগেই আমার প্রশ্নটির জবাব তোমাকে দিতে হবে—নরুর সংগে তোমার কি সম্বন্ধ?

প্রায় সংগে সংগেই সিঁড়ির দিক হতে সুস্পষ্ট উত্তর এল : নরু নিজেই ও প্রশ্নের জবাব দেবে দাদামশাই!

চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করে সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান নরেনের কৌতুকোদ্ভাসিত সপ্রতিভ মুখখানির দিকে চেয়ে হরপ্রসাদবাবু বললেন : এই যে নরু—এসে গেছ তুমি! তাহলে সব কথাই আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছ ত'? এখন—

দ্রুতপদে উপরে উঠে সস্ত্রীক গৃহস্বামীকে নতমস্তকে প্রণাম করে নরেন বলল : সবই জানতে পারবেন; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় খুব একটা জরুরী অবস্থার সময় আপনারা এসে পড়েছেন। মা এখানে বিশ্রাম করুন; দেবী জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দেবে। বন্ধ ঘর দু'খানা খুলে দিয়ে আপনি একবার নীচে চলুন। জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি আপনার সংগে দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের বসবার জন্যে নীচের বৈঠকখানাটি খুলে দিতে হবে।

হরপ্রসাদবাবু অবাক হয়ে সেদিনের সেই অল্পভাষী আড়ষ্টপ্রকৃতির ছেলেটিকে লক্ষ্য করছিলেন—একটি মাসের মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে তার। দেহের শ্রী ফিরেছে, লাবণ্য যেন অংগে ধরছে না! কথায় সে আড়ষ্ট ভাবও নেই। লক্ষ্মী-শ্রী ভিন্ন দেহ-শ্রীর এতখানি শ্রীবৃদ্ধি ত' সম্ভব নয়! তবে কি এই মেয়েটির সংস্পর্শেই…

পরক্ষণে মৃদু হেসে হরপ্রসাদবাবু বললেন : বৈঠকখানা খুলে দিতে হবে—সে কি হে! তুমি কি তাহলে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সেখানে বৈঠক বসাও নি বলতে চাও?

নরেনের দু'চক্ষু প্রদীপ্ত হল। কিন্তু হরপ্রসাদবাবুর মুখ ও চক্ষু দেখে বুঝল যে, তিনি পরিহাসের ভংগিতেই ও-কথা বলেছেন!

এ অবস্থায় সে বলল : দেবা মেয়েটিকে এ-বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছি দাদামশাই নিজের দায়িত্বে। আপনি জানেন, আমি মিথ্যা বলি না। সব কথাই আপনি শুনবেন।

হরপ্রসাদবাবু বললেন : তাহলে বলি বাপু, সব কথার আগে একটা কথার জবাব তুমি আগেই দাও—আমার দেওয়া সেই ছবিখানা কি শেষ করেছ, না এইসব হাঙ্গামায় পড়ে শিকেয় তুলে রেখেছ?

শান্ত কণ্ঠে নরেন উত্তর দিল : আমি শিল্পী দাদামশাই! সেই ছবিখানির জন্যেই এত কাণ্ড! কিন্তু সে-ছবি এ পর্যন্ত ছবির স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ দেখে নি। চলুন দাদামশাই, নীচের কাজ সেরে এসে,

তার পর—মায়ের সামনে ঐ ছবি-ঘর খুলে দেব। তিনিই বলবেন—তাঁর স্বপ্নে দেখা ছবির সংগে এ ছবির মিল কতখানি।

দেবী এই সময় ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলল : কিন্তু এমনি আপনার ভুলো মন, ছবি-ঘরের দরজায় তালা বন্ধ না করেই নেমে গেছলেন। ছবির ওপর ঢাকা পর্যন্ত দেন নি। আপনার ভুল সারতে গিয়েই ত' মালতী দেবীর সংগে ঝগড়া হয়ে গেল! এই নিন—চাবি।

চাবিটি নিয়ে নরেন বলল : তুমিও আমার এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছ। তোমাকে না পেলে এ ছবি শেষ হোত না! আমার বিশ্বাস, এ ছবিই তোমার সত্যিকার পরিচয় দেবে। আসুন দাদামশাই, আমরা নীচে যাই।

শিল্পী নরেন অধ্যাপক রজত রায়কে তার ষ্টুডিও-ঘরে বসিয়ে উপরে গিয়েছিল। তার পর এই বিভ্রাট। দেবীর কথা নরেন পূর্বে বাইরের কাউকে বলে নি, এমন কি রজত রায়কেও না। কিন্তু পিকচার একজিবিশন হতে ফেরবার সময় বাধ্য হয়ে নরেনকে দেবীর সেই বিস্ময়কর আবির্ভাব-কাহিনী আজ মিঃ রায়কে আগাগোড়া সবই বলতে হয়েছে। নরেনের ছবি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সংবাদ পেয়ে অধ্যাপক স্বয়ং তাকে নিয়ে পিকচার একজিবিশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে ইণ্টার ন্যাশান্যাল ফিলিম প্রতিষ্ঠানের এক বিকৃত মস্তিষ্ক চিত্রকর নরেনের ছবি সম্বন্ধে এক বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায় নরেনকে আর এক বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

॥ একত্রিশ ॥

একতলার সুসজ্জিত বৈঠকখানা গৃহস্বামী বন্ধ করে গিয়েছিলেন। এখন সেই ঘরে তিনি প্রবীন অধ্যাপক ডাঃ রজত রায়কে অভ্যর্থনা করে বসিয়েছেন। অধ্যাপকের খ্যাতির কথা হরপ্রসাদবাবুর অবিদিত ছিল না। এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে বিশেষ তৃপ্তি পেলেন। অধ্যাপক মশায় নরেনের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বোম্বাই-যাত্রার পরবর্তী সকল ঘটনা—মালতীর স্থলে কি ভাবে দেবী মেয়েটির সংগে তার সংযোগ ঘটে এবং একান্ত অসহায় অবস্থায় তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়—নরেনের নিকট যেমন শুনেছিলেন, সবই তাঁকে খুলে বললেন। অবশেষে, গত রাত্রে নরেনের ছবিই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে জ্ঞাত হয়ে তিনি সকালেই এখানে এসে নরেনকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে যান। তাড়াতাড়িতে দেবীকে খবর দেবারও সময় হয় নি। সেই অবস্থায় হরপ্রসাদবাবুরাও এসে উপস্থিত হন।

হরপ্রসাদবাবু এই সময় উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নরুর ছবি ফার্ষ্ট হয়েছে? তাই নাকি! তাহলে নরু ওর দরুণ কিছু পাচ্ছে ত'?

অধ্যাপক বললেন ঃ কিছু নয় ঘোষ মশায়—প্রচুর। ইণ্টার-ন্যাশানাল ফিলিম কোম্পানী পনেরো হাজার টাকায় ছবিখানা কিনে নিয়েছে।

বিস্ময়ের সুরে হরপ্রসাদবাবু বলে উঠলেন ঃ বলেন কি? পনেরো হাজার টাকা—হাতে আকা একখানা ছবিব দাম?

নরেন এই সময় পকেট হতে চেকখানা বের করে হরপ্রসাদবাবুর হাতে দিয়ে বলল ঃ এই যে, আপনিই রাখুন দাদামশাই।

হরপ্রসাদবাবু পড়ে দেখলেন, সত্যই পনেরো হাজার টাকার এক কেতা চেক—লয়েড ব্যাঙ্কের উপর, নরেনের নামে। তাঁর চক্ষুর তারকা

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল; ষ্টুডিওতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যে-সব ছবি নরেন গ্রাহকদের নিকট দাখিল করত, তা থেকে সে নিজের খরচটুকুও মেটাতে পারত না বলে তিনি তাকে অন্নসংস্থানে অপটু ভেবে উপেক্ষা করেছেন! অথচ বিদেশী সমজদারের চোখে তারই আঁকা ছবি এখন কত চড়া দরে বিকিয়েছে।

মালতী বৈঠকখানা ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। পনেরো হাজার টাকার চেকখানা যেন তার পীঠে চাবুকের ঘা দিয়ে সে দিনের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল…'ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেলে সব টাকা আপনিই বুঝে নেবেন।'

হর্ষোৎফুল্ল মুখে হরপ্রসাদবাবু বললেন : বেশ, বেশ; ভারি খুসি হয়েছি নরু। আমি তোমার জন্যে সত্যিই ভাবতাম; কিন্তু এখন বুঝছি, আমাদের ভাবনার কোন দাম নেই। ভাগ্যই ভবিষ্যৎ গড়ে রাখেন নিজের হাতে।

চেকখানি তিনি নরেনের হাতে ফিরিয়ে দিতে গেলেন; কিন্তু নরেন হাতখানি সরিয়ে নিয়ে সসম্ভ্রমে বলল : আপনার কাছেই রাখুন দাদমশাই। ও ব্যাঙ্কে আপনার একাউণ্ট আছে জানি—আপনিই জমা করে দেবেন। পিছনে আমি নাম এনডোর্স করে দিয়েছি।

চেকখানি উল্‌টিয়ে দেখে হরপ্রসাদবাবু বললেন : তুমি এবার আমাকে হারিয়ে দিলে নরু। শিল্পীরা শুনেছি সাধারণতঃ কৃতজ্ঞ আর বিশ্বাসী হয়ে থাকে। তুমিই তার দৃষ্টান্ত দেখালে বটে! আমার ওপর এতটা বিশ্বাস, সামান্য কথা নয়!

নরেন কুণ্ঠিত হয়ে বলল : আমি যে আপনাকেই আমার অভিভাবক বলে জানি দাদামশাই! সাহসটা সেজন্যই বেড়েছে; নৈলে ঐ মেয়েটিকে আমি আপনার অনুমতি না নিয়েই আশ্রয় দিতে সাহস পেতাম কখনো?

হরপ্রসাদবাবু এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার অভিপ্রায়ে বললেন : তাহলে আমি এখন বলব নরু, আমার দেওয়া ছবির কাজটা ছোট হলেও, তার 'আয়পয়' আছে।

এ-কথার উত্তরে নরেনের কথাটা অধ্যাপকই বলে ফেললেনঃ নরেন নিজেও এ-কথা স্বীকার করেছে ঘোষ মশায়! আপনার মেয়ের ছবিখানা ফেল্ট হয়ে গেলেও, নরেন তা থেকেই এদেশের একটি আদর্শ মেয়ের ছবি আঁকবার প্রেরণা পায়। আরও মজার কথা শুনুন, সেই ওরিজিন্যাল ছবিখানাই এখন নরুকে ওর এক ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে রক্ষা করবার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে হরপ্রসাদবাবু বললেনঃ সে আবার কি কাণ্ড?

অধ্যাপক বললেনঃ ব্যাপারটা শুনলে অবাক কাণ্ডই বলবেন। ওখানকার কাজ মিটিয়ে হোটেলের রেষ্টুরেণ্টে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় ছবিখানা যাঁরা কিনেছেন—ইণ্টার ন্যাশান্যাল ফিলিম কোম্পানীর কর্তারা—ইয়া চুল-দাড়ীওয়ালা এক পাগলকে এনে সেখানে হাজির। পাগল মানে—লোকটা নাকি স্মৃতিভ্রষ্ট। অথচ, তার সংগে ওঁদের প্রায় বারো বছরের সম্বন্ধ। কি একটা দুর্ঘটনায় তার মাথা বিগড়ে যায়, আগেকার সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। তবে লোকটা যে বরর্ণ-আর্টিষ্ট, ছবির ব্যাপারে ওস্তাদ—সেটা ওঁরা জানতে পারেন। কারণ, ঘা খেয়ে মাথা হারালেও সহজাত প্রতিভা তাকে ছেড়ে যায় নি। সেই জন্যেই ওঁদের ছবির ইউনিটে ওঁকে রাখেন। বারো বছর ধরে এই লোক ওঁদের সংগে কাজ করে আসছে—আর নানা ব্যাপারে ওঁরা উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তার পূর্বস্মৃতি ফিরে আসেনি। মিষ্টার আর্টিষ্ট নামেই লোকটি ওঁদের প্রতিষ্ঠানে পরিচিত। আগের নাম পর্যন্ত মনে নেই। তাহলেও ছবির ব্যাপারে কিছুই ভুলচুক নাকি তার হয় না। তাই মিষ্টার আর্টিষ্টের প্রতি ওঁদেরও অগাধ বিশ্বাস। কেনবার সময় নরুর ছবি দেখে ঐ লোকটিও পছন্দ করেছিল—এমন কি, সে সময় খুব সুখ্যাতিও করেছিল লোকটা। কিন্তু তারপরই হঠাৎ বিগড়ে যায়; বলে—এ-ছবি অরিজিনাল নয়—চুরি করা; আর একখানি ছবিতে নাকি ঠিক এমনি চোখ, মুখ ও ভঙ্গি দেখেছে। এ-ছবির সংগে তার মিল আছে।

হরপ্রসাদবাবু বিচলিত কণ্ঠে বললেন : কি মুস্কিল! তারপর।

অধ্যাপক বললেন : সে বলতে চায়—সেই ছবির সাবজেক্ট নরু চুরি করেছে। নরু বলে, তার ছবির সাবজেক্ট পাঁচ সাত বছরের মেয়ের একটা পুরনো ছবি। মিঃ আর্টিষ্ট তা মানতে চায়না; বলে, মিছে কথা। এ ছবির সাবজেক্ট তারই দেখা সেই ছবি। নরু ত' তখন মারমুখী হয়ে তার সংগে হাতাহাতি করে আর কি!

তখন মিষ্টার আর্টিষ্ট বলল : তার চেম্বারে সে ছবি হয় ত' আছে। নরুর এই ছবি দেখেই সে ছবির কথা তার মনে পড়ে গেছে।

যাই হোক, এখানকার ঠিকানা তাকে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বামাল নিয়ে হয়ত এখনই আসবেন। সুখের কথা যে, আপনি এসে পড়েছেন! বলতে পারবেন—আপনার মেয়ের ফটো নরুকে দিয়েছিলেন, নরু সম্ভবতঃ তাকেই তার ছবির সাবজেক্ট করে থাকবে।

হরপ্রসাদবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠে বললেন : ভালো পাগলের পাল্লায় নরু পড়ছিল দেখছি! আর, রীতিমত একটা অন্যায় কাণ্ড না হলে, নরুর মত ছেলে কখনো মারমুখী হয়ে উঠতে পারে না।

এমন সময় দরজার সামনে একখানা মোটর এসে থামবার শব্দ শোনা গেল। অধ্যাপক তাড়াতাড়ি উঠে বললেন : ঐ বুঝি ওঁরা এলেন। আচ্ছা, আমি দেখছি—নরুর আর এগিয়ে গিয়ে কাজ নেই, হয়ত হাতাহাতি হয়ে যাবে।

পাশ্চাত্ত্য পরিচ্ছদধারী, গম্ভীর মূর্তি তিনজন ভদ্রলোকের সংগে দীর্ঘশ্মশ্রু-গুম্ফ ও স্কন্ধদেশ পর্যন্ত আস্তৃত কেশপাশ বিশিষ্ট, পাদরীদের মত লম্বা ওভারকোট পরা এক বষীয়ান পুরুষকে নিয়ে অধ্যাপক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন। পাশ্চাত্ত্য পরিচ্ছদধারী তিন ব্যক্তিই গৃহস্বামীকে 'গুড্ মর্ণিং' শব্দে অভিবাদন করলেন। কিন্তু শ্মশ্রুগুম্ফধারী 'নমস্তে' বলে দক্ষিণ হাতখানি ললাটে ঠেকালেন। হরপ্রসাদবাবু প্রত্যাভিবাদন করে তাঁদের সকলকে অভ্যর্থনা পূর্বক পাশাপাশি বসালেন।

ইণ্টার ন্যাশান্যাল ফিলিম প্রতিষ্ঠানের প্রবীন কর্তৃপক্ষদ্বয়ের সংগে অধ্যাপকের পরিচয় পূর্বেই হয়েছিল। তিনি উভয়কেই হরপ্রসাদবাবুর সংগে পরিচিত করে দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই সেই ব্যক্তি বললেন : হোটেলে যখন ছবি নিয়ে আপনাদের কথান্তর হয়, আমি সেখানে ছিলাম। এ-ব্যাপারে আমি কৌতূহলী বলেই মিষ্টারদের সংগে এসেছি। আমাকে একজন সরকারী কর্মচারী বলেই জানবেন।

এর পর অধ্যাপক শ্মশ্রুগুম্ফধারী বর্ষীয়ান পুরুষটিকে নির্দেশ করে বললেন : ঘোষ মশায়, ইনিই ওঁদের প্রতিষ্ঠানের শিল্পী— মিঃ আর্টিষ্ট।

কিন্তু এ-কথা শুনেই আর্টিষ্ট সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন : নো, নো, বলুন—শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট। হ্যাঁ, এখন শুনুন—সেই ছবিখানা আমার পক্ষে ঠিক যেন ওষুধের মত হয়েছে—ওটা দেখেই যে-ছবিখানার কথা মনে পড়ে যায়—এই ব্যাগের ভিতরে তাকে পেয়েছি! আবার এমনি কাণ্ড, পাবার সংগে সংগে আগেকার কথা একটু একটু মনে পড়ছে। তবে, আমি যা বলছিলাম, সত্যি কি না— এখন মিলিয়ে দেখুন।

তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি খুলে তার ভিতর হতে একখানি ব্রোমাইড করা আলেখ্য বের করে আর্টিষ্ট উপবিষ্টদিগকে দেখিয়ে দিলেন।

নরেনের পক্ষে এ অবস্থায় হাসি চেপে রাখা কঠিন হল। হরপ্রসাদবাবু এ পর্যন্ত বরাবর একই ভাবে এই অদ্ভুত আর্টিষ্টের শ্মশ্রু-সমাচ্ছন্ন মুখখানির দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর হাতের ছবিখানি দেখবার সংগে সংগে চীলের চঞ্চুর মত টিকালো নাসিকাটিও দেখলেন। অমনি তাঁর মুখখানিও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু এই হাসির ব্যাপারে বৃদ্ধ শিল্পীর সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ল তরুণ শিল্পী নরেন বেচারীর উপরে। বৃদ্ধ তর্জন করে উঠলেন : বড় হাসছ যে ছোক্‌রা? মিলিয়ে দেখ, মিলিয়ে দেখ—

বলতে বলতে হাতের আলেখ্যখানি তিনি হরপ্রসাদবাবুর সামনে ফরাসের উপর নিক্ষেপ করে সাক্ষীদিগকে ইংরাজীতে বললেন: আপনারা ত' হোটেলে গিয়ে মিলিয়ে দেখে এসেছেন; এখন ঐ ছোক্‌রাকে জিজ্ঞেস করুন, ঠিক কিনা?

একজন বর্ষীয়ান সাহেব বললেন: ফটোর এই মেয়েটির অদ্ভুত রকমের চোখ আর মুখের সংগে মিষ্টার বিশ্বাসের ছবির মিল আছে, এ কথা সত্যি। এর জন্য আমরা মিঃ আর্টিষ্টের পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করেছি। কিন্তু তা বলে মিঃ বিশ্বাসের প্রতিভাকেও নীচু করতে চাইছি না। সাত দিন পরে একজিবিশন শেষ হলে, সে ছবি পাওয়া যাবে; তখন মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা শুধু এই জন্যই আপনাদের জানাতে এসেছি যে, আমাদের আর্টিষ্টের কথা মিথ্যা নয়।

ইতিমধ্যেই হরপ্রসাবাবুর ইঙ্গিতে নরেন ষ্টুডিও হতে তাঁর প্রদত্ত ব্রোমাইড করা তাঁর কন্যার ছবিখানি এনে ফরাসের উপর রক্ষিত পূর্বের ছবিখানির পার্শ্বে রেখে বলল: তাহলে এই ছবিখানাও দেখুন সকলে।

হরপ্রসাদবাবু দু'হাতে দু'খানি ছবি নিয়ে সকলকে দেখালেন। একই আকারের একই সময়ে তৈরী করা একই বালিকার দু'খানি আলেখ্য!

শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: এ ছবি তুমি কোথায় পেলে ছোক্‌রা?

চোখের ইঙ্গিতে নরেনকে নিরস্ত করে হরপ্রসাদবাবু জিজ্ঞেস করলেন: এখন আপনি বলুন ত' শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট সাহেব, ঐ ছবিখানাই বা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের পর শ্রীমন্ত আর্টিষ্টের পরিপূর্ণ দৃষ্টি হরপ্রসাদবাবুর মুখের উপর নিবদ্ধ হল। শিল্পী নরেনের হাতের আঁকা ছবিখানি দেখে যেমন অতীত স্মৃতির কিছুটা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল

হরপ্রসাদবাবুর মুখে এই প্রশ্ন শুনে তাঁর সেই লুপ্ত স্মৃতির আর একখানি পাতা খোলবার মত হল।

হরপ্রসাদবাবু পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ ঐ ব্যাগের ভিতরে আরো একখানি ছবি বোধ হয় আছে—একটি ছোট্ট ছেলের?

তখনো শিল্পী হরপ্রসাদবাবুর মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। হরপ্রসাদবাবুর এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিহ্বল ভাবে বলে উঠলেনঃ ছেলের ছবি…ছেলের…হ্যাঁ, হ্যাঁ—

পূর্ববৎ ব্যাগের ভিতর হতে তিনি একখানি ব্রোমাইড করা আলেখ্য বের করে সেখানি তুলে ধরে হরপ্রসাদবাবুকে দেখিয়ে বললেনঃ এই যে!

হরপ্রসাদবাবু বললেনঃ ঐ ছবির পাশে রাখো। এখন বুঝছ— আগের ছবিখানা হচ্ছে আমার মেয়ের, আর এই ছবিখানি তোমার ছেলের। এবার মনে করে দেখ ত' এমনি করে ছবি দু'খানা কোথায় পাশাপাশি রেখেছিলে? আমাকে চিনতে পারছ না নাকু?

স্বপ্নাবিষ্টের মত শিল্পী এতক্ষণ হরপ্রসাদবাবুর কথাগুলি শুনছিলেন, আর সেই সংগে তাঁর পূর্বের লুপ্তস্মৃতির এক একখানি পাতা যেন উঠি উঠি করছিল। এমনি অবস্থায় হরপ্রসাদবাবুর মুখ দিয়ে 'নাকু' নামটি নির্গত হবামাত্র তিনি বিপুল উল্লাসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেনঃ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে; হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে চিনি—চিনি—তুমি—তুমি—কিন্তু তোমার নাম ত'…

হরপ্রসাদবাবু বললেনঃ আমি—হরু। আর তুমি হচ্ছ—নাকু, অর্থাৎ শম্ভুনাথ বোস। তেমনি উল্লাসোচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ শিল্পী পুনরায় চীৎকার করে উঠলেনঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি হরু, আমি শম্ভু—কলেজের নাকু! তুমিই চিনিয়ে দিলে হরু। আমি অ্যাদ্দিন ভোলানাথ হয়ে ছিলুম ভাই! এখন মনে পড়েছে…আমার ছেলের ছবি নিয়ে যাই—জায়গাটা হচ্ছে…জায়গাটা….

হরপ্রসাদবাবু বললেনঃ প্রয়াগ…এলাহাবাদ…

পুনরায় উল্লাসের গমকে শিল্পী বললেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, এলাহাবাদ। এখন সব মনে পড়ছে। এই ব্যাগের মধ্যে ছিল আমার ছেলের ছবি, তোমাকে দেখাতেই তুমি তোমার মেয়ের ছবিখানা এনে পাশে রাখলে। অনেক কথা হলো—এখন মনে পড়েছে···তারপর তুমি মেয়েকে ডাকলে—তার আসল চেহারা দেখাবার জন্যে। খবর এলো—মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না···তার পর আর মনে পড়ছে না হরু! এখন তুমি বল, তুমি বল, তোমার মেয়েকে···

হরপ্রসাদবাবু বললেন: পাওয়া যায়নি; অনেক খোঁজাখুঁজি করে। শুধু কি মেয়েকে···মাথা বিগড়ে তুমি পালালে···তোমাকে, সেই সঙ্গে তোমার ছেলেকে খুঁজে বার করবার জন্যে কত চেষ্টা করেছি, অজস্র টাকা ঢেলেছি। ডাক্তার অধিকারী নামে একজন বিচক্ষণ লোকের হাতে আমার এলাহাবাদের ঘরবাড়ী পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এসেছি—তিনি তল্লাস করে খুঁজে বের করবেন, এই ভরসায়। কিন্তু কোন পাত্তাই তিনি কারুর পাননি এ পর্যন্ত—তবে এখনও হাল ধরে আছেন। তারপর কলকাতায় এসে এই বাড়ী করি; মেয়ের নামেই নাম রাখি 'রেণু-নিবাস'। এখানে এই ছোকরা আর্টিষ্টকে পাই—তুমি যার পিছনে লেগেছ। মেয়ের একখানা ছবি তুমি নিয়ে যাও; আর একখানা আমার কাছে থাকে। সেখানা এই ছোকরা শিল্পীকে দিয়ে ফরমাস করি—ছ' বছরের মেয়ের এই ছবি দেখে বারো বছর পরে এখন তার যে বয়স হোত, সেভাবেই একখানা ফুলসাইজ ছবি আঁকতে।

—তোমার তো দেখছি অদ্ভুত খেয়াল।

—খেয়ালটা আমার স্ত্রীর। তিনি নাকি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেন, তাঁর মেয়ে দিব্যি বড়সড় হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।

শম্ভুনাথ নরেনের দিকে কটাক্ষ করে বললেন: এখনকার আর্টিষ্টরা কাজ পেলেই বর্তে যায়। আন্দাজে ও রকম ছবি কেউ আঁকতে পারে?

নরেন দৃঢ়স্বরে উত্তর করল: শিক্ষা, সাধনা ও নিষ্ঠা থাকলে শিল্পীই পারে। সত্যকার শিল্পীর অসাধ্য কিছু নেই।

শম্ভুনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নরেনের মুখের পানে চাইতেই, হরপ্রসাদ বললেন: আমি বলি, তর্কে কি দরকার। নরুর আঁকা ছবি দেখবার জন্যে আমার চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নরু, তুমি ছবিখানা এখানেই আনো।

নরেন নীরবে উঠে গেল। শম্ভুনাথ এই সময় হরপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন: ছোকরার নাম কি বললে—নরু?

হরপ্রসাদবাবু বললেন: ওর নাম নরেন, পদবী বিশ্বাস। আমদেরই স্বজাতি। আমি ওকে ছেলের মত দেখি, আর ওকে নরু বলেই ডাকি।

শম্ভুনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: ছোকরাকে তুমি ঐ নামে ডাকতে আমার ছেলের কথাও মনে পড়ে গেল। তার নামও মনে পড়েছে, নরনারায়ণ···কে জানে, কোথায় আছে, কিম্বা ও-পারে চলে গেছে!

শম্ভুনাথের শিশু পুত্রের ছবিখানা নিয়ে অধ্যাপক এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন। তিনি এই সময় বললেন: আপনার মাথা ত' এখন খুলে গেছে দেখছি। কিন্তু গোলমেলে মাথাতেও যখন আপনি বারো বছর আগের দেখা ছবির মুখ মনে করে রেখেছেন। আপনার নিজের ছেলের এই অদ্ভুত রকমের মুখ চোখের ভঙ্গি কি এখানে আর কারুর মুখ চোখে দেখতে পাননি?

শম্ভুনাথ অদ্ভুত দৃষ্টিতে অধ্যাপকের মুখের পানে চেয়ে নীরব রইলেন···যেন কথাটির অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নি।

সরকারী কর্মচারীর পরিচয়ে প্রিয়দর্শন যে যুবকটি বিদেশীয় দু'জন প্রবীন ব্যক্তির পাশে কেদারায় এতক্ষণ নির্বাকভাবে বসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত গোয়েন্দা লালবিহারী সিংহ। এই ঘটনার সংশ্রবে কোন সূত্র পেয়েই এখানে এসেছেন। এই সময় তিনি বললেন:

আমার মনে হয়, অধ্যাপক মশায় আমাদের তরুণ শিল্পীর চেহারার সংগে এই ছবির চেহারা মিলিয়ে দেখবার কথা বলছেন!

শম্ভুনাথের মুখে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু হরপ্রসাদবাবু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললেন : না, না, সে কি করে হতে পারে? মুখ চোখে মিল হলেও, আর সব দিকেই যে গরমিল। ডক্টর অধিকারীকে আমি শম্ভুর ছেলের খবর নেবার ভার দিয়েছিলাম, তিনি দানাপুরে গিয়ে সেখানে সন্ধান করে আমাকে খবর দেন— সে ছেলে বেঁচে নেই।

শম্ভুনাথ আর্তস্বরে বললেন : য়্যাঁ, বেঁচে নেই! হ্যাঁ,—ঠিক খবর। মনে পড়েছে—দানাপুরে মামার কাছে তাকে রেখে আসি। তাহলে— বেঁচে নেই! ব্যস্!

লালবিহারী সিংহ বললেন : এখন আমি এমন কিছু নূতন কথা শোনাব, আপনারা ভাববেন—গল্প বলছি। ডাঃ অধিকারী আগাগোড়াই আপনাকে ব্লাফ দিয়ে এসেছেন। হালেও আপনাকে তিনি জানিয়েছেন যে, আপনার কন্যার সন্ধান পেয়েছেন। তার মানে, সেই সময় থেকেই তিনি আপনার মেয়ের মত কতকটা দেখতে এমন একটি মেয়ে সংগ্রহ করে তাকে তৈরী করতে থাকেন। এই দীর্ঘ বারোটি বছর তাকে তৈরী করতে কেটে গেছে। সে মেয়ে তাঁর হাতে আছে; এই গেল প্রথম কথা। এর পর তাঁর নজর পড়ল—শম্ভুবাবুর ছেলে নরনারায়ণের ওপরে। তিনি বুঝেছিলেন, ঐ ছেলেটিকে আনিয়ে আপনি তাকে ছেলের মতন পালন করবেন; আর যদি মেয়েটিকে ফিরে পান, তার সংগেই বিয়ে দেবেন বড় হলে। ডাক্তার সাহেব দেখলেন—এ আবার আর এক ফ্যাসাদ। কেন না, তিনি তাঁরই ছেলে ওটিনকে ঠিক করে রেখেছিলেন, নকল মেয়ে আসল বলে চালু হলেই, দাবী করবেন—তাঁর ছেলের সংগে মেয়েটির বিয়ে দিতে হবে। কাজেই ভার পাবামাত্রই তাঁর কাজ হলো—দানাপুরে নরনারায়ণের মামার সন্ধান করে কাজ বাগানো। তাঁকে জানালেন,

শম্ভুনাথ বিপ্লবীদলের সম্পর্কে ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সে জন্যে তাঁকেও মুস্কিলে পড়তে হবে। তখন ছেলের নাম আর পদবী পালটানো হলো, দানাপুর থেকে বদলী হবার মতলবে ছুটি নিয়ে বাসা তুলে নিবারণবাবু দেশে গেলেন। সেখান থেকে ডক্টর সাহেব আপনাকে জানালেন যে, শম্ভুনাথবাবু যে সময় নিরুদ্দেশ হন, তার ছেলেও সেই সময় গতায়ু হয়েছে। ওদিকে ভাগনে একটু বড় হোলে নিবারণবাবু তাকে কলকাতার মেসে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি চাকরী থেকে অবসর নিয়ে মুঙ্গেরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। ১৩৩৫এর ভূমিকম্পে মুঙ্গেরের যে-দিকটা ধ্বংস হয়ে যায়, সেইখানেই তিনি থাকতেন। নরেন তখন কলকাতায় ছিল বলে রক্ষা পায়।

সকলেই অবাক বিস্ময়ে লালবিহারী সিংহের মুখের দিকে চেয়ে এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনছিলেন। হরপ্রসাদবাবুই প্রথমে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন : আপনি এ-সব কথা কি করে জানলেন, আর ডক্টর অধিকারীর বিরুদ্ধে যে-সব কথা বললেন, সত্য হলে খুবই সাংঘাতিক অবস্থা হবে তাঁর, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন ?

লালবিহারী সিংহ বললেন : ডক্টর অধিকারীকে আটক করা হয়েছে। নকল মেয়ে নিয়ে তিনি আর আপনার কাছে আসবেন না। এলাহাবাদের বাড়ী আমিই আপনাকে খালাস করে দেব। তাঁর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। পরে সে-সব জানতে পারবেন। তবে, নরেনবাবুই যে নরনারায়ণ, তাঁর মামা নিবারণবাবুর কথায় তিনি নাম ও পদবী পরিবর্তন করেন, বিহার ব্যাঙ্কে মামার ডিপোজিটের টাকার তিনিই ওয়ারিসান সাব্যস্ত হওয়ায় সেটা প্রতিপন্ন হয়েছে। যদিও সে টাকা তিনি নিজে না নিয়ে বিহার তুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে তা দান করেন। এ-সব কথা ওঁরও অজানা নয়। আর এ-থেকেও জানতে পারবেন যে, উনিই নিবারণবাবুর ভাগনে কি না।

হরপ্রসাদবাবু ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন : হ্যাঁ, এ একটা মস্ত প্রমাণ বটে।

নরু কিন্তু এ সব কথা আমার কাছে চেপে গিয়েছিল। তবে ওর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করতে শুধু বলেছিল, 'ভূমিকম্পে ওদের সব শেষ হয়ে গেছে; নরু তখন কলকাতার মেসে ছিল বলে বিশ্বাস বংশটা লোপ পায়নি। ও এখন একলা, যেখানে থাকে সেই ওর বাড়ী, এর বেশী আর কোন পরিচয় নরুর নেই—এমন সুরে কথাগুলি বলেছিল নরু, তারপর আর কিছু জিজ্ঞেস করা চলে না। শম্ভু, সব শুনছ ত' হে! তোমার কি মনে হয়? ইনি যে বলছেন নিবারণবাবু নরুর মামা, এ কথা ঠিক ত'?

শম্ভুনাথ বললেন: হ্যাঁ, এখন তার নামও মনে পড়েছে। নরুকে তার কাছে রেখে আসি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে—বারো বছর পরে ছোকরার সংগে গোড়াতেই দেখা হতে ঝগড়া করলাম, শেষে কিনা—

এই সময় আবরণমণ্ডিত তৈলচিত্রখানি নিয়ে নরেনকে প্রবেশ করতে দেখে শম্ভুনাথ কথাটা আর সমাপ্ত করলেন না। দেওয়ালের দিকে একখানা টেবিলের উপর ছবিখানা রেখে নরেন হরপ্রসাদবাবুকে জিজ্ঞেস করল: এখুনি খুলব কি?

হরপ্রসাদবাবু বললেন: একটু অপেক্ষা কর নরু—আগে তোমাকে গুটি কয়েক প্রশ্ন করব: তারপর ওটা খোলা হবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নরেন হরপ্রসাদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। হরপ্রসাদবাবু বললেন: শৈশবে তোমার নাম ছিল নরনারায়ণ বসু। কোন প্রতারকের প্ররোচনায় তোমার মাতুল নিবারণচন্দ্র মিত্র তোমার পিতৃদত্ত নাম বদল করে নরেন বিশ্বাস রাখেন। এ কথা কি ঠিক?

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকিত হয়ে নরেন বলল: আপনি এ খবর কোথায় পেলেন? যাই হোক, আপনার কাছে কথাটা আমি অস্বীকার করব না। তবে, আমার যতটুকু স্মরণ হয়, তাতে আমি এই কথাই বুঝেছিলাম যে, আমার মঙ্গলের জন্যেই তিনি ঐ পরিবর্তন করেছিলেন। মামার সেদিনের কথা এখনো আমার মনে আছে—

"নরনারায়ণ বড্ড বড় নাম, কলকাতার স্কুলে পছন্দ করবে না। তোমার ঠাকুরদাদার পদবী ছিল বিশ্বাস—নবাবের দেওয়া পদবী। তোমার বাবা বলতেন—নবাবী আমল যখন নেই, ও পদবীও মিছে। তাই তিনি বসু পদবী নেন। কিন্তু পদবী বদলে ভালো হয় নি যখন—সাবেক 'বিশ্বাস' পদবী আবার বহাল রাখাই ভালো।" আমি কিন্তু এখন ভাবি, পদবী বদলে আমার ভালোই হয়েছে, তবে যিনি বদলে দিয়েছেন, তাঁর ভালো হয় নি।

হরপ্রসাদবাবু বললেন : ভূমিকম্পে সপরিবার তাঁর অপমৃত্যুর কথা বলছ ত'? তা মিছে নয়। তাছাড়া, তার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল, তুমি তার একমাত্র ওয়ারিসান হয়েও সে টাকা নাকি তুলে নাওনি—এ-কথা কি সত্যি?

নরেন কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলল : সে সব পুরোনো কথা তুলে কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন বলুন! মামার হাজার দশেক টাকা ব্যাঙ্কে জমা ছিল। বিহার রিলিফ কমিটি আমাকে অনুরোধ করেন, অত বড় একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে দুর্গতদের মুখ চেয়ে আমি ঐ টাকা থেকে কিছু দান করি। আমি তখন মামা ও তাঁর পরিজনদের আত্মার কল্যাণের জন্যে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সারি। অর্থাৎ মামার টাকার সবটাই রিলিফ ফণ্ডে দিই।

হরপ্রসাদবাবু গাঢ়স্বরে বললেন : কিন্তু এ খবরটি তুমি আমাকে দাওনি নরু, তাহলে তোমার ও-দিকটাও আমি জানতে পারতাম। আচ্ছা আর একটা কথা—তুমি ত' এক স্বভাব-শিল্পী, তোমার বিদ্যা ত' আর ধার করা নয়। এখন তোমার অধ্যাপক মশায়ের হাতে যে ছেলেটির ছবি রয়েছে, ওখানা একবার ভাল করে দেখ দেখি। ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঐ রকম একখানা ছবি দেখে বারো বছরের হারানো স্মৃতি খুঁজে পেয়েছেন। তুমিও দেখ দেখি—ও-থেকে কিছু বের করতে পার কি না!

অধ্যাপক মশায় ছবিখানি নরেনের হাতে দিয়ে বললেন : শিল্পীর

দৃষ্টি দিয়ে দেখে তবে ঘোষ মশায়ের কথার জবাব দেবে। এটাও তোমার এক মস্ত পরীক্ষা!

ছবিখানি হাতে নিয়ে নরেন নিবিষ্ট চিত্তে কিছুক্ষণ দেখল, তার পর ঘরের একদিকে টাঙানো দীর্ঘ মুকুরখানির সামনে গিয়ে ছবির মুখখানির প্রতি অংশ শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ছবির মুখের সংগে নিজের মুখের প্রতিকৃতি মুকুরে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রায় দশ মিনিট এই ভাবে পর্যবেক্ষণের পর নরেন ছবিখানি হরপ্রসাদবাবুর সামনে ফরাসের উপর রেখে ভাবার্দ্রস্বরে বলল: খানিক আগে আপনার মুখেই শুনেছিলাম, ছবির এই শিশুটি কার ছেলে। এখন আপনার কথাতেই শিল্পীর দৃষ্টিতে জানতে পেরেছি—ছবির এই শিশুটি কে!

এই পর্যন্ত বলেই নরেন গম্ভীরমুখে উপবিষ্ট শম্ভুনাথের সামনে নতজানু হয়ে বসে তাঁর পদযুগল ছু' হাতে জড়িয়ে ধরে বলল: আমাকে ক্ষমা করুন বাবা! আজ পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই। পিতৃহারা আজ তার পিতাকে ফিরে পেয়েছে।

শম্ভুনাথও তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে উঠে ছু' হাতে নরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাশ্রুলোচনে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন: বাবা রে! আমার নর—আমার নর। আজ আমার বুক ভরে গেছে। অন্ধের চোখ পাওয়ার চেয়েও এ আনন্দ আরো বেশী রে বাবা! আঃ!

হরপ্রসাদবাবু বললেন: পরীক্ষায় তুমি ফার্স্ট ক্লাসে পাস করেছ নরু। এখন তুমি ছবির ঢাকা খুলতে পারো।

আসমানি রঙের পাতলা কাপড়ে ঢাকা আবরণটি তৎক্ষণাৎ উন্মোচিত হয়ে নরেনের সিদ্ধ হস্তের তুলিকায় অঙ্কিত পরিপূর্ণ আলেখ্যটি কক্ষ মধ্যে উপবিষ্ট শিল্প-রসিকদের চক্ষুগুলি চমৎকৃত করে দিল।

হরপ্রসাদবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বন্ধুকে লক্ষ্য করে বললেন: অহে শম্ভু, ছ' বছরের মেয়ের ছবিখানা নিয়ে তুমি বিবাগী হয়ে ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখেছিলে, আর তোমার ছেলে সে ছবির মেয়েটিকে কিভাবে দাঁড়

করেছে দেখছ ত'। আমার স্ত্রী ওকে বলেছিলেন, এখনো স্বপ্নে আমি রেণুকে দেখতে পাই; এই বারো বছরে তার যে বয়স হওয়া উচিত—তেমনি ডাগর-ডোগর হয়েই সে আমার সংগে কথা বলে স্বপ্নে। তাই আমার ঝোঁক হয়েছে বাবা, রেণুর ছেলে-বেলাকার ছবি থেকে, তার সোমত্ত বয়সের একখানা ছবি এঁকে দেখবার। তোমাকে এ কাজটি করতে হবে!'

স্ত্রীর অনুরোধটি এই ভাবে প্রকাশ করে হরপ্রসাদবাবু নরেনকে জিজ্ঞেস করলেন: এ ছবি তিনি নিশ্চয় দেখেছেন নরু; কেননা, তুমি সর্বাগ্রে তাঁকেই দেখাতে চেয়েছিলে। তাঁকে না দেখিয়ে নিশ্চয়ই ছবি তুমি নীচে নামিয়ে আন নি?

নরেন বলল: আপনার অনুমান ঠিক। এ ছবি দেখে তাঁর এত ভাল লেগেছে যে, ছাড়তে চাননি; ছবি নিয়ে কি আলোচনা হয়, শোনবার জন্য পাশের ঘরে এসে বসেছেন। ওপরে এখন কেউ নেই।

হরপ্রসাদবাবু বললেন: আমার যেন মনে হচ্ছে নরু, যে মেয়েটিকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ এ বাড়ীতে, তার সম্বন্ধে এমন সব কথা আনাকে পত্রে জানানো হয়েছিল, যে জন্যে আমরা খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম। সে অবস্থায় মনে মনে একটা খারাপ ধারণা নিয়েই আমরা হঠাৎ এসে পড়ি। তারপর উপরে উঠেই ঘটনাচক্রে সেই মেয়েটির আকৃতি আর প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় পাই, আমাদের সে ধারণা একেবারে বদলে যায়। এখন এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে নরু, এর মুখে চোখে ভঙ্গিতে সেই মেয়েটির মুখের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। এখন যদি এই বলে সন্দেহ করি—তোমার আশ্রয় দেয়া এই মেয়েটিকে দেখেই তুমি ছবিখানা এঁকেছ।

নরেন বলল: দেখুন, দেবী মেয়েটিকে দেখে এই ছবি দেখলে এ রকম সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য নয়। মনে হবে, দেবীকে দেখেই আমি এ ছবি এঁকেছি। কিন্তু এ ছবির মুখ, চোখ, কৌতূকদীপ্ত নির্ভীক ভঙ্গি—ব্রোমাইড করা ঐ পুরোনো ছবি থেকেই নেওয়া। ছ' বছরের

মেয়ের মুখে এ রকম ভঙ্গি সচরাচর দেখা যায় না। বড় হলে সে মেয়ের মুখে আগেকার দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাভাবিক লজ্জার ভাবটুকু যতখানি হওয়া উচিত, ছবিতে আমি সেটুকু ফোটাবার চেষ্টা করেছি। দেবীকে দেখবার আগেই এ ছবির মুখ আমার আঁকা হয়ে যায়। কেবল আয়তনটি সম্পর্কে আমি মালতী দেবীর একটা সেটিংএর স্কেচ নেবার চেষ্টা করি। তিনি কথা দিয়েও না আসায়, আমি যখন অস্বস্তি বোধ করছিলাম, সেই সময় যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে ছদ্মবেশে দেবী এসে উপস্থিত হন। সে সব কথা আগেই আপনি আমার অধ্যাপক মশায়ের মুখে শুনেছেন। তার পরের কথাও বলা উচিত। দেবী আমাকে বলেছিলেন—আমি পালিয়ে এসেছি, আমায় ধরবার জন্যে ত' খোঁজাখুঁজি চলছে; কিন্তু আমি কে—কি করেছি, কেন এভাবে এখানে এসেছি, এ সব কৌতূহল যদি দমন করতে পারেন, তবেই আমাকে আশ্রয় দিন।' আমিও শক্ত হয়েই তাঁকে বলেছিলাম—তাই হবে। আমি কিছুই জানতে চাইব না। কিন্তু তিনিও যেন মনে রাখেন, আমি হচ্ছি শিল্পী,—মানুষের মনের রূপটিও তুলিতে ফুটিয়ে তোলবার সাধনা করেছি; অপরিচিতাকে পরিচিতা করেই শিল্পীর আনন্দ। তখন থেকে এই ছবিতে দেবী মেয়েটির আয়তনটুকু আমাকে অবলম্বন করতে হয় বটে, কিন্তু আমার শিল্পের সাধনা পুরানো ছবির ঐ আদর্শটিকে নিয়ে। আমার সেই সাধনা-সিদ্ধ পরিকল্পনা এখানে আমাকে প্রেরণা দেয়—সেই পরিকল্পনার ফল এই ছবি। এর পরই আমার কাজ হয়—দেবীকে সামনে বসিয়ে তার নিজের একখানি ছবি তোলা। সেই ছবির কাজ আমার এখনো চলছে। সম্পূর্ণ না হলেও, দেবীর বর্তমানের ছবির সংগে এই ছবি পাশাপাশি রেখে বিচার করা চলে। দেবীর ছবি আমি এক মিনিটের মধ্যেই এখানে এনে আপনাদের দেখাচ্ছি।

নীচের ষ্টুডিও ঘরেই দেবীর ছবিখানি আবরণ মণ্ডিত অবস্থায় ছিল। নরেন সেই ছবিখানি তুলে এনে এ ঘরে টেবিলের উপর রক্ষিত

রেণুর ছবির পাশে রেখে তার আবরণটি খুলে দিল। পাশাপাশি স্থাপিত সমতুল্য বয়স ও আকৃতিবিশিষ্ট অপরূপ আলেখ্য দু'খানি তখন কক্ষে সমবেত প্রত্যেকের কৌতূহলী দৃষ্টির পরিধিভুক্ত হল।

নানাভাবে দেখে, পরীক্ষা করে, প্রত্যেকেই এক মত হলেন যে, শিল্পীর কথাগুলি অতিরঞ্জিত নয়—বিস্ময়কর সত্যি। এরূপ সন্দেহ সম্ভব বলেই, তিনি স্বেচ্ছায় এই কঠিন কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। গৃহস্বামীর কন্যার ছবি প্রণয়নে শিল্পী তাঁর অসাধারণ শিল্পী-মন, অনুভবশক্তি ও বিরাট পরিকল্পনা যেন প্রত্যেকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বিদেশীয় দু'জন বর্ষীয়ান ব্যক্তিও এই তরুণ শিল্পীকে 'জিনিয়াস' বলে অভিনন্দন জানালেন।

এই সময় লালবিহারী সিংহ বললেন: দেখুন, কৌতূহলী দর্শক হিসেবেই আমি হোটেল থেকে এঁদের সংগে এখানে এসে পড়ি। তার পর এখানকার ব্যাপারটা এমনি নাটকীয় ভাবে জমে ওঠে যে, ওঠবার কথা পর্যন্ত ভুলে যাই। এখন কিন্তু এ ছবি দু'খানা দেখে এই প্রশ্নই উঠবে—দেবী মেয়েটি কে? দুনিয়ায় তার আপনার বলতে কেউ নেই, অথচ পিছনে একটা বিপদ আছে। তাকে ঠেকাবার জন্যে সে ছদ্মবেশে শিল্পীর কাছে এসে আশ্রয় চায়, শিল্পীও তাঁর শিল্পী-মন ও শিল্পবিদ্যার সাহায্যে মেয়েটির বিপদকে ঠেকিয়ে রাখেন। এখন প্রথম কথা হচ্ছে, এই মেয়েটির সত্যিকার পরিচয় কি? দ্বিতীয় কথা—এই ছবির সংগে ঐ মেয়েটির মুখের সাদৃশ্য যে যথেষ্ট রয়েছে আমরা কেউ তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এ সাদৃশ্য কেন? এর পিছনে যুক্তিসহ কোন কারণ আছে কি না?

এই সময় সাহেবদের মধ্যে একজন বললেন: আপনি ঠিক বলেছেন, আমাদের মনেও ঠিক এই প্রশ্নই উঠেছে। এখন আমাদের মনে হচ্ছে—ঐ মেয়েটি যখন এই বাড়ীতেই আছেন, তাঁকেই এখানে ডাকা হোক, তিনিই তাঁর কাহিনী বলুন।

লালবিহারী বললেন: ওঁকে সে কষ্ট আমি দিতে চাই না। উনি যে

কাহিনী শোনাবেন, তার মধ্যে ওঁর কুল-পরিচয় কিছুই পাওয়া যাবে না ; তাহলে উনি নিজেই সে পরিচয় দিতেন। দেখুন, আমি শুধু ঐ ছবির ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েই আসিনি, এই সূত্রে ঐ মেয়েটির সন্ধানও আমার আসার অন্য উদ্দেশ্য। কেন, সেটা আমার মুখেই শুনুন। আমি এমন একটা আশ্রমের কথা জানি, যেখানে হারানো মেয়েদের প্রতিপালন করা হয়। সেই সূত্রে তারা নানারকম শিক্ষাও পায়, নাচ গান শিখিয়ে তাদের চাহিদা আরো বাড়ানো হয়। তার পর যৌবনে পড়লে পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে তারা পণ্যের মত সওদা হয়ে আশ্রমের পুঁজি বাড়ায়। কার্ণিভাল কিম্বা সার্কাসওয়ালারাও এই সব মেয়ে কিনে এনে তাদের ব্যবসা জাঁকায়।...

এই দেবী মেয়েটিও এমনি একটি আশ্রমে মানুষ হয়। কিন্তু ওর বরাতগুণে আশ্রমের বড় বাবাজী ওকে নিজের কাছে রেখে তৈরী করতে থাকেন। সে লোকটি বিশ্বপণ্ডিত—অনেকগুলো ভাষা জানে, কিন্তু ক্রিমিন্যাল ; নাম ভাঁড়িয়ে বাবাজী সেজে ঐ আশ্রম খুলে বসে। তার ঝোঁক—দেবীকে দেবী চৌধুরাণী তৈরী করবে। সেই আদর্শে ওকে অনেক কিছু শেখায়। বহু গ্রন্থ পড়ায়, দুনিয়ার ব্যাপারে চৌখস করে তোলে। দেবীকে সেজন্য রান্নাবান্নাও শিখতে হয় ভাল করে। দেবীর হাতের রান্নাই বাবাজী খায় ; বাবাজীর সতর্ক পাহারায় দেবী থাকে। ঐ বাবাজী তরুণ যৌবনে এক ছাত্রীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ছাত্রী ও ছাত্রীর পিতা তাকে সে জন্য যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমান করেন। তার পরই সে ক্রিমিন্যাল হয়। দেবী যৌবনে পড়লে বাবাজীর মনে হয়—সেই যেন তার তরুণ যৌবনের কামনার নিধি সেই ছাত্রীর প্রতিচ্ছবি ! তখন সে অস্থির হয়ে ওঠে, তার মাথার মধ্যে ঝড় বইতে থাকে। এমনি সময় এক খবর এল—সিন্ধুদেশে চালান দেওয়া গুটিকয়েক মেয়ে ধরা পড়ে পুলিসের কাছে আশ্রমের কথা সব বলে দিয়েছে। শীঘ্রই আশ্রম খানাতল্লাস করবে পুলিস। অমনি বাবাজীর চোখের সামনে জেলখানার

ছবি ফুটে উঠল, প্রেমের নেশাও কেটে গেল। তখনই সে আশ্রমের কর্মকর্তাকে তাড়াতাড়ি দিন কতকের জন্যে মেয়েগুলোকে নিয়ে কোথাও সরে পড়তে পরামর্শ দিল। আর দেবীর সম্বন্ধে তাকে অনুরোধ করল, ওর বাপ-মাকে খুঁজে বার করে দেবীকে তাদের হাতে যেন সে ব্যক্তি সঁপে দেয়। এই সব ব্যবস্থা করেই বাবাজী রাতারাতি আশ্রম ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়। দেবীকে সে এক পত্র লিখে জানিয়ে যায় যে, এখন থেকে আশ্রমের কর্মকর্তা লালাজী তার অভিভাবক, সে যেন তার কথা মত কাজ করে। সে দেবীকে তার বাপ-মা'র কাছে নিয়ে যাবে। তবে সে যদি দেবীর অমর্যাদাসূচক কোন কাজ করে, তাহলে বাবাজীর কাছে শিক্ষা পেয়ে দেবী যে আত্মশক্তির অধিকারিণী হয়েছে, সে যেন সেই শক্তির সাহায্য নেয়—সেই তাকে বিপদে রক্ষা করবে।

এর পরই ঘটল আর এক কাণ্ড। এই আশ্রমেরই এক গ্রাহক কর্মকর্তাকে লিখল যে, কলকাতা যুদ্ধের ঘাঁটি হওয়াতে, যোদ্ধাদের জন্য আমোদ-প্রমোদের যে-সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মিলিটারী কর্তাদের তরফ থেকে, তাঁর ওপরেই তার ভার পড়েছে। সুতরাং আশ্রমের সব ক'টা মেয়েকেই সে এ ব্যাপারে নিতে চায়, মোটা টাকা দেবে। আশ্রমের কর্মকর্তা তখন যেন হাতে স্বর্গ পায়। সেই দিনই তারে কথাবার্তা পাকা করে আশ্রম তালাবদ্ধ করে সবাইকে নিয়ে কলকাতায় এসে পড়ে। দেবীকে বলা হয়, তার বাপ-মার পাত্তা দেওয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্মকর্তা বাবাজীর কথা ঠেলে ফেলে, দেবীকেও দলের মেয়েদের সঙ্গে ভেড়াতে চাইল। এর পর এই দলের মেয়েদের নাচ দেখবার জন্যে একটা দিন স্থির হলো। দেবীর আপত্তি টিকল না। সে তখন তার গুরু বাবাজীর নির্দেশমত আত্মশক্তির সাহায্য নিল। সেই দিনই নাচের আসরে নাচ দেখিয়ে, তার পর প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়তেই সাজ-ঘর থেকে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে এই বাড়ীতে শিল্পী নরেনবাবু ছবি তোলবার তোড়জোড় সাজিয়ে মালতীর

বসেছিলেন—দেবীর অদৃষ্ট তাকে এইখানে নিয়ে এলো। পরের ঘটনা আপনারা সবই জানেন।

হরপ্রসাদবাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি এ-সব খবর কোথা থেকে যোগাড় করলেন? এ-পর্যন্ত যা শোনালেন, যেন রীতিমত গল্প! কি করে বুঝব—এ কাহিনী সত্য?

লালবিহারী সিংহ বললেন: ঘটনাস্থলগুলিতে গিয়ে আমাকে এ-সব খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে; আর, এর পিছনে রীতিমত প্রমাণও আছে। তা ছাড়া দেবীকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমার এই কাহিনী সত্য।

হরপ্রসাদবাবু বললেন: আপনার কথা শুনে জানা যাচ্ছে, অনেক দিন ধরেই আপনি এ ব্যাপারের সংগে জড়িত আছেন—সমস্ত খবর রাখেন। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি জানতে পারি?

লালবিহারী সিংহ বললেন: অনেক দিন ধরে একটা আশ্রমকে খাড়া করে কতকগুলো সুবিধাবাদী যে দুর্নীতির জাল বুনে এসেছে, সেটা ছিঁড়ে দেওয়া। এত দিনে গবরমেণ্টেরও টনক নড়েছে; তার ফলে আমার উপরেই তদন্তের সংগে বামালশুদ্ধ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার ভার পড়েছে।

মুখভঙ্গি গম্ভীর করে হরপ্রসাদবাবু বললেন: ও! তাহলে আপনি ডিটেকটিভ্—পুলিসের লোক! কিন্তু এসে অবধি আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলছেন, আমরা কেউই আপনাকে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করতে পারিনি!

লালবিহারী সিং বললেন: এখানেই পুলিসের লোকের বাহাদুরী ঘোষ মশায়! ইনটেলিজেন্স দপ্তরে শিক্ষানবিসী করে এটা শেখবার জন্যে ইণ্ডিয়া গবরমেণ্ট আমাকে বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, মার্কিন মুলুকের ওয়াসিংটনে পাঠিয়েছিলেন ষ্টেটের খরচে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুপ্ত অপরাধের সন্ধান করে সমাজকে রক্ষা করাই আমাদের মুল নীতি।

হরপ্রসাদবাবু এখন সহসা প্রশ্ন করে বসলেন: তাই যদি, এই যে

আশ্রমের কথা-বললেন, তার সংস্রব থেকে যে মেয়েগুলো পেয়েছেন, আর পালিয়ে এসেছে বলে—এখানে যে মেয়েটির সন্ধানে এসেছেন, এদের বাপ-মা'র সন্ধান করে, তাদের বাকী জীবনগুলো সার্থক করতে পারবেন ?

লালবিহারী সিং বললেন : সেই আশা নিয়েই ত' এত বড় একটা দুর্নীতির পিছনে ধাওয়া করতে হয়েছে। তবে এ-কথা আপনাকে বলতে পারি, এই দেবী মেয়েটির জীবন যে সার্থকতার পথে এসেছে এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

হরপ্রসাদবাবু স্থূল গুম্ফযুগল স্ফীত করে বললেন : তাই নাকি ? তাহলে স্পষ্ট করেই সব বলুন।

লালবিহারী সিংহ বললেন : সেই কথাই বলছি। দেখুন, দেবী মেয়েটি নাচের মজলিস থেকে পালিয়ে আসবার সময় তার পিছনের চিহ্নগুলো এমন করে মুছে দিয়ে এসেছিল যে, তাঁকে খুঁজে বা'র করা সম্বন্ধে আমার বিলিতী ও মার্কিনী শিক্ষাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একটু আগে আপনার মুখেই শুনছি, মালতী দেবীর চিঠি পেয়ে আপনি এখানে তাড়াতাড়ি এসেছেন। এখন আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি—আজ সকালে ঐ মালতী দেবীরই এক পত্রে আমি জানতে পারি যে, দলের দেবী মেয়েটি আপনার ফ্লাটেই শিল্পী নরেনবাবুর মডেল হয়ে আছেন। শিল্পীর ছবির খবরও আজকের কাগজে ছাপা হয়। চিঠিখানি নিয়েই আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাই ছবিখানা দেখতে। তারপর যে সব ঘটনা হয়, তাতেই কৌতূহলী দর্শকরূপে আমি এখানে আসবার সুযোগ পাই, সে সব ত' জানেন। এখন এই কথাই আমি বলব যে, আজকের এই যোগাযোগ ঘটছে মালতী দেবীর জন্যই। তাঁর চিঠি পেয়ে আপনি বোম্বাই থেকে কলকাতা এসে পড়েছেন, আমিও দেবী মেয়েটির সন্ধান পেয়ে এখানে এসে তাঁর অতীত সম্বন্ধে এত কথা আপনাদের জানাতে পেরেছি।

হরপ্রসাদবাবু বললেন : আপনি যথার্থ কথাই বলছেন। কিন্তু

মালতী দেবীর এই প্রচেষ্টা—তা সে যে উদ্দেশ্যেই করুক—আসলে কিন্তু সেটা দেবীর পক্ষে 'শাপে বর'-এর মত শুভ হয়েছে কিনা, এখনো আমরা জানতে পারি নি।

লালবিহারী সিং বললেন: সেইটিই জানানো হচ্ছে এখন আমার কর্তব্য। কিন্তু তাহলে দেবীকে এখানে আনতে হবে; তাঁর সামনেই সে কথা আমি বলতে চাই!

ডাকতে বা খবর দিতে হল না। এক দিকের দরজার উপর দোদুল্যমান পুরু পরদাখানির পাশ দিয়ে দেবীই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। সে করযোড়ে আর সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সাহেব দু'জনকে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে 'গুড ডে' বলে অভিনন্দন জানাল। সংগে সংগে সাহেবরাও টুপী তুলে তাকে প্রত্যভিবাদন করলেন।

নরেন বলল: ইনিই দেবী। কিন্তু প্রথম দিন যখন আমার ষ্টুডিওতে আসেন, দেখে পাঞ্জাব বা বেলুচিস্থানের কোন তরুণ যুবা মনে হয়েছিল; উনি না বলা পর্যন্ত সে ছদ্মবেশ ধরতে পারি নি।

দেবী বলল: উনি তখন মালতী দেবীর ছবি নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তারই আসনে আমাকে বসতে দেখে ওঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নতুবা ওঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার ছদ্মবেশ তখনি ধরা পড়ে যেত।

হরপ্রসাদবাবু হাত বাড়িয়ে দেবীকে নিজের কাছেই ফরাসে বসবার জন্য আহ্বান করলেন। দেবী কিন্তু এ-সময় এক কাণ্ড করে বসল। আঁচলখানি গলায় দিয়ে—হরপ্রসাদবাবু, শম্ভুনাথ ও নরেনের পদতলে পর পর মাথা ঠেকিয়ে এবং অপর সকলকে পুনরায় করযোড়ে নমস্কার করে হরপ্রসাদবাবুর ফরাসে গিয়ে বসল।

লালবিহারী সিংহ দেবীকে এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। সে ফরাসে বসলে প্রশ্ন করতে তিনি উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় দেবীই প্রথমে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল: আপনার সব কথাই আমি ও-ঘর থেকে শুনেছি। আশ্রম বা আমার সম্বন্ধে যা যা বলেছেন, সবই সত্য।

এ কথা আপনি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেন, তাই নিজে থেকেই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

লালবিহারী সিহ বললেনঃ তুমি যে খুব বুদ্ধিমতী, ও-দেশের মেয়েদের মত সর্টকাট ধরে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে অভ্যস্ত, তার অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

দেবী বললঃ আমার কথা ত' আপনিই সব বলেছেন। অবশ্য, শিল্পীকে আমার ঐ সব অতীত কাহিনী পরে বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম, কিন্তু তিনি শোনবার জন্যে মোটেই আগ্রহ দেখান নি। আমি আজই জেনেছি, নিজের শিল্প-সাধনা দিয়েই উনি আমার পরিচয় জানবার আশা মনে মনে পোষণ করতেন।

লালবিহারী সিংহ বললেনঃ আপনি কি এখন নিজের সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হয়েছেন ?

দেবীঃ আপনি যেটা অনুমান করে আমাকে এই প্রশ্ন করলেন, আমি সে দিক দিয়ে না গিয়ে এই কথাই বলব—প্রথম দিন এখানে এসে শিল্পীকে যেই মানুষ বলে চিনতে পারি, তখনই আমি এই আশা পোষণ করেছি যে, আর যাই হোক, আমাকে সেই নরকে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়েছি।

লালবিহারী সিংহ বললেনঃ আপনি নিজের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চান ?

দেবীঃ আমি চলে আসার পর আশ্রমের মেয়েগুলি আর কর্মকর্তা লালাজীর অবস্থা কি হয়েছে, জানবার আগ্রহ হয়।

লালবিহারী সিংহ বললেনঃ আর কিছু ?

দেবীঃ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যারা যুদ্ধ করে, তাদের জন্যে সরকারের এত দরদ যে, পেটের রসদের সংগে মনের রসদ যোগাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। আর, আমাদের দেশের লোকই এ ব্যাপারে দালাল হয়ে আমাদের মত অসহায় মেয়েদের কি সর্বনাশ করছে, কলকাতায় এসে নিজের চোখে তা দেখছি—আপনাদের মত বিজ্ঞ বোদ্ধাদের চোখে

আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিয়েও এসেছি। এখন আমাকে বলবেন দয়া করে—আমার সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে কিনা?

লালবিহারী সিংহ বললেন: এই মাত্র তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে যে কথা বললে, ক'টা মোক্ষম নাচের মধ্যেই সেটা দেখিয়ে সবার চোখ যে খুলে দিয়েছ, আজ আর সেটা চাপা নেই। মিলিটারী কর্তারাও ও সিষ্টেম বন্ধ করে দিয়েছেন। তুমি সত্যই অদ্ভুত মেয়ে। ওখানকার আর কিছু জানতে চাও না?

দেবী: বেশ বুঝতে পারছি, লালাজী ধরা পড়েছেন। সিদ্ধাশ্রমের নাম নিয়ে তিনি যে সব অন্যায় কাজ করে এসেছেন, তাতে তাঁর নিষ্কৃতি নেই—এ আমি জানতাম। এখন মেয়েগুলির কি অবস্থা হবে, কি ব্যবস্থা তাদের সম্বন্ধে করেছেন, জানতে ইচ্ছা হয়।

লালবিহারী সিংহ বললেন: চেষ্টা করা যাবে—তাদের বাপ-মা'র যদি সন্ধান পাওয়া যায়—

দেবী: সেটা খুব কঠিন। কেন না, আশ্রমের প্রথম আর প্রধান কাজ ছিল, তাদের অতীত ভুলিয়ে দেওয়া।

লালবিহারী সিংহ বললেন: তোমার অতীত সম্বন্ধে কিছুই কি মনে পড়ে না? বাপ, মা, জন্মস্থান—

দেবী: তাহলে এ ঘটনা কি এভাবে এতদূর এগিয়ে আসত বলতে চান?

লালবিহারী সিংহ বললেন: লালাজীর কাছেও কি কোন সন্ধান বা সূত্র পাও নি?

দেবী: এ প্রশ্নেরও ঐ উত্তর ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন!

লালবিহারী সিংহ বললেন: লালাজীকে বাধ্য করে তোমার সম্বন্ধে অতীত সংবাদ সংগ্রহ করতেও চাও না?

দেবী: না। তাঁর মত সুবিধাবাদী ব্যক্তির কথা আমার এ অবস্থায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

লালবিহারী সিংহ বললেন: আর সাধুজীর কথা?

সাধুজীর নাম শুনবামাত্র দেবী যুক্তকরে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে বলল : তিনি আমার গুরু, শিক্ষাদাতা, কর্মে দিয়েছেন দীক্ষা। আত্মশক্তি কি করে বিকাশ করতে হয়, সেও তাঁরই কাছে জেনেছি। কিন্তু পরে যখন জানতে পারি—অত বড় শক্তিশালী পুরুষের মনের একটা দিকে ঘুণ ধরেছে, পাপ সেখান থেকে উঁকি দিয়ে তাঁর মনকে বিকৃত করে তুলছে, তখন আমাকে শক্ত হতে হয়েছিল—তাঁর সংগে শক্তি পরীক্ষার জন্য! কিন্তু ভগবান সে সংকট থেকে আমাকে রক্ষা করেন; নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে লজ্জায় তিনি পালিয়ে যান প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু তবুও আমি বলছি—তিনি যদি আমার অতীত সম্বন্ধে কিছু বলে যেতেন, আমি তাকে পরম সত্য বলে স্বীকার করতাম।

লালবিহারী সিংহ সপ্রশংস দৃষ্টিতে আত্মস্বার্থ সম্বন্ধে অনাসক্তা, লোভশূন্যা এই মনস্বিনী মেয়েটির নির্মল ও প্রাঞ্জল মুখের দিকে চেয়েছিলেন। তার কথা শেষ হলে বললেন : তাহলে এখন তোমাকে বলি, লালাজী যখন জানতে পারে, তার মৃত্যু-বাণ আমার হাতে এসে গেছে—আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই, তখন আত্মহত্যা করে সে নিজেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

আর্তকণ্ঠে দেবী এই সময় বলে উঠল : আত্মহত্যা করেছেন কাকাজী! আমিও জেনেছিলাম, তিনি ভুল রাস্তায় মৃত্যুর পথেই এগুচ্ছেন। সাধুজীর মত সহনশক্তি তাঁর নেই, তাই লোভের পাক ছাড়তে না পেরে আরো জড়িয়ে পড়ছেন। ভগবান তাঁর আত্মাকে মুক্তি দিন, এই প্রার্থনাই করি।

লালবিহারী সিংহ পকেট হতে গালা দিয়ে শীলমোহর-করা একখানি লেফাফা বের করে দেবীর সামনে তুলে ধরে বললেন : লালাজীর জিনিসপত্র তল্লাস করে এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে। তোমার নামেই চিঠি। চিঠির লেখক তোমার গুরু সাধুজী আনন্দ স্বামী। এই পত্রখানা দেবার জন্যই নানা ভাবে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

এখন সবার সামনে এই পত্র তোমাকে দিচ্ছি, তুমি পত্রখানি অবিকল সবার সামনে পড়বে—এই সর্তে।

লেফাফাখানি হাত বাড়িয়ে নিয়েই তার শিরোনামার হরফগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই দেবী বুঝল, কে এই পত্রের লেখক। শ্রদ্ধার সংগে লেফাফাখানি সর্বাগ্রে সে ললাটে ঠেকাল। তারপর গালা ভেঙ্গে মোড়ক খুলে সুস্পষ্ট অনুচ্চস্বরে পড়তে লাগল :

স্নেহের দেবী !

তোমার কুল-পরিচয় আজ আমিই তোমার কাছে প্রকাশ করছি এই পত্রে। কিন্তু তুমি ত' জান, এই পরিচয়প্রসঙ্গে তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বরাবরই আমাকে কঠিনভাবে বলতে হয়েছে—আমি কিছুই জ্ঞাত নই। সুতরাং তোমার সামনে বসে তোমার চোখে চোখ রেখে, আমি তোমার সেই কুল-পরিচয় কখনই মুখে বলতে পারতাম না। সেজন্যই এই পত্রের অবতারণা। তুমি যখন আমার স্বহস্তে লিখিত এই পরিচয়-পত্র পড়বে—আমি তখন দূরে—বহুদূরে চলে গেছি। ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।

পাঁচ ছ' বছরের বালিকা তুমি তখন—প্রয়াগে মহাকুম্ভের মেলা চলেছে। লালাজীর উদ্যমে সিদ্ধাশ্রমেরও শিবির পড়েছে মেলার একাংশে। নিত্য দুটি চারটি করে বালিকা আসছে! সাধুজীকে দেখে তাদের দারুণ ভয়, কি কান্না! তারপর একদিন তোমাকে এনে আমার সামনে উপস্থিত করল লালা। বলল : এই মেয়েটি বাঘ দেখতে চায়। কিন্তু বাঘের মত ভয়ঙ্কর মূর্তি সাধুজীকে দেখে তুমি হেসেই অস্থির! আমার দীর্ঘ দাড়িটি টান দিয়ে আমাকেও অবাক করে দাও। তুমি ভেবেছিলে, পেশাদার সাধুর মত নকল দাড়ি পরে আমি সাধু সেজে বসে আছি! আমি কিন্তু এতেই বুঝতে পারি, তুমি কি ধাতের মেয়ে। তোমার চোখ, মুখ, আর মনের তেজ দেখে আর একটি ডাগর মেয়ের কথা মনে পড়ল। তিনি ছিলেন এক পদস্থ [illegible] মেয়ে, আমি তখন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। আমি তাঁকে পড়াতাম, কায়স্থ তাঁরা।

কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সেই কন্যাকে আমি বিবাহ করবার কামনা পোষণ করি। কন্যা ত' আমার কথা শুনে হেসেই খুন। তাঁর পরিহাসকে আমি অনুরাগ মনে করে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করি। তার ফলে আমাকে কারাদণ্ড গ্রহণ করতে হয়। আমি সেই অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে সেই কন্যাকে পত্র লিখলে জানতে পারি—কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। সেই কন্যার স্বামীই সুখবরটি দিয়ে আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ করেছেন! তখন বাধ্য হয়ে আমাকে তার আশা ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে ভুলতে চেষ্টা করি। তারপর অনেকগুলি বছর চলে গেল। আমি আশ্রমের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করি—প্রচ্ছন্ন থাকে একটা উদ্দেশ্য। এমনই সময় তোমাকে পেলাম। তোমার মধ্যেই আমি যেন আমার সেই ছাত্রীকে দেখতে পেলাম। মুখে চোখে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! তারপর নাম জিজ্ঞেস করতেই তুমি যেই জানালে—তোমার নাম রেণু, পুনরায় আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুপুঞ্জে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। যেহেতু, আমার সেই ছাত্রীর নাম ছিল—অনু বা অনুপমা। তার পরই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে তোমার মাতা ও পিতার নাম জিজ্ঞেস করবামাত্র তুমি বললে—শ্রীমতী অনুপমা ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ ঘোষ। তখনই সব সমস্যার সমাধান হল। আমার অন্তরের পশুটা উল্লসিত হয়ে চেতিয়ে দিল আমাকে—'ঠিক হয়েছে। যাদৃশী ভবানা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সিদ্ধির বীজ পেয়েছি হাতের মধ্যে।' তুমি তখন বাড়ী যাবার জন্য মারমুখী! আর আমি তোমাকে সাদরে কোলে বসিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকি—আমার পানে তাকাও খুকি, আমার দেওয়া খাবার খাও, এখনই ঘুমিয়ে পড়বে, ঘুম ভাঙ্গলে বাড়ীর কথা মনে থাকবে না।

কিন্তু সেদিন আমারই ভুল হয়েছিল—সম্মোহন বিদ্যা, নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেও তোমার স্মৃতি লোপ করতে পারি নি। দু' চার দিনের মধ্যে অপর বালিকাদিগকে তাদের অতীত ভুলিয়ে দেওয়া

সহজ হয়েছিল, কিন্তু তুমি আমাকে হিমসিম খাইয়েছিলে। বহু কষ্টে বহুদিনে বিবিধ প্রক্রিয়ার পর তোমার স্মৃতি হতে অতীতের কথা মুছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর প্রচেষ্টার ফলে তোমার শিক্ষা যখন সার্থক হয়—অন্তরে তোমার আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয়ে উঠে, তখন আমার হুঁস হল। এতদিন আমি আদর্শ শিক্ষা দানের দায়িত্ব মধ্যে মগ্ন ছিলাম। বিশ্ব-বিদ্যার সংগে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রভাবকেও শিক্ষাদানের সহায়রূপে গ্রহণ করায় শিক্ষার মধ্যেই আমি ছিলাম আত্মস্থ। সেই ধ্যান ভঙ্গ হতেই সাধারণ দৃষ্টিতে তোমাকে দেখলাম। তখন আমি বুঝি বৈদিক যুগের ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ঋষির শিক্ষাপীঠ হতে নেমেছি। দেখলাম, প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকতুল্য তোমার যৌবনদীপ্ত রূপরাশি—অমনি মনে পড়ল, পূর্ব ছাত্রী অনুপমাকে; মনে হল, আমার সাধনায় অনুপমাই আমার আশ্রমে এসেছে! নিদারুণ একটা লালসার আভায় আমার সর্বাঙ্গ ঝলসে গেল। আমি উন্মত্ত হয়ে উঠলাম।···আমার বাঞ্ছিতাকে আমি এইভাবে পেয়েছি—দ্বাদশ বৎসরের সাধনার প্রভাবে। জানি না শিক্ষালব্ধ আত্মশক্তির আলোকে তুমি আমার তৎকালীন কলুষিত প্রবৃত্তি উপলব্ধি করেছিলে কি না!

কিন্তু অন্তরস্থিত ব্রহ্মশক্তি তখনও সুপ্ত হয় নি বলেই বোধ হয়—প্রবৃত্তির চক্র পরিবর্তিত হল। সেই শোচনীয় অবস্থায় আমার চিত্তকেই বিবেক কশাঘাত করতে লাগল। এদিকে পাপের ষোলকলা পূর্ণ হওয়ায় আশ্রমেও দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। তখন প্রায়শ্চিত্ত-পিপাসা আমাকে আকুল করে তুলেছে। আশ্রম ত্যাগের প্রাক্কালে তোমাকে লালাজীর অভিভাবকতার অধীনে অর্পণ করে ও ক্ষুদ্র এক পত্রে তোমাকে যথাযথ নির্দেশ দান করি। সেই পত্রে তোমার অতীতের পরিচয় অসংকোচে বিবৃত করলাম। তোমার পিতা-মাতা যদি শ্রীভগবানের প্রসাদে সংসারে বেঁচে থাকেন, আমার এই পত্র-বর্ণিত কাহিনী তাঁদের স্মৃতির উপর আলোকপাত করবে এবং তোমাকে আত্মপ্রত্যয়শীলা,

স্বধর্মনিষ্ঠাবতী, অপাপবিদ্ধা বিশুদ্ধা কুমারী কন্যারূপেই গৃহে বরণ করে নেবেন। এক দিক দিয়ে আমি তাঁদের চিত্তে দারুণ বেদনা ও মনস্তাপ দিয়েছি সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে আমার নিকট শিষ্যারূপে তুমি যে বিদ্যা ও শিক্ষালাভ করেছ—সেটা বৈদিক যুগে বেদোক্ত ব্রহ্মচর্য-আশ্রমেই সম্ভব ছিল। জৈবসত্তার উর্দ্ধে মানুষের যে স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে, তার সূক্ষ্ম রূপ দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি তুমি পেয়েছ। তোমার জীবন, তোমার শক্তি, তোমার অস্তিত্ব যে বৃথা নয়, তুচ্ছ নয়, তুমি সেটা জেনেছ। এই অবিশ্বাসের যুগে সাধারণ নারীর কথা তুলতে চাই না, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কয়জন যুবকের অন্তরে এই শিক্ষার আলোকপাত হয়েছে, জানি না!

উপসংহারে আমি কেবলমাত্র লালাজীর নিমিত্ত অনুরোধ করব। তোমার পিতা-মাতা এবং তুমি তাকে এই পুনর্মিলনের সংযোজক সেতুস্বরূপ মনে করে তার ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সুখে ও নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যবস্থা অবশ্যই করবে।

আশীর্বাদ করছি, তুমি পিতা-মাতাকে পেয়ে সুখী হও; তোমার ভাবী জীবন সুখ ও শান্তিময় হোক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—সাধুজী।

দেবীর পত্রপাঠ সমাপ্ত হবামাত্র হরপ্রসাদবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: সাধু, সাধু! প্রথমেই আমি সাধুজীকে প্রণাম জানাচ্ছি। অকপটে তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন। আমার মনে কোন খুঁৎ বা সংশয় নেই। ওপরে উঠেই যখন তোমাকে প্রথম দেখি, তখনই মন আমার দুলে উঠেছিল। তারপর সেই জোরালো কথাগুলি ভারি মিষ্টি লেগেছিল মা! তুমিই আমাদের হারানিধি 'রেণু'। আমার বিশ্বাস, উনিও এই কথা বলবেন—ভিতরে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করে এসো।

দেবী বলল: উপরের ঘরে শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেই মায়ের স্বপ্ন-দৃষ্টি খুলে যায়—মায়ের মনের ছবির সংগে শিল্পীর আঁকা ছবি মিলে গেছে জেনে তখনি তিনি আমাকে তাঁর সেই হারানো মেয়ে

রেণু বলেই কাছে টেনে নেন। সেই থেকে ও-ঘরে আমাকে কোলে করে মা বসেছিলেন। আজ চারদিক থেকে আনন্দ আমাকে ঘিরে ধরেছে—হারানো বাপ-মাকে আমি আ-চমভাবেই ফিরে পেয়েছি।

শম্ভুনাথ বললেন: এমন আশ্চর্য ঘটনা বাস্তবে ঘটে না। এখন বারো বছরের আগেকার কথা—সেই ভীষণ দিনটির কথা মনে পড়েছে হরু! সর্বহারা হয়ে বিদেশের পথে পাড়ি দেবার মুখে, তোমার সংগে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যায়...ছুটো ছেলে মেয়ের ছবি আমাদের ছুই বন্ধুর মনে মিলনের এক নূতন আনন্দের সঞ্চার করে, তার পরেই ওঠে বিষাদের ঝড়...রেণুকে পাওয়া গেল না। সেই সূত্রে হরিষে বিষাদে আমার হলো স্মৃতি লোপ। অতীতের কথা মুছে যায়—এই ছুই বিদেশী মহাশয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আমার জীবনযাত্রা চলতে থাকে নূতন পথে। ভগবানের অপার কৃপা যে, সহজাত সংস্কারের মত যে চিত্রবিদ্যা আমাকে প্রেরণা দিয়ে এসেছে, তা থেকে আমাকে তিনি বঞ্চিত করেন নি বরং স্মৃতিলোপ হওয়ায় সেটা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। আজ আমিও পেয়েছি নূতন জীবন, কিন্তু সেই সংগে হারানো জিনিসগুলো সব আমাকে ঘিরে ধরেছে। তবে ছুঃখ এই—সেদিনের মত আজও আমি রিক্ত, নিঃসম্বল।

সাহেবরাও এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে এই উপাখ্যান শুনছিলেন। বাঙলাভাষায় তাঁরা ভালরকমেই কৃতবিদ্য থাকায় কথাগুলি উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় নি। এই সময় এক ব্যক্তি শম্ভুনাথকে বললেন: মিঃ আর্টিষ্টের এ ছুঃখের কোন কারণ নেই। অতীতের স্মৃতিলোপ হলেও এঁর সংস্কার-লব্ধ শিল্পশক্তি আশ্চর্য ভাবেই নিজের পরিকল্পনাকে প্রবুদ্ধ করে নব নব প্রেরণা দিতে থাকে। আমরা এই দীর্ঘকাল ওঁর সেই বিরাট প্রতিভার দান গ্রহণ করে প্রচুর লাভবান হয়েছি। উনি কিন্তু বিনিময়ে ভরণ-পোষণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন নি। আমরাও ওঁর প্রাপ্য দেবার কোন সুযোগ না পেয়ে ব্যাঙ্কে সে টাকা জমা রেখেছি। সুদসমেত সে টাকা ওঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আমরাও নিশ্চিন্ত হব।

অপর সাহেবটিও বললেন: আপনি নিজেকে রিক্ত ও নিঃসম্বল বলে দুঃখ করছিলেন মিঃ আর্টিষ্ট, কিন্তু আপনার যে ন্যায্য প্রাপ্য জমা আছে, সুদ-সমেত তার পরিমাণ কত জানেন? অন্ততঃ বারো লক্ষ টাকা হবে।

শম্ভুনাথ অবাক বিস্ময়ে তাঁর পরম শুভানুধ্যায়ী সাহেবদ্বয়ের দিকে চেয়ে রইলেন!

নরেন বলল: আপনাদের মত ব্যবসায়ী জাতির পক্ষেই এতখানি সততা সম্ভব। কিন্তু এ-দেশের পক্ষে এ কল্প-কথা, স্যর!

এই সময় মালতি ধীরে ধীরে ফরাসের নিকট এসে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে দেবীকে বলল: আমি না বুঝে আপনার কাছে অপরাধিনী হয়ে আছি। এখন মাপ চাইতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

দেবী সহাস্যে বলল: কেন তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ ভাই! আমরা প্রত্যেকেই তোমাকে অপরাধিনী না মনে করে, হিতৈষিণীই ভাবব। তোমার জন্যেই এত শীঘ্র ও এত সহজে আমার শাপমুক্তি হয়েছে। এই সহৃদয় সরকারী অফিসার মশায়ও সে কথা স্বীকার করেছেন একটু আগে, আজকের এই যোগাযোগের উপলক্ষই যে তুমি ভাই!

হরপ্রসাদবাবু বললেন: সুতরাং তোমাকে আমরা এমন একটা পুরস্কার দেব, যা আজকের এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নের মত হয়ে তোমাকেও আনন্দ দেবে। আমার রেণু মা, এর পর ভেবে চিন্তে আমাকে সেটা বলবে। আর তোমাকেও বলছি রেণু মা, লালাজী যখন বেঁচে নেই, তার জন্যে চাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কিছু তুমি আমার কাছে এখন দাবী কর, তোমার নিজের পছন্দমত যে কোন ব্যাপারে সেটা লাগানো চলে।

দেবী সানন্দে বলে উঠল: এই ত' আমার বাবার মত কথা। তাহলে আমার প্রার্থনা আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি। জ্ঞান হয়ে অবধি আমি যা দেখেছি, তার পর, বড় হয়ে যা বুঝেছি, সে শুধু মেয়েদের লাঞ্ছনা; তারা সওদার সামীল হয়ে তৈরী হয়ে ওঠে। তারপর

পণ্যের মত দেশ-দেশান্তরে চালান যায়। এ-দিকে দেশের কারুর নজর নেই। এই যে মহাযুদ্ধ চলেছে, এর আগেও দেশে যে মন্বন্তর হয়ে গেছে—আমি কাগজে তার কথা সব পড়েছি। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে মরেছে; কিন্তু কত লক্ষ মেয়ে যে হারিয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে, তার হিসেব নেই। এখনো মেয়েদের নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা চলেছে। আমি চাই এর প্রতীকার—হারানো মেয়েদের উদ্ধার করে সম্মানের সংগে তাদের বাঁচবার ব্যবস্থা। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এই সরকারী তদন্তকারী পুলিস অফিসার মহাশয়কে—ইনিই সরকারের চোখ খুলে দিয়েছেন; এঁর জন্যই এত বড় একটা নারী-পণ্যাগারের দরজা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের অনেক স্থানে এই অনাচার চলেছে। আমার বাবা আমাকে আজ তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করবার জন্য হাত পাততে বলেছেন। আমি এই প্রার্থনা করছি—দেশের হারানো মেয়েদের উদ্ধার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করুন। বিভিন্ন প্রদেশে তার শাখা খোলা হবে। আমি অনুরোধ করছি—সরকারের সেই সুদক্ষ কর্মচারী এর ভার গ্রহণ করুন। আমিও আমার শিক্ষা, দীক্ষা, প্রভাব, সময়—সব কিছুই এর জন্য উৎসর্গ করব।

হরপ্রসাদবাবু বললেন : খুব ভাল প্রস্তাবই তুমি করেছ মা! বেশ, হারানো মেয়েদের উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান প্রথমে কলকাতা সহরেই গড়ে উঠুক। তার জন্যে আমি একখানা বড় বাড়ী আর এক লাখ টাকা উপস্থিত দেব। তারপর, প্রদেশে প্রদেশে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলবার সময়ও প্রয়োজন মত সাহায্য করব। আমার এলাহাবাদের বাড়ীখানাও এই উদ্দেশ্যে দান করছি।

শম্ভুনাথও সহর্ষে বললেন : আমি ত' খানিক আগে নিজেকে রিক্ত বলেই জানতাম। এখন শুনছি, আমি নাকি লাখ লাখ টাকার মালিক। তাই যদি হয়, অর্দ্ধেক টাকা আমি রেণু-মা'র প্রতিষ্ঠানে দিলাম।

শিল্পী নরেনও এই সংগে প্রতিশ্রুতি দিল : আমিও তাহলে যে

টাকা আজ ছবির দরুণ পেয়েছি, সেটা এই প্রতিষ্ঠানেই দেবার জন্য জ্যেঠাবাবুকে অনুরোধ করছি।

সকলেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দাতাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ দিলেন লালবিহারী সিংহও দেবীর প্রশংসা করে বললেন : দেশে যদি তোমার মত মেয়ে আর গোটাকতক জন্মায়, তাহলে দেশের হাওয়া বদলে যাবে। তুমি যে প্রস্তাব করেছ, এ এক বিরাট কীর্তি। আমি নিজে ত' এতে কর্মী রূপে যোগ দেবই, তা ছাড়া সরকারও যাতে নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন, তার ব্যবস্থাও করব। আর এক কথা, লালাজীর বাসা থেকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি পাওয়া গেছে, আমি চেষ্টা করব, এই টাকা যাতে তোমার প্রতিষ্ঠানের কাজে প্রদত্ত হয়।

এই সময় হরপ্রসাদবাবু প্রস্তাব করলেন : আপনারা যখন এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এতখানি সময় দিলেন, তখন এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করবার জন্য আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার এই অনুরোধ রক্ষা করলে বিশেষ অনুগৃহীত হব।

দেবীও করযোড়ে মিনতি জানিয়ে বলল : আমাকে আপনারা এ-বাড়ীর মেয়ে বলে স্বীকার করছেন, আমাকেই আপনাদের আহার্য পরিবেষণের অনুমতি দিতে হবে—আমি সেটা সৌভাগ্য মনে করব।

সমস্বরে সকলেই সম্মতি দান করলেন।

এই সময় হরপ্রসাদবাবু ফরাস হতে উঠে নরেনের কাছে গেলেন এবং তাকে দু' হাতে আসন হতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে গাঢ়স্বরে বললেন : এখন তাহলে আসল কথা বলি নরু—রেণুকে তুমিই উদ্ধার করেছ ; ছবির রেণুও তোমার, আর জীবন্ত দেবীও তোমার।

একই সংগে নরেন ও দেবী উভয়ে হরপ্রসাদবাবু ও শম্ভুনাথকে প্রণাম করল।

হরপ্রসাদবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন : হারানো মেয়ে ও হারানো বন্ধুকে পেয়ে আমি আজ ধন্য হলাম, পূর্ণ হলাম। কিন্তু এর উপলক্ষ হল শিল্পী নরেন আর আমার স্ত্রীর মনোরাজ্যের মানসী !